মার্কসবাদের বিচারে রামমোহন

এবাদত্ হোসেন

সপ্তর্ষি, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা - ৭০০ ০৭৩

প্রথম প্রকাশ ঃ
বই মেলা
ফেব্রুয়ারী ১৯৫৬

প্রকাশক ঃ
ভোলানাথ দাস
সপ্তর্ষি
১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট
কলিকাতা-৭০০ ০৭৩

মুদ্রক ঃ
কনক কুমার বসুঠাকুর
সুমুদ্রণী
৪/৫৬এ, বিজয়গড়, কলিকাতা - ৭০০ ০৩২

মার্কসবাদের বিচারে রামমোহন

প্রকাশকের বক্তব্য

'মার্কসবাদের বিচারে রামমোহন' এবাদত্ হোসেনের প্রথম প্রকাশিত গবেষণা গ্রন্থ। এই গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ার আগেই লেখক হঠাৎ গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং ইহলোক ত্যাগ করেন। কাজ চলছিল শ্লথ গতিতে। বিদ্যুৎ বিভ্রাটের কারণে। সম্পূর্ণ মুদ্রিত বইটি তাঁকে আমরা দেখাতে পারিনি। এ জন্য আমাদের অনুশোচনার শেষ নেই।

লেখকের ভগ্ন স্বাস্থ্যের পরিণতি হিসাবে গ্রন্থখানির ইতিবৃত্তের প্রেক্ষাপটে সম্পাদনার দৈন্যতার উল্লেখ না করাটা অন্যায়। লেখকের আপোষহীন বস্তুনিষ্ঠতা কিছুটা ব্যাহত করেছে সাধারণ গ্রন্থনাকে।

এই সব সামান্য বিচ্যুতির প্রতি পাঠককুলকে সাধারণভাবে ক্ষমাশীল হতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

—প্রকাশক

॥ কৃষক জনতার মুক্তি সংগ্রামের পতাকাকে
যুগ যুগ ধরে রক্ত দিয়ে যাঁরা আরো উজ্জ্বল
লাল করে গেছেন সেই অমর শহীদদের
উদ্দেশ্যে ॥

—মুখবন্ধ—

আজও আমাদের দেশের অর্থনীতি, রাজনীতি, শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে উনিশ শতকের প্রভাব পুরোমাত্রায় বিদ্যমান। সমাজ জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে "আদর্শ পুরুষ" হিসাবে যাঁদের পুজো করা হয়, স্কুল কলেজের পাঠ্য পুস্তক থেকেই যাঁদের আমরা অনুসরণ করতে শিখেছি এবং আজও যুব-ছাত্ররা শিখছে তাঁরা প্রায় সবাই উনিশ শতকের মানুষ। দীর্ঘদিনের সুপরিকল্পিত প্রচারের মাধ্যমে এঁদের ভাবমূর্ত্তিগুলো এমনভাবে গড়ে তোলা হয়েছে যে এঁদের আসল চেহারাটা কোন্ বিস্মৃতির অতল গহ্বরে হারিয়ে গেছে এবং সমাজ বিজ্ঞানীদের গবেষণার বিষয় বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে। লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে এই সমস্ত "যুগ পুরুষ" দের প্রকৃত চেহারাটা জনসমক্ষে তুলে ধরাটাও আজ তথাকথিত বুদ্ধিজীবি মহলে নিন্দিত হচ্ছে। কারণটা খুবই পরিষ্কার।

এই ভাবমূর্ত্তিগুলো গড়ে তোলা হয়েছে শাসকশ্রেণীগুলির স্বার্থ রক্ষার প্রয়োজনেই। এঁরা সবাই একটা শ্রেণী স্বার্থকেই রক্ষা করেছিলেন। এদের প্রত্যেকের নির্দিষ্ট শ্রেণী চরিত্রটা পরিষ্কার ভাবে ধরতে পারার জন্যই নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতের বিচার বিশ্লেষণ দরকার। ভারতীয় জণগণের বিশষতঃ কৃষক জনতার মুক্তি সংগ্রামের অগ্রগতি ও বিকাশের স্বার্থেই এই পুনর্মূল্যায়ন জরুরী হয়ে পড়েছে। বর্তমান শতকের সত্তর দশক থেকেই অতীত ইতিহাসের পুণর্মূল্যায়নের যে প্রবণতা জন্ম নিয়েছে বর্ত্তমান গ্রন্হটি তারই অন্যতম শরিক।

একটা নির্দিষ্ট যুগের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিচার বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন শ্রেণীস্বার্থ ও শ্রেণীসম্পর্ক গুলোকে চিহ্নিত করা, সামাজিক ও রাজনৈতিক বিকাশের স্তরটিকে বোঝা এবং এই পরিপ্রেক্ষিতে সমস্ত ঐতিহাসিক চরিত্রগুলোকে মূল্যায়ন করা ও তাদের নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক ভূমিকা সম্পর্কে সম্যক ধারণা গড়ে তোলা—এটাই ইতিহাসের বস্তুবাদী বিশ্লেষণের প্রক্রিয়া।

বর্তমান গ্রন্থের লেখক ঐতিহাসিক বস্তুবাদী বিচার ধারায় রাজা রামমোহন রায় এর সমগ্র চরিত্রটি বিশ্লেষণের প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। এ কাজ করতে গিয়ে প্রকৃত পক্ষে তিনি প্রাচীন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও সম্পর্কগুলো থেকে শুরু করে উনিশ শতক পর্যন্ত আমাদের দেশের সমগ্র অর্থনৈতিক সামাজিক প্রেক্ষাপটকেই বিশ্লেষণ করেছেন এবং সাথে সাথে সমসাময়িক ইউরোপের একটা তুলনামূলক ছবি তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। অর্থাৎ তিনি একটা সমগ্র যুগকে তার ঐতিহাসিক পটভূমিকায় স্থাপন করে তারই ভিত্তিতে রামমোহনকে বিশ্লেষণ করেছেন। কারণ রামমোহন রায় "ভারতবর্ষের আধুনিক যুগের আদি পুরুষ"

হিসাবে বন্দিত ; এবং তিনি ছিলেন তাঁর যুগে তাঁর শ্রেণীর শ্রেষ্ঠ প্রতিভূ। এই গভীর গবেষণামূলক কাজ করার মধ্য দিয়ে লেখক প্রাক বৃটিশ ভারতের অর্থনৈতিক সম্ভাবনা, ভারতে বৃটিশ শাসনের অর্থনৈতিক ও সামাজিক ফলাফল, উনিশ শতকের বাংলাদেশে নবোদ্ভূত ব্যবসায়ী বুর্জোয়া শ্রেণীর চরিত্র ও ভূমিকা এবং রাজা রামমোহন রায় এর সামগ্রিক কার্যকলাপ ইত্যাদি সম্পর্কে অনেক অজানা তথ্য আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। রামমোহনকে বিশ্লেষণ করতে গেলে বঙ্কিমচন্দ্রের কথা এসে যাবেই। স্বাভাবিক ভাবেই লেখক এই গ্রন্থের এক অংশে বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে একটা সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ রেখেছেন যার মূল্যও আজ অপরিসীম।

অতীতকে পরিপূর্ণভাবে জানার মধ্যদিয়েই আমরা যাতে ভবিষ্যতের উজ্জ্বল সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত করতে পারি, সমাজ পরিবর্তনের সংগ্রাম পরিচালনার যোগ্য হয়ে উঠতে পারি এটাই ছিল তাঁর সারা জীবনের স্বপ্ন।

এই গ্রন্থ বিতর্কের ঝড় তুলুক যার মধ্যে দিয়ে আরো অনেক সত্য পরিস্ফুট হবে—এটাই ছিল লেখকের স্বপ্ন।

ব্যস্ততার মধ্যে বইখানি প্রকাশ করতে গিয়ে কিছু ছাপার ভুল থেকে যাওয়া অসম্ভব নয়। তার জন্য আগে থেকেই আমরা ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। তবুও একটি শুদ্ধি-পত্র দেওয়া হলো।

তাঁর অবর্তমানে এই গ্রন্থটিকে পাঠকদের হাতে তুলে দেবার দায়িত্ব পেয়ে আমরা গর্ববোধ করছি।

এই গ্রন্থ পাঠকসমাজকে, যুবসম্প্রদায়কে ভাবিয়ে তুলুক, অনুসন্ধিৎসু করে তুলুক, সমাজবিজ্ঞানীর দৃষ্টিভঙ্গী আয়ত্ব করতে সহায়তা করুক—এটা আমাদের ঐকান্তিক কামনা।

কিশলয় সরকার
প্রিয়তোষ ভট্টাচার্য
শক্তি মুখোপাধ্যায়

মার্কসবাদের বিচারে রামমোহন

রামমোহন রায় শুধু বাংলা দেশেই নয় সারা ভারতবর্ষে শিক্ষিত ও বুদ্ধিজীবি মহলে একটি বিশেষ স্থান দখল করে আছেন বললে ভুল হবে না। বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবি এবং তথাকথিত "জাতীয়তাবাদী মার্কসবাদী" দের মতে ভারতের জাতীয় অগ্রগতি বা জাতীয়তা-বোধ উন্মেষের ক্ষেত্রে তিনিই ছিলেন পথিকৃত। এই কারণে তাঁকে জাতির জনক বলেও প্রচার করা হয়ে থাকে তাঁদের পক্ষ থেকে। স্বভাবতঃ তাঁর জীবনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে জানবার কৌতূহল জনগণের থাকবে—তা স্বাভাবিক এবং তা জানা দরকার। কিন্তু অদ্যাবধি তাঁর সঠিক মূল্যায়ন হয়েছে বলে মনে হয় না। দেখা যায় শাসক শ্রেণীর পক্ষ থেকে তাদের নিজেদের স্বার্থে শ্রীরায়ের প্রভাব প্রতিপত্তি ব্যবহার করবার উদ্দেশ্যে তাঁর সম্পর্কে যে বক্তব্য উপস্থিত করে থাকেন তা মনগড়া। তাঁদের বা তাঁদের অনুগ্রহ-পুষ্ট বুদ্ধিজীবিদের পক্ষ থেকে তাঁর যে মূল্যায়ন করা হয়েছে এতদিন; তার সঙ্গে ইতিহাসের বিশেষ মিল আছে বলে মনে হয় না। শ্রীরায়ের সঠিক মূল্যায়ন করতে হলে তৎকালীন ভারতের ঐতিহাসিক পরিস্থিতির পটভূমিকায় তাঁর জীবনের বিভিন্ন দিকের, তাঁর বিভিন্ন ধরনের বক্তব্য ও কাজ কর্মের অর্থাৎ সমাজ জীবনে, রাষ্ট্র ও অর্থনৈতিক জীবনে যে ভূমিকা তিনি গ্রহণ করেছিলেন তার বস্তুনিষ্ঠ বিচার প্রয়োজন।

রামমোহনের জন্ম ও মৃত্যু উভয়ই ঘটেছে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে—যখন দু দুটো জাতীয় মুক্তি যুদ্ধের সম্মুখীন হতে হয়েছে তাদের—প্রথমটি জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর নেতৃত্বে জনগণের দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ—আর দ্বিতীয়টি "ওয়াহবী" দলের ও ফারাজী দলের নেতৃত্বে জাতীয় যুদ্ধ। প্রথম যুদ্ধে যে ভারতীয়রাই শুধু যোগ দিয়েছিলেন তা নয়, দেখা যায় নেপালের অধিবাসীরাও ওই যুদ্ধে ভারতীয়দের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে ইংরাজদের বিরুদ্ধে অস্ত্র তুলে ধরেছিলেন।

এই যুদ্ধের পুরোভাগে ছিলেন সর্বজন শ্রদ্ধেয় সেখ মজনুশাহ, ভবানী পাঠক, দেবী চৌধুরানী প্রমুখ। দ্বিতীয়টির পুরোভাগে সৈয়দ আহমেদ, মীর নিসার আলি প্রমুখ। রামমোহনের বিভিন্ন ধরনের কাজকর্ম এই রকম অবস্থায় কোম্পানীর শাসনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। সুতরাং সেইরকম পরিস্থিতিতে তিনি যে ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন তাঁর জীবনী তার সঙ্গে সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ হওয়া উচিত। তাছাড়া তাঁর শ্রেণী থেকেও তাঁকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখা বা বিবেচনা করা সঠিক হবে না। একমাত্র এইভাবেই তাঁর সম্পর্কে কোনো বক্তব্য বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে তাঁর সম্পর্কে আমাদের ধারণা সুস্পষ্ট হতে পারে বলে আশা করা যায়। অন্যথায় কোনো মূল্যায়নই সঠিক হবে না। কেননা, তার সঙ্গে বাস্তবের আদৌ কোনো সম্পর্ক থাকবে না।

আমরা এখানে বিজ্ঞানসম্মত ভাবে তাঁর জীবনের কয়েকটি দিক বিচার বিশ্লেষণ করে দেখাবার চেষ্টা করবো। স্বভাবতঃ মার্কসবাদী দৃষ্টিকোণ থেকেই তা করা সম্ভব এবং সেটাই হবে বস্তুনিষ্ঠ বিচার।

প্রথমেই বলে রাখি রামমোহন সম্পর্কে নির্ভুল তথ্যের যথেষ্ট অভাব এবং কোন কোন ঘটনা প্রমাণ সাপেক্ষ। যে তথ্যগুলি পাওয়া যায় তার উপর নির্ভর করেই আমাদের বক্তব্য উপস্থিত করতে হবে।

পূর্বেই যে কথাটা উল্লেখ করা বোধহয় ভালো যে রামমোহন বিশ্বাস করতেন প্রাক্-বৃটিশ ভারত নিমজ্জিত ছিল এক নিবিড় অন্ধকারের মধ্যে। বৃটিশ সভ্যতা তাকে পথ দেখিয়েছে সেই অন্ধকার থেকে মুক্ত হবার—যদিও তাঁর এ ধারণা শুধু ভুলই নয়, ইতিহাস বিরুদ্ধ, তাই সেই বৃটিশ সভ্যতা ভারতের জন্য কী জিনিস বহন করে এনেছিলো তা আমাদের জানা দরকার। শুধু রামমোহনই নয় বর্তমান কালে বহু "মাথামোটা" আর "পা সরু" এমন বহু পণ্ডিতও এইরকম একটা ধারণা প্রচার করবার চেষ্টা করে থাকেন ; তাঁদের কাছেও প্রকৃত ব্যাপারটা তুলে ধরা দরকার।

একথা কারুর অস্বীকার করার কথা নয় যে প্রাক্-বৃটিশ ভারত ছিল ব্যবসা বাণিজ্যে, শিল্প উৎপাদনে এবং পণ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে একটি উন্নত দেশ। ভারতের যে কোন বড় শহর ছিল লন্ডনের মত সমৃদ্ধশালী এবং জাঁকজমকপূর্ণ। সেদিন ইংলন্ড ছিলো ভারতের মুখাপেক্ষী অর্থাৎ ভারতকে দেবার মত তার বেশী কিছু ছিল না। ইংলন্ড ছিল একটি কৃষি নির্ভরশীল দেশ। বৃটিশ বুদ্ধিজীবি মিঃ রজনী পাম ডাট তাঁর "ইন্ডিয়া টুডে এন্ড টুমরো" গ্রন্থে লিখেছেন ঃ (১) "In the middle of the eighteenth century England was still mainly agricultural." (২) "England, at the stage of development reached in the early seventeenth century, had nothing of value to offer India in the way of products comparable in quality or technical standard with Indian pro-

ducts , the only important industry then devoloped being the manufacture of woolen goods which were of no use for India." স্বাভাবিক ভাবেই ভারতবর্ষে পা দেবার প্রথম দিন থেকেই কোম্পানী স্বপ্ন দেখে আসছিল ভারতবর্ষ দখল করে তাদের শাসন কায়েম করার। এখানে জেনে রাখা ভালো কোম্পানীর লোকজন ভারতে বাণিজ্য করতে এলেও তারা ছিলো ইংলণ্ডের রাণীর আশীর্ব্বাদ পুষ্ট সামরিক বাহিনীও। তাদের স্বপ্ন তারা সফল করে তুললো ইং ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে। তাতে সহায়তা করলো এদেশের ব্যবসায়ী বুর্জোয়াদের একটি প্রভাবশালী অংশ আর সৈন্যবাহিনীর সর্বাধিনায়ক মিরজাফর আর কয়েকজন ভাগ্যান্বেষী ব্যক্তি। তাদের সঙ্গে গোপন চক্রান্ত করে অন্যায় ভাবে নিহত করা হলো স্বাধীনতাপ্রিয় শেষ স্বাধীন শাসনকর্তা সিরাজুদ্দৌল্লাকে এবং কার্যত তারা দখল করে বসে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার শাসন ক্ষমতা, মিরজাফরকে সিংহাসনে বসিয়ে। তারপর দেশীয় দালাল বুর্জোয়াদের সহায়তায় সমগ্র ভারতবর্ষ দখল করে বসে জঘন্য উপায়ে। এই কাজে সবচেয়ে যে ধারালো অস্ত্রটি তারা ব্যবহার করে তা হচ্ছে তাদের পুরোনো নীতি "ভেদ বিভেদ সৃষ্টি করে শাসন করো"।

মিঃ আর, পি, ডাট কোম্পানীর ক্ষমতা দখলের মূল উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেছেন ঃ

(৩) "As soon, however, as domination began to be established in India, by the middle of eighteenth century, methods of power could be increasingly used to weight the balance of exchange and secure the maximum goods for the minimum payment. The margin between trade and plunder began to grow conspicuously thin." (I. T. T.—p 42) এবং "The wealth of India began to flood the country (England—লেখক) in an ever growing stream."

তখন সমস্ত দেশের সমস্ত ধন সম্পদ এমন কি দেশের কোটি কোটি মানুষের জীবন তার হাতের মুঠোয়। স্বভাবতঃ ইংলণ্ডে এই ধন সম্পদ জমে উঠবে ত'তে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। প্রাক্তন শাসন কর্তারা এদেশের স্থায়ী অধিবাসী হয়ে এ দেশকে শাসন করতো। কিন্তু ইংরাজরা থাকতো ইংলণ্ডে। ধনসম্পদ লুণ্ঠন করে পাঠাত ইংলণ্ডে—তার নিজের দেশে।

"The sudden access of capital in England in the second half of the eighteenth century came above all from the plunder of India." (ibid 46)

ভারতের লুণ্ঠিত সেই ধনসম্পদ নতুন নতুন উৎপাদন যন্ত্রের আবিষ্কার ও ব্যবহারের জন্য যোগান দিল প্রয়োজনীয় প্রাথমিক মূলধনের। এই সব নতুন

নতুন উৎপাদন যন্ত্র ইংলণ্ডকে পরিণত করলো দুনিয়ার সবচেয়ে শিল্পোন্নত দেশে। ফলে একদিন ইংলণ্ডের নবোদ্ভূত পুঁজিপতি শ্রেণীর শোষণ ও লুণ্ঠনের লীলাক্ষেত্র হিসাবে ভারতবর্ষে তার অগণন মানুষের জীবনে নেমে এলো চূড়ান্ত বিপর্যয়। ইণ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর ক্ষমতা দখলের সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষে ব্যবহারিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে, চিকিৎসা বিজ্ঞানে, যন্ত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে, শিল্প-উৎপাদনে যে ক্রমোন্নতি ঘট্‌ছিল তার গতিপথ রোধ করে দেওয়া হলো। সর্বোপরি সামন্ততন্ত্রের অভ্যন্তরে পুঁজিতান্ত্রিক শিল্প-বিকাশ—যা স্বাভাবিক নিয়মে ঘটছিল—তাও একেবারে ধ্বংস করে ফেলা হল। ব্যবসায়ীবুর্জোয়া বা উদীয়-মান পুঁজিবাদী বুর্জোয়াদের উৎখাত করে তাদের পরিণত করা হয় ভূমিহীন কৃষকে। এমনি করে ধ্বংস করে ফেলা হল ব্যবসা বাণিজ্যে—পণ্য উৎপাদনে উন্নত একটি দেশকে। বৃটিশ শিল্পপতিরা ধ্বংস করে ফেলল ভারতবর্ষের কুটির শিল্পকে পর্যন্ত। ইংলণ্ডে যখন কৃষকরা ভূমি থেকে, ভূমি দাসত্ব থেকে মুক্তি লাভ করল, মানুষের শ্রমের মর্যাদা বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মূল্য বেড়ে গেল, কারিগর শ্রেণী কুটির শিল্প থেকে ছাড়া পেয়ে নিজের মনোমত কাজ খুঁজে নেবার খানিকটা স্বাধীনতা লাভ করল, কল কারখানায় কাজ পেল, ব্যবসায়ী বুর্জোয়াদের অর্থ লগ্নীর ক্ষেত্র প্রসারিত হল। ঠিক সেই সময় সেই ইংলণ্ডের "মানবতার পূজারী"—পুঁজিপতিরা তাদের নিজেদের স্বার্থে ভারতের কোটি কোটি কৃষককে তার "বাপুতে" জমি থেকে উচ্ছেদ করে। কারিগর শ্রেণীকে কুটির শিল্প থেকে বিতাড়িত করে, এমনকি ভিটেমাটি থেকে ব্যবসায়ী বুর্জোয়াদের উচ্ছেদ করে। শুধুমাত্র ভূমির সঙ্গে নতুন করে বেঁধে রাখাই হল না, তাদের পরিণত করা হলো বৃটিশ শাসকবর্গের অনুগ্রহ প্রার্থী—জমিদার শ্রেণীর একধরণের ভূমিদাসে, ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দের "চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের" মাধ্যমে। মিঃ ডাট লিখছেন ঃ

"But once the Industrial Revolution had been achieved in England with the aid of the plunder of India, the new task became to find adequate outlets for the flood of manufactured goods." "The new needs required the creation of a free market in India in place of the previous monopoly." (p-46)

এতদিন ভারত ইংলণ্ডকে পণ্য সরবরাহ করে এসেছে। এতদিন সে ছিল ভারতের মুখাপেক্ষী, আর এখন ক্ষমতা দখলের পর ভারতকে পণ্য রপ্তানি করার দেশ থেকে ইংলণ্ডের পণ্য আমদানী করার দেশে পরিণত করার প্রয়োজন হয়ে পড়লো।

"This meant a complete changeover from the whole previous system of the E.I. Company." "All the numerous interests opposed to the exclusive monopoly of the E. I. Company

combined to organise a powerful offensive against it." "This offensive, which had the support, not only of the rising English manufacturing interests, but of the powerful trading interests excluded from the monopoly of the E. I. Company, was the precurser of the new developing Industrial capitalism, with its demand for free entry into India as a market, and for the removal of all obstacles, . to the effective exploitation of that market." (I. T. T. 46)

কিন্তু পরিকল্পনা গ্রহণ করা আর তা কার্যে পরিণত করা—এ দুটো এক কথা নয়। তারা চাইল ভারতবর্ষে তাদের স্থায়ী উপনিবেশ গড়ে তুলতে, তাকে বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে স্থায়ীভাবে শোষণ আর সেই কারণে শাসন করতে। কিন্তু তারা দেখল বাইরে থেকে এসে কামান বন্দুকের মুখে অথবা চক্রান্ত করে একটি দেশ দখল করা সম্ভব, সম্ভব লুন্ঠন করা। সম্ভব নয় তাকে স্থায়ীভাবে শোষণ করা অর্থাৎ সেখানে স্থায়ী উপনিবেশ গড়ে তোলা—বৃটেনের প্রয়োজন মত কাঁচামাল সরবরাহের দেশে পরিণত করা। বহির্দেশীয় আক্রমণকারী শক্তির পক্ষে তা সম্ভব নয় যদি অবশ্যম্ভাবী বাধাগুলি অপসারণ না করা যায়, যদি যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা না হয়, যদি সেখানকার লোকজনের সক্রিয় সহায়তা লাভ না করা যায়। বৃটিশ পুঁজিপতিরা এ-সম্পর্কে পূর্ব থেকেই সচেতন ছিল। ভারতবর্ষ বিশাল একটি ভূখন্ড। সেখানে কোটি কোটি মানুষের বাস, নানা জাতি উপজাতি, নানা ধর্ম, সংস্কৃতি, নানা ভাষা, বিদেশীদের পক্ষে অচেনা অজানা দুর্গম পথঘাট নদী বনভূমি। তার নানা ধরণের মানুষের চরিত্র সম্পর্কে সে কিছুই জানে না। তাছাড়া সমস্ত স্তরের মানুষের ইংরাজদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ। বিদেশী শাসনের প্রতি বিরুদ্ধ মনোভাব, তার বিরুদ্ধে জনগণের নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম, অভ্যুত্থান, গেরিলা মুক্তি যোদ্ধাদের আকস্মিক আক্রমণ। মফস্বলে ইংরাজ বণিকদের প্রতি সন্দেহ, অবিশ্বাস, আশংকা তেমনি ভারতীয় জনগণ সম্পর্কে তাদেরও ভয় ও আশংকা। ভারতীয় "স্বাধীন" বণিক শ্রেণীর বিরুদ্ধাচরণ। এই প্রতিকূল পরিস্থিতিতে গড়ে তুলতে হবে বৃটিশ পণ্যবিক্রয়ের বহু বাজার, বৃটিশ পণ্য শহর থেকে নিয়ে যেতে হবে এই সব বাণিজ্য কেন্দ্র গুলিতে, সেখান থেকে কাঁচামাল বয়ে আনতে হবে শহরে বৃটেনের কল কারখানার জন্য। বাধ্য করতে হবে কৃষকদের সেই কাঁচামালের চাষ-আবাদ করতে, সময়মত সস্তায় সমস্ত ফসল বিক্রী করতে; সংগ্রহ করতে হবে অসংখ্য ক্রেতা, কুটির শিল্পগুলি একেবারে ধ্বংস করে ফেলতে হবে। এবং বিলাতী পণ্য কেনার আগ্রহ সৃষ্টি করতে হবে; উৎপাদক, ক্রেতা, দালাল সকলের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতে হবে। এইরকম আছে অসংখ্য অসুবিধা। স্থায়ী বাজার গড়তে হলে সেই সব অসুবিধা, বাধা বিপত্তিগুলো অপসারণ করা দরকার। এই সব সমস্যার

সুষ্ঠু সমাধান চাই। কিন্তু এই সব সমস্যার সমাধান নির্ভর করে কয়েকটি জরুরী ব্যবস্থার উপর। চাই শান্তিশৃংখলা স্থাপন, চাই পুঁজি, ভারতীয়দের সঙ্গে যৌথ ব্যবসা বাণিজ্য, আর তাদের শাসন ও শোষণে ভারতীয় অংশীদার— যারা তাদের উপনিবেশ কায়েম রাখার কাজে সমস্ত বিষয়ে সাহায্য করবে। সারাদেশে শান্তি শৃংখলা স্থাপনের জন্য একান্ত প্রয়োজন হয়ে উঠ্‌লো দমন যন্ত্র গুলি অর্থাৎ যে যন্ত্রটির সাহায্যে তারা কোটি কোটি ভারতীয়কে দমন করে রাখতে সক্ষম হবে—সেই রাষ্ট্র যন্ত্রটিকে উপনিবেশ শাসনের উপযোগী করে গড়ে তোলার। স্বাভাবিক ভাবেই সামরিক ও পুলিশী ব্যবস্থা, প্রশাসনিক ব্যবস্থা জোরদার করার কথা তাদের ভাবতে হল। তা না করলে কি করে তারা স্থায়ী ভাবে দমন করে রাখবে তার জনগণকে, কি করে দমন করতে পারবে তাদের অভ্যুত্থান, কি করে গড়ে তুলবে ব্যবসা বাণিজ্যের অনুকূল পরিবেশ। সেজন্য দরকার এমন যোগ্য ও বিশ্বস্ত লোকজন যারা বিদেশী শাসকবর্গ, আর দেশীয় লোকজনদের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করে এদেশে বৃটিশ স্বার্থ সুরক্ষিত করার দায়িত্ব বিশেষ দক্ষতার সঙ্গে ও যোগ্যতার সঙ্গে পালন করতে সক্ষম। কিন্তু ক্ষুদ্র বৃটেনের পক্ষে এই বিশেষ ধরণের এত লোকজন সরবরাহ করার কোন প্রশ্নই ওঠে না। স্বভাবতঃ সামরিক ও পুলিশ বাহিনীতে, প্রশাসনিক যন্ত্রের জন্য প্রয়োজনীয় লোকজনের সমস্যা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠল। এই দেশ থেকেই এত লোকজন সংগ্রহ করতে হবে, তারা এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করে পারেনি। একমাত্র তাদের অনুগ্রহ পুষ্ট ধনী শিক্ষিত অভিজাতদের সন্তান সন্ততিদের পক্ষেই সম্ভব এই ধরণের প্রশাসন যন্ত্রে অংশ গ্রহণ করা। সুতরাং তাদের মধ্য থেকেই এই লোকজন সংগ্রহ করা ছাড়া কোন উপায় ছিল না। নিঃসন্দেহে তারই পাশাপাশি তারা অনুভব করেছিল যে ভারতে যদি টিকে থাকতে হয় তাহলে ধনী হিন্দু অভিজাত শ্রেণীরই সহায়তা গ্রহণ করতে হবে এবং সেজন্য তাদের মধ্যে বৃটিশ শাসনকে নানা ভাবে জনপ্রিয় করে তুলতে হবে আর সেজন্য এমন কিছু কাজ করা প্রয়োজন যা তাদের আকৃষ্ট করবে অথচ তার জন্য শাসকবর্গকে ব্যয় করতে হবে না এমন কিছু।

তাছাড়া তারা আরো একটি বিষয়ে চিন্তা না করে পারেনি তা হচ্ছে জনগণের বৃটিশ শাসন বিরোধী শক্তিকে ভেতর থেকে পঙ্গু করে ফেলার কথা। শুধু মাত্র প্রশাসন যন্ত্র আর সামরিক ও পুলিশ বাহিনীর উপর নির্ভর করে ভারতের মত একটি ইংরাজ বিরোধী দেশে স্থায়ী ভাবে জাতীয় অভ্যুত্থান গুলিকে দমন করে স্থায়ী উপনিবেশ গড়ে তোলা এবং তাকে কায়েম রাখা সম্ভব নয়। মোঘল আমলে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সমস্ত শ্রেণীর শ্রমজীবি মানুষের যে মিলিত শক্তি সামন্তবাদী শাসক শ্রেণীর বিরুদ্ধে বিপ্লবী ঐক্য গড়ে তুলেছিলেন—যে ঐক্যের ভিত্তিতে সেদিন জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণী ও কারিগর শ্রেণী সামন্ততন্ত্রের অভ্যন্তরে ব্যবসা বাণিজ্য ও শিল্প-পণ্য উৎপাদনে নিজেদের অধিকার

প্রতিষ্ঠার, ব্যক্তি স্বাধীনতা অর্জনের এবং শাসকশ্রেণীর হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত ছিলেন—যা অন্যতম মূল কারণ হয়ে উঠেছিল মোঘল সাম্রাজ্য পতনের—সেই মিলিত শক্তি সেই বিপ্লবী ঐক্য বৃটিশ শাসকবর্গ আর তাদের পদলেহী দেশীয় ব্যবসায়ী মহাজন জমিদার শ্রেণী সকলের কাছেই উদ্বেগের কারণ ছিল। কেননা সেই বিপ্লবী শক্তিই এখন ইংরাজ শাসনের বিরুদ্ধে তার সামন্ত শাসন বিরোধী লড়াইকে পরিণত করেছে জাতীয় মুক্তি যুদ্ধে, জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর নেতৃত্বে। সেই মুক্তি যুদ্ধ দমন করা যায়নি তখনও। অপর-পক্ষে ওয়াহবী বিদ্রোহের পথ ধরে নতুন করে আর একটি দীর্ঘস্থায়ী মুক্তি যুদ্ধের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে সারা দেশ জুড়ে। তা উপলব্ধি করতে ধুরন্ধর ইংরাজদের একটুও ভুল হয়নি। এই বিপ্লবী শক্তিকে শুধু মাত্র বন্দুকের মুখে ধ্বংস করা যাবে না। তাকে বিনাশ করতে হবে ভেতর থেকে 'ভেদ-বিভেদের' আঘাত হেনে। কিন্তু দেশীয়দের সাহায্য ছাড়া বিদেশী আক্রমণকারীদের পক্ষে আদৌ সম্ভব ছিল না এই সব গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনা কার্যকরী করা। এসব পরিকল্পনা নিঃসন্দেহে সফল করে তোলা যায় অনুগ্রহ পুষ্ট ধনী অভিজাত শ্রেণী যদি সহায়তা করতে এগিয়ে আসে। আর কেনই বা তারা সাহায্য করবে না, তার বিনিময়ে তাদের যদি কিছু সুযোগ সুবিধা দেওয়া যায়। তারাই পারবে জনগণের আক্রমণের লক্ষ্যমুখ শাসকবর্গের দিক থেকে সরিয়ে দিতে। তারাই পারবে তাদের শিক্ষিত তরুণ সন্তান সন্ততিদের দেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে; তাদের বংশধররা যদি তার বিনিময়ে প্রশাসন যন্ত্রে অংশ গ্রহণের অধিকার পায়। অবশ্যই সে-ক্ষেত্রে এই সব শিক্ষিত তরুণদের বিপ্লবী চেতনা, জাতীয় মর্যাদাবোধ ধ্বংস না করলে তা সম্ভব হবে না। তবেই তাদের পরিণত করা যাবে এক ধরণের ক্রীতদাসে, যাদের কাছে অভিপ্রেত হয়ে উঠবে জাতীয় স্বাধীনতার চেয়ে ব্যক্তিগত সুখ স্বাচ্ছন্দ্য, বড় হয়ে উঠবে জাতীয় স্বার্থের চেয়ে ব্রিটিশ স্বার্থ।

অঢেল পুঁজিরও প্রয়োজন তা আগেই বলেছি। ভারতের মত বিরাট একটা দেশকে বৃটিশ শিল্পপণ্যের বাজারে পরিণত করার জন্য যে-বিপুল পরিমাণ মূলধন প্রয়োজন বৃটেনের মত ক্ষুদ্র একটি দেশের পক্ষে তা সরবরাহ করাও সম্ভব নয়। স্বভাবতঃ তাদের স্থির করতে হয়েছে মূলধন তাদের সংগ্রহ করতে হবে ভারত থেকেই। বিশেষ করে বাঙলার ধনকুবেরদের কাছ থেকেই তা সংগ্রহ করতে হবে। এদেশে যারা ইঃ ইঃ কোম্পানীর বণিকদের শোষণ লুণ্ঠনে নানাভাবে সহায়তা করে প্রচুর অর্থের মালিক হয়ে বসেছিল সেই সব ধনীদের টাকা খাটাবার ক্ষেত্র ছিল সীমাবদ্ধ। তারাও উৎসুক ছিল ইংলন্ডের বণিকদের মত ব্যবসা বাণিজ্যে অর্থ লগ্নী করার জন্য। এ-জন্যে তারাও ক্ষুব্ধ ছিল কোম্পানীর একচেটিয়া বাণিজ্যাধিকারে। তাদেরও বুঝতে দেরী হয়নি কোম্পানীর একচেটিয়া বাণিজ্যাধিকার থাকতে পারে না, বৃটিশ

পণ্যের জন্য বাজার খুঁজতে হবেই। সুতরাং তারাও ভাবছিল কি করে যৌথ ব্যবসা বাণিজ্য করা যায়—কেননা তাদেরও মনে প্রশ্ন ছিল ইংরাজরা কি এত মূলধন যোগাড় করতে পারবে? তাদেরও উপলব্ধি করতে ভুল হয়নি বৃটিশ পণ্যের বাজার কায়েম রাখার জন্যে যে ধরণের প্রশাসন চাই তাতে তাদের সন্তান সন্ততিদের চাকরীরও যে ব্যবস্থা হবে তা সুনিশ্চিত। ইংরাজদেরও উপায় ছিলনা এই সব ধনী পরিবারগুলির সাহায্য গ্রহণ করা ছাড়া। তাদেরও কিছুটা ক্ষতি স্বীকার করতে হবে বৈকি। কিছুটা লুন্ঠনের অংশ ভারতীয় ধনীদের দেবার ব্যবস্থা না করলে তারাই বা কেন এগিয়ে আসবে বিদেশীদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে। এত বড় দেশ। সেখানে কি শুধু ইংরাজ বণিকদের পক্ষে ব্যবসা বাণিজ্য করা সম্ভব? নিঃসন্দেহে উভয় দেশের বণিকদের যৌথ ব্যবসা বাণিজ্য গড়ে তুলতে হবে। অন্যথায়, বৃটিশ বণিকরা এত মূলধন সংগ্রহ করতে পারবে না। দেশীয়দের ব্যবসা বাণিজ্যে উৎসাহ দিলে তবেই তা সম্ভব।

সুতরাং অনুগত ধনী পরিবারগুলির সঙ্গে যৌথ ব্যবসা বাণিজ্য করার প্রয়োজন হয়ে পড়ল এবং এইভাবে বৃটিশ শিল্প পুঁজির প্রয়োজনে বৃটিশ পুঁজির সঙ্গে ভারতীয় বাণিজ্য পুঁজির মিলন ঘটবার সম্ভাবনা দেখা দিল। এইভাবে বৃটিশ পুঁজির পাহারাদার হয়ে উঠল ভারতীয় দালাল (Comprador) বুর্জোয়া শ্রেণী; আর এই ভাবেই বিদেশী উপনিবেশিক শক্তির গর্ভে যাদের জন্ম সেই বেনিয়ান ফড়ে, জমিদার, গোমস্তা, দেওয়ান, দালালদের ওই শক্তির দেশীয় সহযোগী শক্তি হয়ে উঠবার দ্বার উন্মুক্ত হোল।

কিন্তু এক নতুন সমস্যার সম্মুখীন হতে হলো উভয় পক্ষকে। দেশী বিদেশী উভয় পক্ষের ব্যবসায়ী বুর্জোয়াদের যৌথ ব্যবসা বাণিজ্য গড়ে তোলার, পুঁজি সঞ্চয়ের ও সংগ্রহের, প্রশাসনিক কাজে প্রয়োজনীয় যোগ্য লোকজন সংগ্রহের ব্যাপারে দেখা দিল এক নতুন সমস্যা।

উল্লিখিত পরিকল্পনাগুলি কার্যকরী করার পথে নতুন বাধা হয়ে দাঁড়াল সামাজিক ও ধর্মীয় অনুশাসন, আচার ব্যবহার, প্রথা, সংস্কার। পুঁজির বিপুল পরিমাণ অপচয় হচ্ছিল ঐ ধর্মীয় ও সামাজিক কাজকর্মে। কোম্পানীর অনুগ্রহ পুষ্ট লোকেরা- বেনিয়ান, কর্মচারী, গোমস্তা, দালাল, ফড়ে, জমিদার, মহাজন— এরা প্রভূত পরিমাণ অর্থ উপার্জন করলেও অনেকেই অপরিমিত ব্যয় করছিল ধর্মীয় কার্যে। ফলে যে পরিমাণ মূলধন সঞ্চিত হওয়ার প্রয়োজন ছিল তা আশানুরূপ সঞ্চিত হচ্ছিল না। এই অর্থ ব্যয় ছিল বৃটিশ পুঁজিপতির কাছে দেশীয় পুঁজিরই অপচয়। এ-সম্পর্কে Economic History of Bengal, 1793-1843, vol. III-এ উল্লেখ করা হয়েছে "..... in Bengal in the nineteenth century the abandon that characterised the Bengali character was most manifest in his religious extravagance, religious endowments, expenditure on religious ceremonies

and construction on religious obligations that very much hampered the growth of capital accumulation. Hinduism, a religion of exuberance as also asceticism, created a sense of social values that was most certainly not conducive to the worship of money." (by N. K. Sinha, p 96).

এ-বক্তব্য যে কত সত্য তা হিন্দু ধনীদের উইল থেকেও জানা যায়। উল্লিখিত গ্রন্থে আরও উল্লেখ করা হয়েছে "Religious ceremonies and acts dominated social conciousness." শ্রাদ্ধে এত ব্যয় করা হত যে বলা হয়েছে : "The cost of dying was perhaps greater than the cost of living" তাঁদের উইল থেকে জানা যায় যে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হত নানা ধর্মীয় কাজে, ধর্মীয় অনুষ্ঠানে, শ্রাদ্ধে, মন্দির নির্মাণে, বিগ্রহ প্রতিপালনে, তীর্থ ভ্রমণে, ব্রাহ্মণ বিদায়ে এবং এই রকম অসংখ্য ক্রিয়াকর্মে। বলা হয়েছে, "Pilgrims to Mathura, Brindaban and Jagannath Puri and Benaras were regularly undertaken by those moneyed men and money was spent very lavishly in these religious places" (ibid)

এই সব অনুষ্ঠান, ক্রিয়া-কর্ম থেকে ব্রাহ্মণরা প্রচুর অর্থ উপার্জন করতেন। স্বাভাবিক ভাবেই তাঁরা সংগঠিত ভাবে এই সব ধর্মীয় ক্রিয়াকর্ম, পুজো, বিভিন্ন অনুষ্ঠান, তীর্থ যাত্রা সম্পর্কে অলৌকিক ধারণা পুরোমাত্রায় বজায় রাখার জন্য যেমন নিজেরা ছিলেন সক্রিয় উদ্যোগী তেমনি ধর্মবিশ্বাসীদেরও উৎসাহী করে তুলতেন অক্ষরে অক্ষরে এগুলো মেনে চলতে। তাঁরা প্রত্যক্ষ ভাবে বা পরোক্ষে জাতিভেদ প্রথা, অস্পৃশ্যতা, বর্ণ বৈষম্য, মূর্তিপুজার বিলুপ্তির প্রশ্নে প্রতিবন্ধকতাই সৃষ্টি করতেন। তার অর্থই হলো তাঁরা বৃটিশ পুঁজিপতি বা দেশীয় ব্যবসায়ীদের আমদানী রপ্তানীর বাণিজ্য গড়ে তোলার পথে বাধাই সৃষ্টি করেছিলেন। উল্লিখিত গ্রন্থের লেখক শ্রদ্ধেয় এন, কে, সিন্‌হা তাই মন্তব্য করেছেন।

",Ward was not exaggerating when he wrote, 'The whole fabric of superstition is the work of the Brahmins."

শুধু পুঁজির ব্যাপারেই নয়, (ইংরাজ বণিক বা পার্শী, আর্মেনিয়ান, মুসলমান বণিকদের সঙ্গে) যৌথ ব্যবসা বাণিজ্য গড়ে তোলার পথে এমন কি সাধারণভাবে বাণিজ্য করার এবং প্রশাসনিক কাজে যোগদানের ক্ষেত্রেও অন্তরায় হয়ে উঠল এই সব ধর্মীয় বিধান এবং সামাজিক প্রথা গুলি। বিশেষ করে জাতিভেদ প্রথা। শুধু বাণিজ্য করতে গেলে অপরিহার্য প্রয়োজন অবাধ মেলামেশা, একত্রে আহার, বসবাস এবং চলাফেরা। সমুদ্র যাত্রা, গঙ্গার বুকে জাহাজ চলাচল করা, গঙ্গার তীর গুলি বাঁধা, মদ আফিং চামড়া ইত্যাদি নিষিদ্ধ দ্রব্যের ব্যবসা, কোন কোন

ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান বর্জন, বিদেশী আচার ব্যবহার বা পোষাক পরিচ্ছদ গ্রহণ করা এ-সবও দরকার। কিন্তু হিন্দু মতে অবাধ মেলা মেশা, একত্রে আহার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। অন্যান্য গুলিও ধর্মীয় অনুশাসন বিরুদ্ধ এবং দন্ডনীয় অপরাধ। কাজেই ধর্মীয় বিধান লঙ্ঘন করা ছাড়া কারুর পক্ষে সম্ভব ছিল না প্রকাশ্যে এ-সব কাজ করা। জাতিভেদপ্রথা বা অস্পৃশ্যতা অমান্য করা বা বর্ণগত পেশা ত্যাগ করা ছিল কল্পনাতীত ঘটনা, বিশেষ করে উচ্চ বর্ণের হিন্দু সমাজে। আর সাধারণত উচ্চ বর্ণের হিন্দুদের হাতেই জমে উঠছিল ধন সম্পদ।

কেউ একাজে সাহসী হয়ে উঠলে তাকে শুধু সমাজচ্যুত করা হতনা বিভিন্ন প্রকার শাস্তি ও নির্যাতনের ব্যবস্থা ছিল। সুতরাং দেশী বিদেশী ব্যবসায়ী বুর্জোয়াদের কাছে সর্বাধিক প্রয়োজন হয়ে উঠল এই ধর্মীয় বাধাগুলো অর্থাৎ প্রচলিত বিধানগুলো লঙ্ঘন করা। একদিকে এই অবস্থায় বৃটিশ পণ্যের বাজার গড়ে তুলতে হবে অন্যদিকে তার পূর্ব শর্তগুলি প্রতিষ্ঠা করার পথে ধর্মীয় বাধা—এই উভয় সংকটের মুখে দাঁড়িয়ে ইংরাজদের পক্ষে অন্য কোনো উপায় ছিল না পুরোহিত শ্রেণীর প্রভাব প্রতিপত্তি খর্ব করা এবং তাদের নিয়ন্ত্রণ থেকে হিন্দু ধনকুবেরদের মুক্ত করা ছাড়া, যারা শুধু যৌথ ব্যবসা বাণিজ্যে অংশ গ্রহণই নয় ইংরাজ শাসকবর্গকে সহযোগিতা করতে ইচ্ছুক হতে পারে। কিন্তু একাজ যেমন আইন প্রয়োগ করে করা অসম্ভব তেমনি খৃষ্টান পাদ্রীদের পক্ষেও সম্ভব নয়। বহু পূর্ব থেকেই ইংরাজরা এইসব বাধা সম্পর্কে বিশেষতঃ পুরোহিত শ্রেণীর প্রভাব প্রতিপত্তি, তাদের অনুশাসন সম্পর্কে সচেতন ছিল। তারা প্রথম থেকেই চেষ্টা করেছিল হিন্দুদের খৃষ্টান ধর্মে দীক্ষা দেবার এবং এইভাবে ভারতীয়দের সঙ্গে ধর্মীয় ঐক্য গড়ে তুলে এদেশে ধর্মীয় সমর্থক শ্রেণী সৃষ্টি করার। কিন্তু তারা যে যিশুখৃষ্ট প্রভাবিত ধর্মীয় জগত গড়ে তুলতে চেয়েছিল তাতে তারা ব্যর্থ হয়েছে। তাছাড়া তারা একটি নিরপেক্ষ নীতি গ্রহণ করতে বাধ্য হল ক্ষমতা দখলের সঙ্গে সঙ্গে। পূর্বে তারা ছিল শুধুমাত্র ব্যবসায়ী, এখন এদেশের শাসক-বর্গ। সুতরাং তাদের ভয় ও আশংকা পাছে প্রভাবশালী ব্রাহ্মণ শ্রেণী মনে করতে পারে এই ধর্মান্তরিত করার কাজ তাদের ধর্মে প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ ; ফলে তারা যে ইংরাজদের বিরুদ্ধাচরণ করবে তাতে সন্দেহ নেই। স্বভাবতই ধর্মান্তকরণ করার পুরানো কৌশলটি মাত্র সাময়িকভাবে পরিহার করলো। শ্রদ্ধেয় ইকবাল সিংহ বলেছেন ঃ

"This policy was not necessarily dictated by any spirit of tolerance and respect for other men's faith. It was essentially inspired by the practical consideration that it was the least likely to create difficulties and complications for them "(8)

কিন্তু তা বলে তারা হিন্দু ধনী অভিজাত শ্রেণীর সঙ্গে এক ধরণের সামাজিক ঐক্য গড়ে তোলার পরিকল্পনা পরিহার করল না। তারা উপলব্ধি

করেছিল এই ঐক্য সম্ভব এবং সেই ঐক্য সৃষ্টির জন্য তাদের গ্রহণযোগ্য এমন একটি ধর্মীয় জগত গড়ে তোলা দরকার—যে জগত হবে খৃষ্টান জগতেরই অনুরূপ এবং যেখানে অবাধ মেলামেশার দ্বার উন্মুক্ত হয়ে যাবে তাদের সামনে। শুধু সেই ধর্মীয় জগত গড়ার ব্যাপারে তাদের একমাত্র বিবেচ্য বিষয় হয়ে ওঠে পুরোহিত শ্রেণী যেন মনে করতে না পারে—শাসকবর্গই হস্তক্ষেপ করছে তাদের ধর্মে। কিন্তু এ-কাজ একমাত্র দেশীয় উচ্চবর্ণের শিক্ষিত হিন্দুদের সম্মিলিত প্রচেষ্টাতেই সম্ভব এবং তাদের সম্মিলিত প্রতিরোধই হল পুরোহিত শ্রেণীর প্রভাব প্রতি-পত্তি, তাদের অনুশাসন অগ্রাহ্য করার অর্থাৎ ধর্মীয় অন্তরায় অপসারণের সর্বোৎকৃষ্ট এবং একমাত্র উপায়। সুতরাং শুধুমাত্র ধর্মীয় বাধা অপসারণের প্রশ্নেই নয়, উপনিবেশ স্থাপনের সমস্ত প্রশ্নেই অনুগ্রহপুষ্ট ধনী অভিজাত শ্রেণীর পরিবারগুলিকে একটি বিশেষ সমর্থক শ্রেণী হিসাবে, তাদের সহযোগী শক্তি হিসাবে সংগঠিত করার অর্থাৎ একটি বিশেষ সংগঠনের মধ্যে একত্রিত করার জরুরী প্রয়োজন হয়ে ওঠে—যারা তাদের সর্বতোভাবে সাহায্য করবে তাদের নতুন উপনিবেশ স্থাপনে। এরাই হবে তাদের দেশীয় প্রথম দালাল (Comprador) বুর্জোয়া শ্রেণী। যাদের জন্ম বিদেশী শিল্প পুঁজির সঙ্গে দেশীয় পুঁজির, বিদেশী স্বার্থের সঙ্গে দেশীয় স্বার্থের মিলনের ফল। অবশ্যই এ-কাজ একমাত্র সম্ভব দেশীয় উচ্চবর্ণের শিক্ষিত হিন্দুদের যৌথ উদ্যোগে ও নেতৃত্বে।

যখন থেকে ভারতকে বাজার হিসাবে গড়ে তোলার প্রস্তুতি চলছিল তখন থেকেই ইংরাজরা চিন্তা ভাবনা করছিল কি ভাবে দেশের মধ্যে তাদের সামাজিক ভিত্তি গড়ে তোলা যায়। তারা তখন থেকেই প্রশাসন যন্ত্র শক্তিশালী করে তোলার কাজ সুরু করে দেয়। এই সময়টা অর্থাৎ অবাধ বাণিজ্য নীতির ঘোষণার পূর্ব পর্যন্ত বছরগুলো তাদের প্রস্তুতির যুগ।

"In 1786 Lord Cornwallis was sent as Governor General to carry through drastic changes in administration, He sought to end the previous arbitrary continual increases of land revenue, which was turning the country into jungle and destroying the basis of exploitation, by the experiment of the Permanent Land Settlement in Bengal, which established a new landlord class as the social basis of British Rule, with a permanently fixed payment to the Govt." (I. T. T-p-47)

শ্রদ্ধেয় নরহরি কবিরাজ মহাশয়ও উল্লেখ করেছেন "কোম্পানীর বড় কর্তারা ক্রমশই অনুভব করতে লাগলো যে সমগ্র দেশটার উপর যদি স্থায়ীভাবে ও আরো বিজ্ঞানসম্মত ভাবে শোষণ চালাতে হয়, তাহলে কোম্পানীর শাসনেরও একটি সামাজিক ভিত্তি প্রয়োজন। তাই শুরু হলো দেশের ভেতর এমন কতক-

গুলি সামাজিক স্তরের সৃষ্টি করা যা কোম্পানীর আমলকে এদেশে বাঁচিয়ে রাখতে তৎপর হবে।" (৫) মিঃ আর; পি, ডাট্ বলেছেন ঃ All these measures were intended as reforms. In reality they were the necessary measures to clear the ground for the more scientific exploitation of India in the interests of the capitalist class as a whole. They prepared the way for the new stage of exploitation by industrial capital, ..."(৬)

স্বাভাবিক ভাবেই এই "প্রস্তুতির" সময় স্থায়ী উপনিবেশিক শোষণের পথে অর্থাৎ পুঁজিসঞ্চয়, প্রশাসনিক কাজের জন্য লোকজন সংগ্রহের ব্যাপার, যৌথ ব্যবসা বাণিজ্য গড়ে তোলার ক্ষেত্রে যে ধর্মীয় বাধাগুলি অন্তরায় হবে সে-গুলি ভারতীয়দের সাহায্যে অপসারণের চিন্তা ভাবনা তারা না করে পারেনি।

"In 1813 the offensive of the industrialists and other trading interests was at last successful and the monopoly of the East India company in trade with India was ended. The new stage of Industrial capitalist exploitation of India may thus be dated from 1813. The proceedings of the parliamentary enquiry of 1813 showed how completely the current of thought was now directed to the new aim of the development of India as a market for the rising British machine industry." (৭)

এই নীতি ভারতকে এক বিপর্যয়ের মুখে এনে দিল। ইংলণ্ডের শিল্প বিপ্লব ইংলণ্ডের কৃষকদের মুক্ত করল ভূমিদাসত্ব থেকে, কারিগরদের কুটির শিল্প থেকে, ব্যবসায়ীদের অর্থ লগ্নী করার ক্ষেত্র করল প্রসারিত। কিন্তু ভারতে শিল্প সমৃদ্ধ নগরগুলিকে ও বাণিজ্য কেন্দ্রগুলিকে ধ্বংস করল, তার গ্রামগুলিতে বেকার মানুষের, জীবিকাচ্যুত মানুষের ভিড় বৃদ্ধি করল। তাকে প্রকৃতপক্ষে শুধুমাত্র কৃষি নির্ভরশীল দেশে পরিণত করল। মিঃ ডাট্ বলেছেন ঃ

In this way India was forcibly transformed .... into an agricultural colony of British manufacturing capitalism" p-49

তাছাড়া ভারতবর্ষ পরিণত হল—বৃটিশ শিল্পগুলির জন্য কাঁচামাল সরবরাহের দেশে। এটাও করা হল এই বিবেচনা থেকে যে ভারতীয়দের ক্রয় ক্ষমতা না বাড়ালে কারা কিনবে বৃটেনের শিল্প পণ্য। মিঃ আর, পি, ডাট্ লিখেছেন ঃ

"This policy of the industrial capitalists, namely, to make India the agricultural colony of British capitalism, supplying raw materials and buying manufactured goods, was explicitly set out by the president of the Manchester Chamber of

Commerce, Thomas Bazley in 1840 : 'In India there is an immense extent of territory, and the population of it would consume British manufactures to a most enormous extent. The whole question with respect to our Indian trade is whether they can pay us, by the products of their soil, for what we are prepared to send out as manufactures,' (৮)

স্বভাবতই তাদের মনযোগ দিতে হল ভারতে পণ্য ও খাদ্যশস্যের চাষ আবাদের দিকে এবং অঢেল ক্ষমতা দেওয়া হল জমিদার শ্রেণীর হাতে যাতে তারা থানার সাহায্য নিয়ে কৃষকদের চাষ আবাদ করতে, সময়মত ও সস্তায় তাদের সমস্ত শস্য এদের কাছে বেচতে বাধ্য করতে পারে। তাছাড়া বৃটেনের পক্ষে তার কলকারখানার জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচা মাল উৎপাদন করা সম্ভব ছিল না। প্রকৃত পক্ষে অবাধ বাণিজ্যনীতি শ্লোগানটা ছিল ভারতের বাণিজ্যপুঁজির একচেটিয়া ক্ষেত্রগুলিতে শিল্পপুঁজির অনুপ্রবেশ ঘটাবার হাতিয়ার স্বরূপ। ফলে ভারতেও বৃটিশ শিল্পপুঁজির সমর্থকরা অবাধ বাণিজ্যনীতি কায়েম করার জন্য জোর প্রচেষ্টা চালায় এবং ভারতীয় ধনী অভিজাত শ্রেণীর সাহায্য নিতে অবহেলা করেনি। কিন্তু ভারতে এই নীতি চালু করার আর এক অর্থ হল ভারতকে একদিকে বৃটিশ শিল্প পণ্যের বাজার হিসাবে এবং অন্যদিকে 'বৃটেন'কে তার প্রয়োজনীয় কাঁচামাল ও খাদ্য দ্রব্য 'সরবরাহের ক্ষেত্র' হিসাবে তৈরীকরা এবং স্থায়ীভাবে ব্যবহার করা। এই অবাধ বাণিজ্য নীতি বাঙলাদেশে তথা ভারতে কোনো শিল্প বিপ্লব ঘটায়নি বরং তার নিজস্ব শিল্পগুলিকে ধ্বংস করেছে। কিন্তু একটা দেশ শুধুই আমদানী করবে আর অন্য একটি দেশ শুধুই রপ্তানী করবে এই অবস্থাটা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যে অস্বাভাবিক অবস্থার, যে বাণিজ্যিক সমস্যার সৃষ্টি করে ভারতের ক্ষেত্রেও অনিবার্য ভাবেই সেই একই সমস্যা ঘটবার সম্ভাবনা দেখা না দিয়ে পারেনি। এই পরিপ্রেক্ষিতেই লর্ড বেন্টিক লিখেছিলেন ঃ

If all the ancient articles of the manufacturing produce of India are swept away and no new ones created to supply this vacuum on the exports how will it be possible for commerce to be carried on and how can any remittance on private or public account be made to Europe ? If bullian alone is to supply the balance soon will the time arrive when

....it will no longer be possible to realise the revenue at its present nominal amount. It is therefore the bounden duty of Govt. to neglect no means to which may call for the vast productive powers of the country now lying in rest from the want of adequate encouragement.

এমনি সময় ইংরাজ শাসকবর্গ যখন ভারতে তাদের শোষণ ও শাসন স্থায়ীভাবে কায়েম করার জন্য অর্থাৎ তাকে স্থায়ী উপনিবেশে পরিণত করার চেষ্টা করছে, যখন সে বৃটিশ শাসন বিরোধী ভারতীয়দের সশস্ত্র সংগ্রামগুলিকে নির্মমভাবে দমন করার জন্য সর্বতোভাবে চেষ্টা করছে, এবং নানাভাবে প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করছে দেশীয় ধনী অভিজাত সম্প্রদায়কে—যাতে তারা ইংরাজদের পক্ষে বিশ্বস্ত ভৃত্যের ভূমিকা গ্রহণ করে এবং জাতীয় স্বার্থের বিরোধীতা করতে কুণ্ঠিত না হয়—; যখন দেশের কোটি কোটি মানুষকে পায়ের নিচে দাবিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন প্রকার দমনপীড়ন মূলক পন্থার অনুসন্ধান করছে, যখন হাজার হাজার স্বাধীনতাকামী মানুষ বিদেশী শাসন উচ্ছেদের জন্য মরণপণ লড়াই করে চলেছে; ভারতীয় জনগণের সেই দুঃসময়ে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে প্রতিটি ভারতবাসীর, প্রতিটি স্বাধীনতাকামী মানুষের কর্তব্য ছিল দেশের জাতীয় শত্রুকে উচ্ছেদ করে দেশকে বিদেশী শাসন থেকে মুক্ত করা এবং সেই মহৎ উদ্দেশ্যকে সফল করে তোলার জন্য জনগণের সংগ্রামকে আরও তীব্র করে তোলা। জগতশেঠ, উমিচাঁদ মির্জাফর, পাশী শেঠ, আর্মেনিয়ান, হুগলীর বণিক সমাজ ও কয়েকটি মুসলমান ছাড়া অন্য কেউই ইংরাজদের পক্ষে ছিল না। বৃটিশ শাসকবর্গের সঙ্গে ভারতীয় জনগণের এই মূল বিরোধে দেশের কোন শ্রেণী কি ভূমিকা গ্রহণ করেছিল, কে কার শিবিরে আশ্রয় নিয়েছে, সেদিন এই ঘটনাগুলিই ছিল তৎকালীন অবস্থায় কোনো ব্যক্তি বা শ্রেণীর দেশপ্রেম বা দেশদ্রোহিতা যাচাই করার একমাত্র মানদণ্ড, শত্রু মিত্র নির্ণয়ের একটিই মাত্র কষ্ঠি পাথর। কিন্তু সেদিন দেখা গেল কোলকাতার কতিপয় উচ্চবর্ণের শিক্ষিত ধনী ব্যক্তি দেশের বিদ্রোহী জনগণের দিকে মুখ না ফিরিয়ে সংগঠিত ভাবে পা বাড়ালেন সম্পূর্ণ উল্টো পথে। শুধু তাতেই তাঁরা ক্ষান্ত হলেন না, তাঁরা সক্রিয় হয়ে উঠলেন—অন্যদেরও উদ্বুদ্ধ করতে যাতে তাঁরাও তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেন। এই ভাবে সকলকে সংগঠিত করে একটি নতুন ধরণের শিবির গড়তে উদ্যোগী হলেন। বহু পূর্ব থেকে তাঁরা তাঁদের কর্মক্ষেত্রে ইংরাজ বণিকদের বা কোম্পানীর কর্মচারীদের নানা ভাবে সাহায্য করে বহু অর্থ উপার্জন করেছিলেন। এদেরই মধ্যে একজন প্রভাবশালী উচ্চ শিক্ষিত ব্রাহ্মণ এতদিন ছিলেন রঙপুরে। ছিলেন দীর্ঘদিন কোম্পানীর উচ্চ পদস্থ কর্মচারী জন ডিগবীর খাস মুন্সি বা দেওয়ান। একজন ধনী মহাজনও। কোলকাতায় ছিল লেনদেনের ব্যবসায়ে বিরাট সুদী কারবার। ডিগবী ১৮১৪ খৃষ্টাব্দের মাঝামাঝি ভারত ছেড়ে চলে গেলে তার খাস মুন্সি স্থায়ীভাবে বসবাস করতে এলেন কোলকাতায়। প্রচুর অর্থ ব্যয় করে কোলকাতায় দুখানা বাড়ীও কিনলেন এই বছরেই। অল্প দিনের মধ্যে হয়ে উঠলেন কোলকাতার গণ্যমান্য ব্যক্তি। তাঁর কাছে আসা যাওয়া শুরু হল দেশবিদেশের প্রভাবশালী ব্যক্তিদের। ইংলন্ড থেকে শাসকবর্গের কোনো ইংরাজ মহিলা বা

পুরুষ এলে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসতেন ; আর সেই উপলক্ষে মাঝে মাঝে বিরাট নাচ গানের উৎসব চলত সারা রাত তাঁর বাড়ীতে। তাঁর জমকালো পোষাক, জাঁকজমকপূর্ণ আচরণ, আড়ম্বরপূর্ণ জীবন যাপন দেখে মনে হত তিনি যেন সত্য সত্যই ছিলেন এদেশের একজন রাজা। প্রথম জীবনে বেশ কিছু দিন ব্যস্ত ছিলেন বাবার ইজারা বিষয় সম্পত্তি দেখা শোনার ব্যাপারে। নীলকর আর ইংরাজ বণিকদের চড়াসুদে টাকা কর্জ দেবার কাজে, নিজের সম্পত্তি বেনামী করে রাখায়। কোম্পানীর উচ্চপদস্থ অফিসারের অধীনে এবং সরাসরি কোম্পানীর অধীনে চাকুরীতে বিভিন্ন স্থানে দীর্ঘ সময় তাঁর অতিবাহিত হয়। ইনিই হচ্ছেন হিন্দু ধর্ম ও সমাজ সংস্কার আন্দোলনের প্রধান নেতা এবং অন্যতম একজন প্রধান সংগঠক। তাঁর জীবনী লেখক শ্রদ্ধেয় ব্রজেন্দ্র নাথ বন্দোপাধ্যায় লিখেছেন ঃ "দেশীয় লোকের সহিত কাজ কর্মের সুবিধার জন্য সেকালের অনেক সাহেব বাঙালী 'বাবু' রাখিতেন। ইহাদিগকে দেওয়ান বলা হইত।" (রামমোহন রায়) ইনিও সেই বাঙালী বাবু। ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর বিশ্বস্ত ও অনুগ্রহপুষ্ট রাজা রাম মোহন রায়। "Notes on Bengali Renaissance". এর লেখক বলেছেন ঃ

Having setlled in Calcutta, Rammohon drew round him in the 'Atmiya Sabha" in 1815, an inner circle of aristocratic and new middle class liberals " এবং তাঁর "cheif supporters were three wealthy men of which the most notable was prince Dawarakanath Tagore and a group of learned Brahmins" (P-34 Religion movement in India by J. N. Farquhar M. A.)

তাঁর সহযোগীরা প্রায় সকলেই ছিলেন বিশাল ধন সম্পদের মালিক। তাঁদের মধ্যে কয়েকজনের নাম মাত্র উল্লেখ করা হলো। সর্বশ্রী কালিনাথ রায়, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রামচন্দ্র পন্ডিত বিদ্যাবাগীশ, বৈকুন্ঠনাথ রায়, রাধাপ্রসাদ রায়, রমানাথ ঠাকুর, চান্দার কুমার টেগোর, হরচন্দার ঘোষ ও গৌরী চার্ন বোনার্জী। এরা সকলেই জমিদার। রামনাথ ঠাকুর ছিলেন "বেনিয়ান"। রামমোহনের উদ্যোগে ও নেতৃত্বে ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে তাঁর সহযোগী বন্ধুদের নিয়ে গড়ে তোলা হল কোলকাতায় ক্ষুদ্রাকারে একটি (ধর্মীয়) সংগঠন আর তার নাম দেওয়া হল "আত্মীয় সভা"। আলোচ্য বিষয় হয়ে উঠল ধর্ম ও সামাজিক সমস্যা। বলা যেতে পারে এইটেই হল কোলকাতার দালাল ব্যবসায়ী বুর্জোয়া এবং জমিদার শ্রেণীর প্রথম সংগঠন। পরবর্তীকালে এই আত্মীয় সভারই নাম দেওয়া হলো "ব্রাহ্মসমাজ"। এই আত্মীয় সভাতেই প্রথম শুরু হয় ধর্ম ও সমাজ সংস্কার মূলক সমস্যা নিয়ে আলোচনা। তাঁদের আলোচনায় শুধু যে দেশীয়রা যোগ দিতেন তা নয়, ইংরাজরাও কেউ কেউ নানাভাবে এই সব আলোচনায় উৎসাহ দিতেন। এমনি করে শুরু হল সমাজে সম্পূর্ণ

এক নতুন ধরণের ধর্মীয় আন্দোলন। ধর্ম ও সমাজ সংস্কার করার আন্দোলন। যিনি কয়েক দিন পূর্বে ছিলেন জন ডিগবী সাহেবের মুন্সি, ইণ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারী, কোলকাতার একজন "বেনিয়ান" তিনি এখন ধর্ম সংস্কার আন্দোলনের নেতা। "রঙপুর ছাড়িয়া কলিকাতায় স্থায়ী বাসিন্দা হইবার পর রামমোহান "বেনিয়ানের" কাজ করিতেন। ইহার উল্লেখ সে-কালের সুপ্রীম কোর্টের জুরির তালিকায় পাওয়া গিয়াছে।" (৯)

রামমোহন প্রথমেই কোলকাতার হিন্দু অভিজাত ধনী সম্প্রদায়ের কাছে দুটি নতুন তত্ত্ব উপস্থিত করলেন। নতুন এবং নজীর বিহীন। তার একটি হল হিন্দুসমাজের অধঃপতন এবং অবনতির মূল কারণ সম্পর্কে এক বিরাট তত্ত্ব। কী সেই মূল কারণ?

(১০) "....those exceptional practices which not only deprive Hindoos in general of the common comfort of the Society but also lead them frequently to self destruction...."

" the present system of religion adhered to by the Hindus is not well calculated to promote their political interest....the multitude of religious rites and ceremonies and the laws of purification have totally disqualified them from undertaking any difficult enterprise....It is, I think, necessary that some change should take place in their religion, at least for the sake of their political advantage and social comfort."

(রামমোহন রচনাবলী ৪৬২ পৃঃ, হরফ প্রকাশনী) তিনি এই মন্তব্য করেছিলেন জন ডিগবিকে লেখা এক চিঠিতে।

সত্য কথা বলতে 'ধর্ম' বিশেষ শ্রেণী স্বার্থেরই সেবাদাসী। যখন সে ধর্ম কোন বিশেষ শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষা করতে পারে না বা তার বিরোধীতা করে তখন সেই শ্রেণী বা গোষ্ঠী সেই ধর্মকে নিজেদের সুবিধামতই পরিবর্তন করে। দেখা যাবে পৃথিবীতে বহু ধর্ম আছে যার পেছনে আছে এই ইতিহাস। দেখা যাবে যাকে বলা হয় "ঈশ্বরের বাণী" বা নির্দেশ তা নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্যে শাসকশ্রেণী ও তার পুরোহিত শ্রেণীর কারসাজি মাত্র। রামমোহন যদি ইংরেজদের স্বার্থে, নিজেদের শ্রেণী স্বার্থে পুরোহিত শ্রেণীর বিরুদ্ধে এরকম অভিযোগ করে থাকেন তাতে আশ্চর্য্য হবার কিছুই নেই। রামমোহনের মতে হিন্দু সমাজের দুঃখ দুর্দশা বা অধঃপতনের মূল কারণ উপনিবেশিক শাসন বা সামন্ত-শোষক-শ্রেণীর কায়েমী স্বার্থ নয়। তাদের অধঃপতনের মূল কারণ—মূর্ত্তি পূজা, ধর্মীয় আচার ব্যবহার, সামাজিক প্রথাগুলি। ইংরাজদের পরিবর্তে মূল শত্রু হিসাবে খাড়া করা হলো পুরোহিত শ্রেণীকে এবং সমস্ত দোষ চাপিয়ে দেওয়া হলো তাদেরই উপর।

"........In the rites, ceremonies and festivals of idolatory, they (Brahmines —লেখক) find the source of their comforts and future. They not only find to protect idol worship from all attacks but even advance and encourage it to the utmost of their power by keeping the knowledge of the Scriptures concealed from the rest of the people." (১১)

তাঁর মতে ব্রাহ্মণেরা শিষ্যদের বলে থাকেন যে,

" ... .. Believe whatever we (Brahmins—লেখক) may say—Do not examine or even to duck your scriptures—do not only consider us whatever may be our principles as gods on earth but humbly adore and propitiate us by sacrificing to us greater (if not the whole) of your property." (১২)

এই ভাবে প্রচলিত ধর্মীয় ক্রিয়া কলাপ ও সামাজিক প্রথার বিরুদ্ধে একটি নতুন বক্তব্য উপস্থিত করা হলো। কিন্তু যেহেতু এই নতুন মতের প্রবক্তা হিন্দু শিক্ষিত ব্রাহ্মণ—তাই পুরোহিত শ্রেণী বড়ই অসহায় বোধ করলেন। তবু সমাজের বৃহত্তম অংশের সহায়তায় বর্তমান বিপদ থেকে আত্মরক্ষার জন্য রামমোহনের বিরুদ্ধাচরণ করলেন। এই ধরণের বিরোধীতার যে তিনি সম্মুখীন হবেন তা তিনি জানতেন এবং জেনে শুনেই তিনি বিরোধিতা করেছিলেন। এই ভাবে হিন্দু ধনী অভিজাত শ্রেণীর মধ্যে অলোড়ন সৃষ্টি করে সমাজের একটি প্রভাবশালী অংশকে টেনে এনে যাতে সমাজের অভ্যন্তরেই একটি "পৃথক শিবির" গড়ে তোলা যায়। তিনি এটাও জানতেন যে ইঃ ইঃ কোম্পানীর এক চেটিয়া বানিজ্যাধিকারের সঙ্গে যাদের স্বার্থ অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত এবং যারা অবাধ বানিজ্যনীতির বিরোধী তারা তাঁর সঙ্গে যোগ দেবে না। তাই স্বাভাবিক কারণেই ধনী হিন্দু সমাজ দুটি ধর্মমতের ভিত্তিতে দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে গেল। শ্রদ্ধেয় অমিতাভ মুখোপাধ্যায় লিখছেন ঃ (১৩)

"The Hindu community became divided into two great parties. The Brahma Sabha and the Dharma Sabha. The principles of these Sabhas carried on their warfare in every part of Native Society, in every Tol, in every Chandimandhab in every Zenana."

শ্রদ্ধেয় রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ও একই কথা বলেছেন। কিন্তু মজার কথা রামমোহন যেমন ছিলেন ব্রাহ্মসভার নেতৃত্বে তেমনি ধর্মসভার নেতৃত্বে ছিলেন রাধাকান্ত দেব। রাধাকান্ত দেব ছিলেন—ইঃ ইঃ কোম্পানীর সমর্থক। ইংলন্ডে শিল্প পুঁজিপতিদের সঙ্গে বানিজ্য পুঁজিপতিদের যে লড়াই চলছিল, যদি বলা যায় এ লড়াই সেই একই লড়াই—তাহলে ভুল বলা হবে না। কিন্তু

যেহেতু রাধাকান্ত দেব ইঃ ইঃ কোম্পানীর নীতির সমর্থক অনেকের ধারণা তিনি প্রতিক্রিয়াশীল বা রক্ষণশীল। রাধাকান্ত দেব আদৌ গোঁড়া ছিলেন না। দালাল বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবিদের বিচারের মাপ কাঠিটিই যে—"প্রতিক্রিয়াশীল" সেটাই তারা বোঝে না।

রামমোহনের ধর্মমত সমর্থন না করলেও অনেকে তাঁর শিবিরে এসে ভীড় করল। ধর্মের আড়ালে এ লড়াই হচ্ছে দেশের দালাল বুর্জোয়া শ্রেণীর দুটি বিবদমান পক্ষের লড়াই। তাঁর নতুন মতের প্রতিষ্ঠা দেশীবিদেশী বণিক শ্রেণীর যে স্বার্থরক্ষা করবে এবং তাদের অনেক সুযোগ সুবিধা ও অর্থ উপার্জনের পথ উন্মুক্ত করে দেবে একথা অনেকের বুঝতে অসুবিধা হলেও সেদিন দেশীয় ব্যবসায়ী শ্রেণীর বুঝতে অসুবিধা হয়নি। তাই ইঃ ইঃ কোম্পানীর শাসন এবং একচেটিয়া বানিজ্যাধিকার থাকায় যারা এতকাল বঞ্চিত ও ক্ষুব্ধ ছিল, যাঁদের পুঁজি লগ্নী করার ক্ষেত্র ছিল সীমাবদ্ধ, সন্তান সন্ততিরা কোম্পানীর প্রশাসনে কাজ খুঁজছিল তারা সকলেই একে একে এসে ভীড় করতে লাগলো রামমোহনের শিবিরে। রামমোহনের শিবির তখন জমজমাট। বলা হয়েছে ঃ

"........quite a number of them came from the leisured and rich land owning families of Bengal. Other belonged to the wealthy middle class commercial as well as professional which was growing in numbers and influence parallel with the growth of the British power of which it was largely a creature" (১৪)

জানা যায় ১৮৩০ খৃষ্টাব্দের ২৩শে জানুয়ারী অবধি ৫০০ শিক্ষিত অভিজাত পরিবারকে তিনি সংগঠিত করেছিলেন। তাকে পৃষ্ঠে পোষকতা করতে এগিয়ে এসেছিলেন বিভিন্ন পেশার ইংরাজরা। মিঃ ইকবাল সিংহ বলেছেন ঃ

"he counted many friends and sympathisers among European merchants, tradesmen and professional men."

একই কারণে তারা এসে দাঁড়ালো রামমোহনের পেছনে। বলা হয়েছে ঃ

(১৫) "And for the good reason that private business men belonging to the ruling race had not yet acquired the privileged position nor the arogance which normally goes with privilege, that they were to acquire at a later stage of the British ascedancy in India. They still were, if anything, a relatively under privileged growth within an over privileged society. The Hon'ble company was highly jealous in guar ding its

trade monopoly."

"Natuarally, these stultifying restrictions were deeply resented by the merchants and professional men " " ...This underlying affinity of motives inevitably made them favourably disposed towards Rammohan Roy in whom they identified a kindered spirit whose friendship was much cultivating quite apart from consideration of business connection which some of them almost certainly had with him." (১৬)

উপরের উদ্ধৃতিগুলি থেকে তাঁর সংগঠন এবং আন্দোলনের রাজনৈতিক চরিত্র কি তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। বস্তুত এই আন্দোলনের মূলে ছিল শুধু পারলৌকিকমুক্তি নয় ইহলোকের বস্তুগত সুখ স্বাচ্ছন্দ্য, বৈষয়িক স্বার্থ অর্থাৎ বৃটিশ শাসনের অনুগ্রহপুষ্ট বুর্জোয়া আর জমিদার শ্রেণীর এবং তাঁদের প্রভু ইংরাজদের উপনিবেশিক স্বার্থ। ভারতের সেদিন মূল সমস্যা ছিল দেশের উপনিবেশিক শোষণ ও শাসনকে কি করে উচ্ছেদ করা যাবে। সুতরাং দেশের প্রধান কর্তব্য ছিল সেই উপনিবেশিক শক্তিকে উচ্ছেদ করার জন্য জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম গড়ে তোলা। জাতির মূল শত্রু ইংরাজদের আক্রমণ করা। কিন্তু ধর্ম ও সমাজ সংস্কার আন্দোলনের মধ্য দিয়ে জাতির সেই মূল প্রশ্ন থেকে ধনী অভিজাত শ্রেণীকে—যাঁরা জাতীয় সংগ্রামের নেতৃত্ব দিতে পারতেন—সমগ্র সেই শ্রেণীকে দূরে সরিয়ে রাখা হলো সেই মূল প্রশ্নকে ধামাচাপা দিয়ে। আর তার পরিবর্তে মূল সমস্যা হিসাবে তুলে ধরা হলো প্রচলিত ধর্মাচার আর সামাজিক প্রথার বিড়ম্বনাকে। কাজেই তাঁদের মুক্তির সংগ্রাম হয়ে উঠল ধর্ম এবং সমাজের সংস্কার সাধন আর "শাস্ত্র সম্মত" ধর্মকে রক্ষা করা। ফলে বিদেশী শত্রুকে আর তাদের দেশীয় বিশ্বস্ত সামন্ত শোষক শ্রেণীর পরিবর্তে হিন্দু সমাজের সামনে মূল শত্রু হিসাবে খাড়া করা হলো পুরোহিত শ্রেণীকে। অপর পক্ষে হিন্দু সমাজের মধ্যে ভেদাবিভেদ সৃষ্টি করে জাতীয় শক্তিকে পঙ্গু করে ফেলার এক অভিনব পন্থা সৃষ্টি হলো। মনে রাখতে হবে সারা দেশ জুড়ে তখন চলছে উপনিবেশিক শক্তি আর তার সহযোগী শক্তির বিরুদ্ধে জনগণের সশস্ত্র সংগ্রাম। ইংরাজদের একান্ত প্রয়োজন ছিল এই সশস্ত্র সংগ্রামগুলিকে ধ্বংস করা, ধনী অভিজাত শ্রেণীকে তা থেকে সরিয়ে রাখা এবং তাদের সাহায্যে জনগণ বিরোধী এমন একটি শক্তি সৃষ্টি করা যারা নিজেদের স্বার্থকে ইংরাজ স্বার্থের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে ফেলবে এবং উপনিবেশিক শক্তিকে সর্বোতভাবে সাহায্য করে এদেশে তাদের শাসন কায়েম রাখবে। এই লক্ষ্যকে সাফল্যমণ্ডিত করার সহজ উপায় হল জাতীয় সংগ্রামের বিপরীত বিন্দুতে বিকল্প সংগ্রাম গড়েতোলা এবং সেই সংগ্রামে দেশের প্রভাবশালী অংশকে সামিল করে জাতীয় সংগ্রামকে বিনষ্ট করা। ইংরাজের এই পুরানো "ভেদ বিভেদ সৃষ্টি করে শাসন কর" নীতিরই ফসল

পরবর্তীকালের সাম্প্রদায়িক সংগঠনগুলি যারা আজও জনগণের আন্দোলনকে পেছন থেকে ছুরিকাঘাত করে চলেছে। সেদিন এই নতুন আন্দোলন কার্যত বৃটিশ শাসন বিরোধী জনগনের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির ভূমিকাই গ্রহন করলো।

রামমোহনের ধর্মীয় উপদেশ বাক্যগুলি থেকে অনেকের মনে হতে পারে তাঁর নতুন ধর্মমত তাঁর দীর্ঘদিনের গবেষণালব্ধ ফল। তিনি অন্ততঃ তাই দাবী করেন। এমনকি খৃষ্টান মিশনারীরাও। প্রকৃত রহস্য ভেদ করা দরকার। আমরা দেখি তাঁর ধর্মমত ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের কেরী সাহেবের মুন্সী রামরাম বসুর ধর্মমতের ছায়ামাত্র।

আমরা দেখি ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে মুর্শিদাবাদে কোম্পানীর পদস্থ অফিসারের অধীনে দেওয়ান পদে নিযুক্ত থাকার সময় তিনি হিন্দু ধর্ম সম্পর্কে এক নতুন তত্ব সর্বপ্রথম উপস্থিত করলেন পন্ডিত মন্ডলীর সমক্ষে। "Tuhafat-ul-Muwahhidin" or "A Gift to the Monotheist" বাংলায় "একেশ্বর-বাদীদের উপহার" নামক একটি বই এই প্রথম লিখে তার ভুমিকায় ঘোষণা করলেন : " .... আমি জানতে পেরেছি যে সাধারণভাবে মানুষের পক্ষে এক অনন্ত সত্বার দিকে তাকানো অত্যন্ত স্বাভাবিক এবং সর্ব মানবের যেন এক মৌলিক বৈশিষ্ট। পরন্তু প্রত্যেক সম্প্রদায়ের কোন বিশেষ গুণবিশিষ্ট এক বা বহু দেবতার দিকে আকর্ষণ এবং কোন বিশেষ উপাসনা বা পূজা প্রণালীর বশবর্তী হওয়া এ সমস্তই বাহ্য লক্ষণ—যে গুলি অভ্যাস ও দলগত শিক্ষা থেকেই উদ্ভূত। এ সকল বাহিরের জিনিষ—অবান্তর গুণমাত্র।" বিভিন্ন ঘটনা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় তাঁর এই মতামত শ্রীরামপুর মিশনের কেরী সাহেবেরই বক্তব্যের প্রতিধ্বনি মাত্র। এই উইলিয়ম কেরীর অধীনে নিযুক্ত পন্ডিত রাম রাম বসুই ১৮০২ খৃষ্টাব্দে প্রথম ঘোষণা করেছিলেন—তার একটি পুস্তিকায় "একমেব দ্বিতীয়ম পরম ব্রহ্মের কথা"। (রামরাম বসু ও রামমোহন রায়-৪৬ পৃঃ)

১৮০১ সাল থেকেই রামরাম বসুর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল এবং রাম-মোহনেরও ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে যাতায়াত ছিল। রঙপুরে কোম্পানীর অধীনে কর্মরত অবস্থায় তিনি প্রথম পর্যায়েই নতুন ধর্মমত প্রচারে পরীক্ষামূলক ভাবে কাজ সুরু করেন। বলা হয়েছে "At Rangpur he had already made a modest expeiment by gathering around him a group of like minded persons .... it did serve to create to crystallise a community of interests." (১৭)

রামমোহনের জীবনীতে শ্রদ্ধেয় সুরজিৎ দাশগুপ্তও লিখেছেন : "রঙপুরে থাকাকালে রামমোহন স্বগৃহে ধর্মজিজ্ঞাসুদের নিয়ে একটি সান্ধ্য বৈঠকের ব্যবস্থা করেন এবং সেখানে তিনি যে-সব মতামত ব্যক্ত করতেন স্পষ্টতই তা লোকসিদ্ধ চিন্তাধারার বিপরীত ছিল। এই সান্ধ্য বৈঠকগুলি স্থানীয় জন-সাধারণের মধ্যে প্রচুর উত্তেজনা সঞ্চার করেছিল"।

"ফলে রঙপুরে আদালতের দেওয়ান গৌরীকান্ত ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে একটি বিরোধী দল গড়ে ওঠে।"

রামমোহনের এই মত যে ব্যবসায়ী বুর্জোয়াদের স্বার্থ রক্ষা করবে তা মাড়োয়ারী বণিকরাও জানতেন। সেইজন্য তাঁর সভায় তাঁরাও আসতেন। বলা হয়েছে ঃ

"That among the group that congegrated at his house for religious and philosophic discussion there were a number of local Marwari merchants .... that the Marwari businessmen who attached themselves to Rammohon Roy and his circle at Rangpur had aspirations to higher beatitudes is very likely." (১৮) আগেই বলেছি রামমোহন ছিলেন ইঃ ইঃ কোম্পানীর কালেক্টর জনডিগবীর খাসমুন্সী বা দেওয়ান। ডিগবী এসেছিল এদেশে প্রশাসনিক কাজে। ১৮০৫ থেকে ১৮১৪ খৃঃ অবধি রামমোহনের সঙ্গে জন ডিগবীর ঘনিষ্ট সম্পর্কের যুগ এবং এই সময়েই তাঁর অধীনে কাজ করেন। কিন্তু ১৮০১ খৃষ্টাব্দ থেকেই তাঁর পরিচয়। রামরাম বসুর সঙ্গেও পরিচয় ঘটে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে। বিভিন্ন কাগজ পত্র থেকে তা জানা যায়। রামমোহনের জীবনীকার শ্রদ্ধেয় ব্রজেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন ঃ "১৮০১ খৃষ্টাব্দে খুব সম্ভব কোলকাতাতেই তিনি জন ডিগবীর সহিতও পরিচিত হন। ডিগবী ১৮০০ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে এদেশে আসেন ·······ডিগবী বলিয়া গিয়াছেন যে তাঁহার সহিত রামমোহনের প্রথম পরিচয় হওয়ার সময় রামমোহনের বয়স সাতাইশ বছর ছিল। আমাদের হিসাবে উহা ১৮০১ খৃষ্টাব্দই হয়।" মিঃ ইকবাল সিংহও প্রায় একই কথা বলেছেন। বিভিন্ন ঘটনা থেকে এ-কথাও প্রমাণিত হয় যে একেশ্বরবাদ তত্ব তিনি ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ থেকে পেয়েছিলেন সদর দেওয়ানী আদালত ও ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ থেকে তাঁকে বিভিন্ন শাস্ত্র সম্পর্কে অভিজ্ঞ করে তোলা হয়।

তবে তাঁর ধর্মীয় কাজে অংশ গ্রহণের মূলে যার অনুপ্রেরণা বা 'তদবির' ছিল তিনি মনে হয় ঐ ডিগবীই। মিঃ ইকবাল সিংহও অন্ততঃ তাই বিশ্বাস করেন। তিনি লিখছেন ঃ

"It is highly probable, therefore, that Digby encouraged, if he did not originally inspire the idea that Rammohon should undertake translation of the more important vedantic texts from Sanskrit into English." (১৯)

জনডিগবীর এই প্রস্তাবের মূলে দুটি কারণের কথা উল্লেখ করেছেন মিঃ ইকবাল সিংহ। তার একটি কারণ ঃ

"At the sametime through his translation Rammohon's

own name should be brought to the notice of wider public than he could ever hope to reach through his writings in Persian and Sanskrit."(২০)

ইং ১৮১৩ সালে অবাধ বানিজ্যনীতি ঘোষনার পর ক্ষুদ্র পরিধির মধ্যে রামমোহনকে থাকতে দেখা গেল না। এবার একটি সংগঠন গড়ে তোলার এবং সংগঠিতভাবে একটি আন্দোলন পরিচালনায় তাঁর নেতৃত্ব গ্রহণের দিন এগিয়ে এলো। এই দিনটির জন্য অপেক্ষা করছিল ব্রিটিশ শিল্পপতিরা। তাই দেখা যায় শুধু ডিগবীই নয় রামমোহনের মতামতকে জনপ্রিয় করে তোলার জন্য দেশ ও বিদেশের খৃষ্টান পাদ্রীরা থেকে সুরু করে ইংলন্ডের বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবিরা অনেকেই, সরকার পক্ষে দেশবিদেশের পত্র পত্রিকাগুলি এমনকি শাসক বর্গের কেউ কেউ বিস্ময়কর ভূমিকা গ্রহণ করে।

মিঃ ইকবাল সিংহ বলেছেন :

(২১) The fact that he had won an apprieciable audience in the west raised his standing and authority among his own ... As was often to happen since, the seal and sanction of western, and in particular British recognition of his merits helped to create a legend around his personality. This legend in its turn greatly enhanced his prestige and reputation in India."

অবাধ বানিজ্যনীতি ঘোষণার পর ১৮১৪ খৃষ্টাব্দেই রামমোহন সেই সংগঠন গড়ে তুললেন কোলকাতায় এবং গ্রহণ করলেন তার নেতৃত্ব। তাঁর ধর্ম ও সমাজ সংস্কারের আন্দোলন থেকে অর্জিত হল উপনিবেশ স্থাপনের স্বপক্ষে অনেকগুলি সুফল। অর্থাৎ রামমোহনের একঢিলে শিকার হল অনেকগুলি পাখী। তার ফলে একদিকে যেমন বিরাট সুবিধা হয়ে গেল বৃটিশ শিল্পপতিদের তেমনি দেশী বিদেশী ব্যবসায়ী বুর্জোয়াদের এবং চাকুরী প্রার্থী সন্তান সন্ততিদের। ধর্মীয় কলহ সৃষ্টি হওয়ায় দুটি বিবদমান শিবিরে বিভক্ত হ'ল হিন্দু অভিজাত শ্রেণী। ধর্মীয় আন্দোলনে ডুবিয়ে দিল তাঁদের জাতীয় চেতনাকে, রাজনৈতিক চেতনার মান উন্নত করার পরিবর্তে ধর্মান্ধতার মধ্যে ঠেলে দেওয়া হল সমগ্র অভিজাত শ্রেণীকে। জাতীয় শত্রুর দিক থেকে আক্রমণের লক্ষ্যমুখ সরিয়ে দেওয়া হল কল্পিত শত্রু পুরোহিত শ্রেণীর দিকে এবং এমনি করে আড়াল করে রাখা হল সামন্ত শোষক শ্রেণীকে অর্থাৎ জমিদার শ্রেণীকে। 'স্বাধীনতা সংগ্রামের' স্থান গ্রহণ করল ধর্ম ও সমাজ রক্ষার সংগ্রাম। স্বাধীনতার চেয়ে বড় হয়ে উঠ্‌ল ইংরাজদের অনুগ্রহ লাভের অধিকার। অন্য দিকে বৃটিশ স্বার্থে শক্তিশালী শাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলার, পুঁজি সঞ্চয় ও সংগ্রহের, যৌথ ব্যবসা বানিজ্য গড়ে তোলার এবং প্রশাসন যন্ত্রের জন্য লোকজন সংগ্রহের পথে ধর্মীয়

ও সামাজিক বাধার অপসারণ হল।

দেশী বিদেশী ধনী সম্প্রদায় সকলে খুশী হল এতে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে এই সংগঠন বা আন্দোলনের রাজনৈতিক রূপটি আমাদের চোখে পড়তে চায় না ঠিক, কিন্তু উপরিলিখিত তথ্য ও মন্তব্যগুলি থেকে এটা কারুর পক্ষেই বুঝে ওঠার অসুবিধা হওয়ার কথা নয় যে, ধর্মীয় রূপ গ্রহণ করলেও 'ব্রাহ্মসভা' ভারতের অনুগত বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রথম রাজনৈতিক সংগঠন এবং তার আন্দোলন রাজনৈতিক আন্দোলন। তাই "তিনি (কেশবচন্দ্র সেন — লেখক) ব্রিটিশ রাজ ও ভারত সরকারের প্রতি অনুগত্য প্রকাশকে ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিজ্ঞা পত্রের অন্তর্ভূত করলেন" (২১ ক) একটি নতুন ধর্মের বাণী উচ্চারণ করে প্রচলিত ধর্মকে, তার পুরোহিত শ্রেণীকে আক্রমণ করার ব্যাপারটি নতুন কিছু নয়। এ একটি পুরোনো কৌশল। ইউরোপে একদল ক্যাথলিক যাজকমণ্ডলীর বিরুদ্ধে অর্থাৎ চার্চের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করা হয়েছিল মধ্যযুগে। যদিও তার মূলে ছিল রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রেরনা।

সেখানে সেই আন্দোলনের সামনে ছিল মানবতার আদর্শ, লক্ষ্য ছিল সাধারণের অধিকার প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ মধ্যযুগীয় সমাজতান্ত্রিক ভাব-ধারায় পরিপুষ্ট ছিল সেই আন্দোলন। ভূমিদাসত্ব থেকে হাজার হাজার কৃষকের মুক্তির প্রশ্ন ছিল জড়িত এবং সেই আন্দোলন ছিল মূলতঃ সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে, কেননা চার্চ ছিল সেই সামন্ততন্ত্রের শক্তিশালী আশ্রয়। তাই সেই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে হাজার হাজার মানুষের মধ্যে সমাজের নিচুতলায়। যদিও বুর্জোয়ারাই হয়েছিল সবচেয়ে বেশী লাভবান। শুধু ইউরোপেই নয়, ভারতবর্ষেও দ্বাদশ শতাব্দী থেকে নতুন এক ভাবধারা চিন্তাজগতে সৃষ্টি করেছিল বিশাল বৈপ্লবিক আলোড়ন। বুর্জোয়া মানবতাবাদী আদর্শকে সামনে রেখে হাজার হাজার কারিগর, ব্যবসায়ী বুর্জোয়া, কৃষক মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল পুরোহিত শ্রেণীর বিরুদ্ধে। এ সবই ছিল ধর্মীয় আন্দোলন এবং দরকার ছিল সেদিন ধর্মের মুখোস পরার। কেননা পুরোহিততন্ত্রের অভিশাপে হাজার হাজার মানুষের ব্যক্তি স্বাধীনতা, ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য ছিল অস্বীকৃত আর এই পুরোহিততন্ত্রই ছিল সামন্ততন্ত্রের শক্তিশালী রক্ষাকবচ। এই ভাবধারা সমগ্র ভারতবর্ষে এনেছিল শুধু নতুন জাগরণ তা নয়, তার ফলে সারা ভারত-বর্ষের সর্বত্র সামন্তশাসক শ্রেণীর বিরুদ্ধে গড়ে উঠেছিল সশস্ত্র সংগ্রাম। এই ভাবধারা সেদিন সাধারণ জনতার মধ্যে বয়ে এনেছিলেন সে-কালের বহু বিচক্ষন পন্ডিত, আর দার্শনিক। মহামতি কবির, শ্রীচৈতন্য, গুরু নানকের নাম কে না জানে। কিন্তু রামমোহনের আন্দোলন সম্পূর্ন বিপরীত ধর্মী।

এবার রামমোহনের অনুগামীরা স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন এবং নতুন ধর্মের পথ অনুসরণ করে প্রকাশ্যেই লঙ্ঘন করতে শুরু করলেন প্রচলিত সামাজিক বিধান। নানা পুজা পার্বণ-আচার-অনুষ্ঠান, তীর্থ-ভ্রমণ,—পুণ্যার্জনের বহু

পথ বর্জনের ফলে আনুপাতিক হারে যে-পরিমান অর্থ ব্যয় কম হবে সেই পরিমান মূলধনেরও অপচয় বন্ধ হবে। এই সঞ্চিত অর্থ বস্তুত ইন্দো-বৃটিশ মূলধনে পরিণত হল। প্রথম দেশীয় মূলধনে যে যৌথ বাণিজ্য সংস্থা গড়ে উঠেছিল তার প্রথম বাঙালী অংশীদার ছিলেন শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের পিতামহ প্রিন্স দ্বারকানাথ ট্যাগোর, যিনি ছিলেন বৃটিশ শাসকবর্গের অন্যতম একজন অনুগ্রহ পুষ্ট ব্যক্তি এবং ব্রাহ্ম সভার দ্বিতীয় নেতা—রামমোহনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। শিক্ষিত ধনী তরুণদের মনেও খুশীর জোয়ার এলো ইংরাজ সাহেবদের সাথে অবাধ মেলামেশা করার বাধা অপসারনের ফলে।

বর্তমান ও ভাবীকালের শিক্ষিত তরুণদের সুকৌশলে ইংরাজ বিরোধী আন্দোলন থেকে দূরে সরিয়ে রাখারও ব্যবস্থা হল। বস্তুত তাদের সুযোগ করে দেওয়া হল ১৮৩৩ খৃঃ সনদে যাতে তারা ইংরাজদের বিশ্বস্ত ভৃত্যের ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে। তারা তখন দীর্ঘ সময় পাবে 'ইংলন্ডের বিপ্লবী' ভাবধারায় পরিপুষ্ট হবার এবং "কল্পিত জাতীয়" শত্রুর বিরুদ্ধে কথার বিপ্লবী লড়াই করবার; লন্ডনের সংসদীয় লড়াই এর মত। এইভাবে একদিন তাদের অর্থাৎ অভিজাত শ্রেণীর শিক্ষিত তরুণদের একটি অংশ পরিণত হল দেশের জনগণের শত্রুতে। বিদেশী শত্রুর পায়ের নীচে পড়ে থেকে তাদের সেবায় আত্মনিয়োগ করার লজ্জা বোধের বা আত্মমর্য্যাদা বোধেরও বালাই থাকল না। শুধু তাই নয় লক্ষ্য করলে বোঝা যাবে শিক্ষিত সমাজের একটি উল্লেখযোগ্য অংশকে দেশের আশীভাগ মানুষ যারা কৃষক কারিগর জাতীয় ব্যবসায়ী বুর্জোয়া—দেশের এই বিপ্লবী অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা হল। উদ্দেশ্য যেন তারা ভবিষ্যতে এই বিপ্লবী শক্তির সঙ্গে কোন ভাবে যুক্ত হতে না পারে, বরং তাদের সংগ্রামের বিরুদ্ধাচরণে শাসক শ্রেণীর যোগ্য সহযোগী হয়ে ওঠে। তখন থেকেই গোপন ষড়যন্ত্র চলতে থাকল দেশের স্বাধীনতার সমস্যা নিয়ে এই শ্রেণীর মানুষের চিন্তা ভাবনা করার মানসিকতা মুছে ফেলার। জমিদার শ্রেণী-সহ সমগ্র বুর্জোয়া শ্রেণীটিই তখন থেকে ইংরাজ শাসকদের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত হয়ে পড়ে উভয়ের স্বার্থ।

দেশের এই ক্ষুদ্র অংশটিই উপনিবেশিক শোষণ ও শাসনের দেশীয় ক্ষুদ্র অংশীদার। ভুল হবে না যদি বলা যায় এরাই সেদিনের দেশীয় উপনিবেশিক শক্তি। বিদেশী উপনিবেশিক শ্রেণীর গর্ভে যাদের জন্ম। ঐ শ্রেণী দ্বারা লালিত পালিত এবং তার একটি দেশীয় অচ্ছেদ্য অংশ। বস্তুতঃ এই অংশটিই দেশীয় জনগণ ও বৃটিশ শাসক শ্রেণীর মধ্যে প্রাচীরের মত খাড়া থেকে দেশের শ্রমজীবি জনগণকে শোষণ ও শাসন করে এসেছে বিদেশীদের পক্ষ থেকে, তাদের আশ্রয়ে থেকে নিজেদের শ্রেণী স্বার্থে। এই শ্রেণীটি বরাবর দুইভাগে বিভক্ত থেকেছে এবং দুই ভাবে ইংরাজদের সহায়তা করে এসেছে। তাদের ছদ্মবেশী রাজনৈতিক উপদেষ্টার ভূমিকায় অংশ গ্রহণ করে, দ্বিতীয়ত প্রশাসন যন্ত্র, সৈন্য আর পুলিশ

বাহিনীতে অংশ গ্রহণ করে। পরবর্তীকালে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে রামমোহনের শূন্যস্থানও অপূরণ থাকেনি, 'ধর্মীয়' সভা পরিণত হয়েছে অন্য নামে একটি রাজনৈতিক দলে। যার নেতৃত্বে এসেছেন এমন সব বিচক্ষণ মানুষ, যাদের প্রচ্ছন্ন দিকটা সহজে আমাদের চোখে পড়তে চায় না। কিন্তু বিভিন্ন রাজনৈতিক ঘটনার, ধর্মীয় আচরণের বিচার বিশ্লেষণ করলে তা বুঝতে অসুবিধা হবার কথা নয়। আর এই সব ঘটনা থেকে এটাও স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে এই পরিকল্পনার মূলে ছিল ইংরাজদের বুদ্ধি, পরামর্শ এবং উভয় পক্ষের গভীর ষড়যন্ত্র—মনে থাকতে পারে এই একই ধরণের ষড়যন্ত্র ছিল দেশের স্বাধীন শাসন কর্তা সিরাজুদ্দৌল্লাকে নিহত করে সিংহাসন দখল করার মূলে। এ-এক বিস্ময়কর মিল। অবশ্য একথা মনে করা ঠিক হবে না যে শুধুমাত্র রামমোহনের অনুগামীরা ইংরাজদের সাহায্যে এগিয়ে এসেছিল। কিন্তু একথা বলা যায় যে অন্যেরা অনেকেই এসেছেন সেই অনুগামীদের অনুসরণ করে নিজেদের ভাগ্য অন্বেষণ করতে। এযেন অন্যের হাত ধরে রাস্তা পার হওয়ার মতন। তাঁরা ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ না করলেও হয়ে উঠেছেন ইংরাজ ঘেঁষা। সেদিক থেকে রামমোহন অনুগামীরা পথিকৃৎ।

এখানে স্মরণ করিয়ে দেওয়া দরকার যে এই আন্দোলনে পুরোহিত শ্রেণীকে আক্রমণ করা হল কিন্তু সামন্ত শোষক শ্রেণী ও সামন্ততন্ত্রকে আক্রমণ না করে বরং সযত্নে ও সুকৌশলে আড়াল করে রাখা হল তাদের—যাদের স্বার্থরক্ষার জন্য পুরোহিত শ্রেণীর জন্ম, পুরোহিত শ্রেণী যাদের ধর্মীয় মুখোস পরা রাজনৈতিক বাহন। সেই সামন্ত তন্ত্রকে বা জমিদার জোতদারশ্রেণীকে উচ্ছেদের একটি কথাও উচ্চারিত হলনা। পুরোহিত তন্ত্র, জাতিভেদ প্রথা, বর্ণ প্রথার নামে অপরিবর্তনীয় শ্রমবিভাগ, আর সামন্ত শাসকশ্রেণীর অধীনে অপরিবর্তনীয় দাস সমাজের প্রবর্তন মানুষকে ভাগ্যের দাস করে রাখার উদ্দেশ্যে নানা দেবদেবতার সৃষ্টি ও বিশ্বাস, নানা ধরনের আচার ব্যবহার, অনুষ্ঠান—এগুলো পুরোহিত শ্রেণীর উদ্ভট সৃষ্টি নয়, সমাজ থেকে কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়—এ-গুলোরও একটি বাস্তব ভিত্তিভূমি আছে, যেখান থেকে এগুলোর জন্ম। এ-গুলো একটি বিশেষ সমাজের সংস্কৃতি বা মতাদর্শের প্রতিফলন। তার বাস্তব উৎসভূমি সামন্ততন্ত্র। পুরোহিত শ্রেণীর অনুশাসন রাজনৈতিক বন্ধনেরই নামান্তর। সামন্ততন্ত্রের অভিশাপ বিশ্বের সর্বত্র শ্রমজীবি মানুষের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে এই পুরোহিত শ্রেণীর সাহায্যে। পশুরও অধম করে রাখা হয়েছে মানুষকে সামন্ততন্ত্রেরই স্বার্থে। পুরোহিত শ্রেণীর প্রধান কর্তব্য হয়েছে শাসক শ্রেণীর প্রতি শ্রমজীবি জনগণের আনুগত্য প্রতিষ্ঠা করা ; যাতে শ্রমজীবি জনতার মধ্যে গড়ে উঠতে পারে ক্রীতদাস সুলভ মানসিকতা। রামমোহনের আন্দোলন, তাঁর তত্ত্ব ধর্মালোচনা সবই সম্পূর্ণ নীরব সেই সামন্তবাদী শোষক শ্রেণী সম্পর্কে, জমিদার জোতদার সম্পর্কে,

তাদের শোষন লুণ্ঠন নির্যাতন সম্পর্কে, জনগণের প্রতি তাদের শত্রুতামূলক ভূমিকা সম্পর্কে। সে সম্পর্কে একটি বাক্যও উচ্চারিত হয় নি। তাঁর আন্দোলন যে দেশের জমিদার জোতদার শ্রেণী সম্পর্কে নীরব থাকবে তা জানা কথা। তারও কারণ খুব স্পষ্ট। তারও কারণ নিহিত আছে তার শ্রেণী চরিত্রেরই মধ্যে। শ্রেণী স্বার্থের মধ্যে। কিন্তু বিস্ময়ের কথা পুরোহিত শ্রেণী যে কাজ করতেন নিজের দেশেরই একদল স্বাধীন রাজা মহারাজা মহারাণার স্বার্থে, রামমোহন রায় সেই কাজ করলেন বিদেশী উপনিবেশিক স্বার্থে, নিজের দেশের জনগণের স্বার্থ বিপন্ন করে যে-উপনিবেশিক শক্তি ছিল দেশীয় সামন্ততন্ত্রের উপর নির্ভরশীল।

রামমোহন যে কাজ করলেন তা করলেন পুরোহিত শ্রেণীর মতই একই কৌশল গ্রহণ করে নতুন ধর্মের দোহাই দিয়ে; প্রাচীন শাস্ত্রগুলির উপর নির্ভর করে—আর এই শাস্ত্রগুলিরই উপর প্রতিষ্ঠিত তাঁর ধর্ম—"ব্রাহ্ম ধর্ম"—হিন্দু ধর্মের একটি নতুন নাম ছাড়া আর কিছুই নয়।

ব্রাহ্ম সমাজ শুধুমাত্র কোলকাতার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকল না। ভারতের অন্যান্য অঞ্চলেও বিভিন্ন ধরণের সরকারী অনুগ্রহ প্রার্থীরা এই ব্রাহ্ম সমাজের মধ্যে জোট বাঁধার একটা সহজ সুযোগ লাভ করে। কালক্রমে একদিন ব্রাহ্ম সমাজ শাসকশ্রেণীর পৃষ্ঠপোষনায় সর্বভারতীয় রূপ গ্রহণ করে। বলা হয়েছে ঃ

"কলিকাতা বদ্ধ একটি ক্ষুদ্র সমাজ থেকে ব্রাহ্ম সমাজ গত শতাব্দির ষষ্ঠ দশকের মধ্যে একটি সর্বভারতীয় জাতীয় প্রতিষ্ঠানের রূপ ধারণ করে" "ব্রাহ্ম সমাজের এই প্রাথমিক প্রসারপর্ব প্রায় পঁচিশ বৎসর কাল বিস্তৃত, ১৮৪৫ থেকে ১৮৭০ পর্যন্ত। এর প্রধান লক্ষণীয় বিষয় হল প্রসার কার্যে শিক্ষিত ব্যক্তিদের সোৎসাহে অংশ গ্রহণ। পূর্ববঙ্গে ঢাকা প্রভৃতি শহরে ব্রাহ্ম সমাজের বিস্তার প্রসঙ্গে শাস্ত্রী মহাশয় লিখেছেন ঃ " first adherents. ....were most of them high officers under Govt. and the movement was entirely a movement of leaders of the educated community of the times." (৩১ পৃঃ সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজ চিত্র—২য় খন্ড) উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীরাই ছিল সভার অধিকাংশ সদস্য। উচ্চপদস্থ বলতে জজ সাব জজ, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, ডেপুটি কালেক্টর, পদস্থ কর্মচারী, উকিল, ব্যারিষ্টার শিক্ষক পন্ডিতদেরই কথা উক্ত পত্রিকায় উল্লিখিত। রামমোহনের আন্দোলনের ভিত্তিভুমি রচিত হয় বৃটিশ সৃষ্ট জমিদার, বণিক বুর্জোয়া সহ রাষ্ট্রযন্ত্রের এইসব বিশ্বস্ত ভৃত্যদের নিয়ে। এঁদের সৃষ্টির জন্যই রামমোহনের সহায়তায় উপনিবেশিক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন—যার মূল উদ্দেশ্য হল তাদের অন্ধ করে রেখে ক্রীতদাস সৃষ্টি করা। মহামতি লেনিন বলেছিলেন যে বুর্জোয়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি ক্রীতদাস সৃষ্টির কারখানা আর ওখানে যে-যত পড়ে সে-তত অন্ধ হয়। রামমোহন সঠিক ভাবেই সুপারিশ করেছিলেন প্রশাসন

যন্ত্রে এ'দের নিযুক্ত করার জন্য।

সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজ চিত্রে, মন্তব্য করা হয়েছে ঃ "১৮৩৩ সালের চার্টার অ্যাকট্ এবং ১৮৪৪ সালে হার্ডিঞ্জের সরকারী চাকুরী নীতি নব্য শিক্ষিত এদেশীয় মধ্যবিত্তের স্বার্থের অনুকূলে ঘোষিত নাহলে তাঁদের পক্ষে মর্যাদার মানদণ্ড (status) 'বিত্ত' ও 'বিদ্যার' জোরে সামাজিক প্রতিষ্ঠা লাভ করা সম্ভব হতনা এবং তা না সম্ভব হলে ব্রাহ্ম সমাজের প্রসারতা দূরের কথা অস্তিত্ব রক্ষা করাই সমস্যা হয়ে উঠ্‌তো।" (৩২ পৃঃ ২য় খণ্ড)

এইসব ভদ্র মহোদয়রা এলেন জমিদার শ্রেণী এবং মধ্যসত্বভোগী শ্রেণীর থেকে। যে-জমিদার আর মধ্যসত্বভোগীর দল কৃষকদের লুণ্ঠনের ও শাসন করার দায়িত্ব গ্রহণ করে ইংরাজদের "বিশ্বস্ত আমলায়" পরিণত হয়। এটা স্পষ্ট, কৃষকদের সেই শত্রুরাই সরকারী শাসন যন্ত্রে নিযুক্ত হল এবং একই সঙ্গে ব্রাহ্ম সমাজের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করল। প্রকারন্তরে এই শ্রেণীরই হাতে দেওয়া হল দেশ শাসনের দায়িত্ব ; বৃটিশ কর্মচারীদের হাতে দেওয়া হল দেখা শোনার ভার—তারা ঠিক-মত দায়িত্ব পালন করছে কিনা। এই শ্রেণীর যে-সব ইংরাজী শিক্ষিত সন্তান-সন্ততি প্রশাসন যন্ত্রে ভিড় করত তাদের খানিকটা পরিচয় পাই বাংলার সমাজ চিত্র থেকে। তাতে মন্তব্য করা হয়েছে ঃ "তাহাদের সন্তান সন্ততিরাও প্রায় তদনুরূপ প্রকৃতি প্রাপ্ত হয়। তাহাদিগের ন্যায় বিদ্যা শিক্ষা করে এবং তাহাদিগের নিকট শিক্ষা লইয়া ক্রমে ক্রমে·······কোন একটা সামান্য কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া পিতা পিতৃব্যাদির ন্যায় অমিতাচার আরম্ভ করে।" (সাময়িক পত্রিকায় বাংলার সমাজ চিত্র ২য় খণ্ড ৪৩ পৃঃ বিনয় ঘোষ কর্তৃক সম্পাদিত) এরা কি ধরণের সমাজ-বিরোধী হয়ে ওঠে নিচের মন্তব্য থেকে তার একটি ক্ষুদ্র চিত্র দেখতে পাই।

"যেদিন তাঁহারা বিদ্যালয় হইতে অবসর হয়েন সেইদিবসাবধি তাঁহারদিগের বিদ্যাবুদ্ধি চরিত্র সমুদয় নতুন পথে ধাবিত হয়।·······জ্ঞান ধর্ম কি স্বদেশের হিত বাসনা আর তাঁহারদিগের অন্তকরণে স্থান প্রাপ্ত হয় না। কেহ কেহ ইংলণ্ডীয় সমাজে গন্য হইবার জন্য তাহারদিগের আচার ব্যবহার, বেশ বিন্যাস অঙ্গ ভঙ্গী পর্যন্ত শিক্ষা করেন এবং তাহাদিগের অবিকল প্রতিমূর্ত্তি হইবার চেষ্টা করেন। পৃথিবীর মধ্যে তাঁহারা ভারতবর্ষকে কোনো অধোলোকের ন্যায় জ্ঞান করেন। তন্নিবাসী মনুষ্যাদিগকে কোন নীচ জাতিরূপে দৃষ্টি করেন এবং তাহাদিগের রীতি-নীতি, ভাষা পর্যন্ত সমুদায় প্রতি পদে পদে হেয় বাক্য প্রয়োগ করেন···· কতক ব্যক্তি কেবল মৌখিক বাগাড়ম্বর করিয়াই কালহরণ করেন।····ইহার দিগের এতদ্রূপ ব্যবহার নিতান্ত ক্লেশকর কিন্তু যাহারা হতজ্ঞান হইয়া খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করিয়াছে তাহাদিগের অত্যাচার অসহ্য ; তাহারা এই দেশে জন্মগ্রহণ করিয়া এই দেশের শত্রু হইয়াছে।······

·······ব্যক্ত করিতে অশ্রুপাত হয় যে কলিকাতার প্রধান প্রধান বিদ্যালয়ে কত সুশিক্ষিত ছাত্র এই মোহকরি দুষ্কর্মে মুগ্ধ হইয়া অবশেষে ব্যাভিচারী

প্রভৃতি কুব্যবহারের দ্বারা মনুষ্যনামের অযোগ্য হইয়াছে।”

........“তাহাতেও রাজা (বৃটিশ সরকার,—লেখক) তাহার প্রতিকারের জন্য সম্যক চেষ্টাবান না হইয়া রাজ্য মধ্যে কোনো কোনো দুষ্কর্ম বৃদ্ধির প্রতি বরঞ্চ মুখ্য কারণ হইয়াছেন। মাদক দ্রব্য সেবন ও বেশ্যাগমন দুষ্কার্য্য রাজার সম্যক আশ্রয় দ্বারা অত্যন্ত বাহুল্য হইয়াছে।...”(ঐ ৯৯ পৃঃ – ১০৩ পৃঃ) এদেশের শিক্ষিত তরুণদের সাংস্কৃতিক মানকে ধ্বংস করে দেওয়ার কী গভীর চক্রান্ত চলেছিল তা এসব তথ্য থেকে বোঝা শক্ত হয় না। আরো বলা হয়েছে “....পূর্বে এই স্বাধীন ভারতবর্ষস্থ ধর্মশীল রাজাদিগের শাসনানুসারে মদ্যব্যবসায় বা মদ্যব্যবহার এদেশে প্রায় ছিল না। কিন্তু ইংলন্ডের লোকের অধিকার হওয়া অবধি তাঁহাদিগের নিত্য প্রয়োজনীয় যে মদিরা তাহার ব্যবসায় দেশময় প্রচলিত হইয়াছে।............ ইহাতে মাদক দ্রব্যের বানিজ্য বৃদ্ধির সহিত এতন্নগরস্থে লোকেরা ধনে প্রাণে বিনষ্ট হইতেছে। অধুনা এই নগরে রাজশাসন অভাবে যেমন মদ্যপানের বাহুল্য হইতেছে তদ্রূপ দিন দিন বেশ্যাশ্রেণীরও বৃদ্ধি হইতেছে।” (ঐ ৯৯-১০৩ পৃঃ) রামমোহন মদ্যপানের শুধু দৃঢ় সমর্থকই ছিলেন না। এ-সম্পর্কে একটি প্রবন্ধও রচিত হয় ও প্রচারিত হয়। পরবর্তীকালে ‘ভারত প্রেমিক’ ডিরোজিওর বিপ্লবী ধ্যান ধারণা প্রচারের একটি শক্তিশালী মাধ্যম হয়ে ওঠে এই মদ্য। যাই হোক উপরের তথ্য থেকে ইংরাজী শিক্ষা অন্দোলনের প্রচ্ছন্ন দিকটি আর প্রচ্ছন্ন থাকে না। রামমোহনের সামন্ত শোষক শ্রেণীকে আক্রমণ না করার কারণটি আরও সুস্পষ্ট করে তোলা দরকার।

রামমোহন মূলত ব্যবসায়ী মহাজন হলেও বিরাট জমিদারও ছিলেন। জমিদার পরিবারেই তাঁর জন্ম। মোঘল শাসনের অনুগ্রহ প্রাপ্ত পরিবারগুলির অন্যতম একটি। নিজে শুধু জমিদারই ছিলেন না এক সময় তাঁদের মুখপাত্রও হয়ে ওঠেন। সরকার নিষ্কর সম্পত্তি নিয়ে নেবার প্রস্তাব করলে তার বিরোধীতায় জমিদারদের মুখ্য প্রতিনিধি হয়ে ওঠেন। জমিদারদের শোষণ এবং তাদের কতৃত্ব বজায় রাখতে গেলে তাঁদের অধীনস্থ প্রজাদের অর্থাৎ কৃষক-কারিগরদের দমন করে রাখা. বশীভূত করে পায়ের তলায় ফেলে রাখা দরকার। এ-কাজ শুধু মাত্র পুলিশী ব্যবস্থা দ্বারা সম্ভব নয়। সেজন্য তাদের চেতনার মান নিম্নতম স্তরে নামিয়ে নিয়ে যাওয়া দরকার, যাতে তারা জমিদার শ্রেণীকে অর্থাৎ তাদের প্রত্যক্ষ “শাসন কর্তাদের” দেবতা জ্ঞান করে মান্য করে চলে। এই জন্যই দেশে আজও, জাতি, উপজাতি, তপশিলী জাতি, ইত্যাদি নাম দিয়ে “হরিজন” করে রাখা হয়েছে। তাদের জন্য “সংরক্ষিত” বলে একটি শব্দ বা বিশেষ অধিকারকে বজায় রাখা হয়েছে। তাদের “উপর তলা” সম্পর্কে সচেতন করা অর্থাৎ তাদের চেতনার মান উন্নত করা বা নানাপ্রকার অন্ধ সংস্কার থেকে ধ্যান ধারনা বিশ্বাস থেকে মুক্ত করা, জমিদার শ্রেণীর স্বার্থ বিরোধী। এই কারণেই নিম্নস্তরের শ্রমজীবি জনতাকে পুরোহিত শ্রেণীর প্রভাব থেকে, সামন্ততন্ত্র

থেকে মুক্ত করা দূরের কথা তাদের যে মুক্ত করে আনার প্রয়োজন আছে সে সম্পর্কে তিনি কোনো চিন্তাও করেন নি। জমি থেকে কৃষকদের মুক্ত করা, জমিতে কৃষকদের উপর জমিদারদের শোষণ নির্যাতন বন্ধ করার যে কোনো প্রস্তাব হবে সামন্ততন্ত্রকে এবং উপনিবেশিক শক্তিকে আক্রমণ করার সামিল। বরং তিনি অভিনন্দন জানালেন ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের, জমিরসঙ্গে কৃষকদের বেঁধে রেখে জমিদারদের তাদের দন্ডমুন্ডের কর্তা করে তোলার ব্যবস্থাকে। স্বভাবতঃ সামন্ততন্ত্রের মতাদর্শগত ভিত্তিকে শ্রমজীবি মানুষের মধ্যে আরও শক্ত, আরও সুদৃঢ় করে তোলার অধিক প্রয়োজন ছিল। আজও দেখা যায় নিম্নশ্রেণীর বহু সরল নিরীহ দরিদ্র মানুষ তাদের নিম্নমানের চেতনার ফলে জমিদারকে, জোতদারকে 'ঈশ্বরের অংশ' বলেই মনে করে থাকে। আর এই সব জমিদার জোতদার শ্রেণীর অধিকাংশই উচ্চবর্ণের হিন্দু, এবং লক্ষ লক্ষ ভূমিহীন আর "গরীব চাষী" "ডোম" "বাগদী" "মুচি" "হাড়ি" "সাহা" অসংখ্য সম্প্রদায়ের হাজার হাজার মানুষ অস্পৃশ্য "হরিজন"। এই কারণেই তাঁর আন্দোলন সীমাবদ্ধ থাকল শুধুমাত্র ধনিক শ্রেণীর মধ্যে। তার ঢেউ পেঁাছে দেওয়া হল না সমাজের নীচু তলায়। বরং ইংরাজদের গোপন উদ্যোগে তাদের জন্য নানা দেবদেবী পীর, গুরু নতুন করে জন্ম দেওয়া হ'ল। ইংরাজ সাহেব পর্যন্ত পুরোহিত কে ভেট পাঠাতে শুরু করল, কত সাহেব পীর ও দেবতাভক্ত হয়ে উঠল। আবার আবির্ভাব ঘটল বহু স্বিদ্ধ সাধক মহাপুরুষের। একই কারণে কৃষক জনগণকে দরিদ্র সাধারণ মানুষকে করে রাখা হ'ল নিরক্ষর অশিক্ষিত এবং সরিয়ে রাখা হ'ল মতাদর্শগত আন্দোলন থেকে যেন তারা আয়ত্ব করতে না পারে তাদের দারিদ্র্য আর অর্থনৈতিক সমস্যার মূল কারণ উদ্ঘাটনের প্রাথমিক চাবীকাঠির ব্যবহার।

এই সময় থেকেই উপনিবেশিক স্বার্থে একই ব্যক্তির মধ্যে পুঁজিবাদের ও সামন্তবাদের অদ্ভূত মিলন ঘটল এবং বৃটিশ শিল্প পুঁজির সঙ্গে বানিজ্য পুঁজির বাঁধন শক্ত হ'ল। ফলে সামন্ততন্ত্রের উপর নির্ভর করতে হ'ল দেশীয় পুঁজি ও বিদেশী পুঁজিকে।

রামমোহনের আন্দোলন স্বত্বেও ধনী অভিজাতশ্রেণীর সকলের পক্ষে বাস্তবে সম্ভব হ'ল না এবং প্রয়োজন হ'ল না নতুন ধর্ম গ্রহণ করা অর্থাৎ প্রচলিত ধর্মীয় অনুষ্ঠান এবং প্রথা বর্জন করা। ফলে সতীদাহ প্রথা থেকেই গেল। তাতে পুঁজির অপচয় আশানুরূপ বন্ধ হ'ল না। অবশ্য সকল পরিবারে এই প্রথা মানা হ'ত না। কিন্তু ইংরাজরা প্রথম থেকেই ঠিক করেছিল যখন প্রথাটি বর্বোরচিত, এবং অনেকেই চায় প্রথাটি বন্ধ হোক, তখন এই প্রথাটি রদ করে ইংরাজ শাসনের শ্রেষ্ঠতা প্রমান করার সুযোগ আছে। ভারতবর্ষকে অন্যায়ভাবে দখল করে রাখার জন্য কঠোর সমালোচনার সম্মুখীন হতে হচ্ছিল ইংলন্ডকে। কেননা যখন ইংলন্ড তাদের অবাধ বানিজ্যের স্বার্থে

"মানবতা" "ব্যক্তি স্বাধীনতা" "মৈত্রী" সম্পর্কে বাগাড়ম্বর করছিল তখন এই অন্যায়ের স্বপক্ষে তার কিছুই বলার ছিল না। এই পরিস্থিতিতে তার একমাত্র উপায় ছিল রামমোহনকে ব্যবহার করা। তারা রামমোহনের "মতামত" পত্র পত্রিকা মারফত প্রচার করে পরোক্ষে বোঝাবার চেষ্টা করছিল ভারত এখনো মধ্য যুগের অন্ধকারে পড়ে আছে। সেখান থেকে তাদের মুক্ত করার জন্যে তাদের মঙ্গলের জন্যই ইংরাজদের মত সভ্য একটি জাতির উপস্থিতি প্রয়োজন ছিল। এবং দৈবক্রমে তারা যখন একবার এসে পড়েছে তখন তাদের অন্ধকারে ফেলে তারা চলে যেতে পারে না। তাদেরও একটা দায়িত্ব এসে পড়েছে। স্বভাবত এই পরিস্থিতিতে সতীদাহ প্রথা নিবারণের আইন প্রনয়ণ ইংরাজ শাসনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রচারের এবং তাদের উপস্থিতির সপক্ষে ব্যবহার করার প্রয়োজনীয় হাতিয়ার। কিন্তু আইন করে রদ করতে এতদিন তারা ভয় পাচ্ছিল পাছে দেশীয় শিক্ষিত হিন্দু সমাজ বিশেষতঃ পুরোহিত শ্রেণী বিক্ষুব্ধ হয়। তারা স্বাভাবিক ভাবেই মনে করতে পারে একাজ তাদের ধর্মে হস্তক্ষেপ। সুতরাং সময় ও সুযোগের অপেক্ষা করছিল। শ্রদ্ধেয় ইকবাল সিংহ বলেছেন ঃ

"They could not make up their mind asto what steps to take in the matter of life and death, till 1812-1813." (২২)

এখানে বছরটি লক্ষ্য করার বিষয়। ১৮১৩ সালের পর অর্থাৎ অবাধ বাণিজ্য নীতি ঘোষনার পর আর বেশী দিন অপেক্ষা করা গেল না। রাম মোহনের আন্দোলন বেশ কিছুদিন চলার পর আইন প্রনয়ণ পূর্বাপেক্ষা গুরুত্ব লাভ করল আন্দোলনের দরুণ অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হলো। এবার আইন জারী করা সহজ হয়ে উঠলো। একজন লেখকের মতে "....পুরোপুরি সরকারী পৃষ্টপোষনায় এবং সরকার গোঁড়া থেকেই যে-আইন করে সতীদাহ বন্ধ করে তীব্র প্রতিক্রিয়ার ভয় পাচ্ছিল রামমোহন তাঁর মধ্যস্থতায় আন্দোলনের মারফত ব্যাপার-টাকে সোজা করে তুললেন।" ইং ১৮১৮ সালে রামমোহন "সহমরণ বিষয়ক প্রবর্ত্তক ও বিবর্তক সম্বাদ" এবং এই রকম আরও দুটি বই সহমরণ সম্পর্কে লিখে ফেলেন। তাঁর নেতৃত্বে জনমত সৃষ্টির চেষ্টাও চলতে থাকল প্রথার বিরুদ্ধে। এই ভাবে এক অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হলে লর্ড বেণ্টিংক এবার আইন জারী করলেন সতীদাহ নিবারণের। আর তখনই ইংরাজ শাসনের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠে চিঠি লেখা হল বেণ্টিংক কে। ডিরোজিওরাও এইরকম একটা 'মহৎ' কাজের প্রশংসা করলেন।

শিক্ষিত তরুণদের মধ্যে নেতৃস্থানীয় ছিলেন ডিরোজিও। তৎকালে তাঁকে বলা হ'ত সংস্কার মুক্ত একজন "বিদ্রোহী"। অবশ্য এই বিদ্রোহ উপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে নয়; এই বিদ্রোহ সংস্কারের বিরুদ্ধে। "গোমাংস ভক্ষণ" "মদ্যপান" এ-গুলোই ছিল বিদ্রোহের এক একটি লক্ষণ। আর ভারত সম্পর্কে কবিতা বা কিছু কথা লেখা, নিপীড়িত নীল চাষীদের দুঃখ

প্রকাশ ইত্যাদি ছিল ভারত প্রেমের পরিচয় এবং সে জন্য ডিরোজিও ছিলেন "ভারতপ্রেমিক"। কিন্তু তাঁরা "সতীদের" "সতীদের পরিবার বর্গের" ভদ্রভাবে জীবন ধারনের কি ব্যবস্থা করার সুপারিশ করলেন বা পরবর্ত্তীকালে তাদের ভাগ্যে কি ঘটল, সে-সম্পর্কে তাঁরা কি প্রতিকার ব্যবস্থা করলেন তা জানা যায় না। তবে 'বিধবা বিবাহ প্রথা' চালু করার জন্য জোর আন্দোলন চলল যদিও স্বাভাবিক কারণেই তার অনিবার্য পরিনতি ঘটল—ব্যর্থতা। জানিনা সতী বিধবাদের জন্য সামাজিক, আর্থিক নিরপত্তার ব্যবস্থা হয়েছিল কিনা। তারা ভালোভাবে জীবন যাপনের অধিকার লাভ করল না জলে ডুবে মরলো, না দালালের ষড়যন্ত্রের শিকার হলো, না বিদেশে দাসব্যবসায়ীরা চালান করলো; না কোলকাতার কোন বিশেষ পল্লীতে, কোন "হিতাকাংখী" গ্রাম থেকে নিয়ে এল। এ সব আশংকা করার যথেষ্ট কারণ আছে। দেখা যায় তখনও এই কোলকাতায় দাস ব্যবসা চলছে পুরোদমে। লর্ড বেন্টিংকেরই 'আপন জনেরা' অর্থাৎ ইংরেজ বনিকেরা এদেশের গ্রামাঞ্চলের যুবতী নারীও পুরুষকে জোর করে ধরে এনে অথবা ক্রয় করে বিক্রী করত বিদেশের বাজারে এবং মুনাফা লুটতো প্রচুর। বৃটিশ শাসকবর্গ এই দাস ব্যবসায়ে শুধু উৎসাহই দিত না এদেশের লোকদের যাতে সস্তায় কেনা যায় সেজন্য সৃষ্টি করা হ'ত "দুর্ভিক্ষও"। যে-জেলায় দুর্ভিক্ষ হ'ত সে-জেলায় ভীড় জমাতো দাস ব্যবসায়ীরা আর তাদের দালালেরা। শ্রদ্ধেয় সুধীর কুমার মিত্র মহাশয় বলেছেন: "ইংরাজ শাসন প্রাতিষ্ঠিত হইবার পর ইহার প্রচলন অনেক বাড়িয়া যায়" "গরু ও ছাগলের হাট যাহারা দেখিয়াছেন তাহারা এই ক্রীতদাসের বাজারের ছবি খানিকটা কল্পনা করিতে পারিবেন। ....তরুণী স্ত্রীলোকের দাম ছিল সবচেয়ে বেশী প্রায় ষাট টাকা। প্রতিবৎসর কলিকাতায় তখন দশ হাজার ক্রীতদাস চালান আসিত। এবং প্রায় বিশ হাজার কলিকাতা হইতে চালান যাইত। দুর্ভিক্ষ ও অনাবৃষ্টির সময় দালালরা গ্রামে গ্রামে যাইয়া শিশুও স্ত্রীলোক সংগ্রহ করিত। নৌকা বোঝাই শিশু ও যুবতীর দলকে কলিকাতায় আনিয়া বিক্রয় করিত কিংবা তাহাদিগকে ভারত মহাসাগরের অন্যান্য ইংরাজ বসতিতে ব্যাপক চাহিদার জন্য পাঠান হইত"। "ইংরাজ সরকার দাস প্রতি চারি টাকা চারি আনা শুল্ক লইতেন"। (হুগলী জেলার ইতিহাস থেকে উদ্ধৃত)।

আরো একটি নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে জানা যায়,

"Slaves of both Sexes are generally purchased from the indigent Hindu or Hindusthanee mothers, a young girl will bring according to her age and usefulness from Rs. 19/- upto Rs. 100/-". "The Slave trade was finally prohibitted by the Indian Penal code in 1860" (History of Bengal Behar and Orissa Under British Rule—L.S.S. O'mally)

তাহলে দেখা যায় ইং ১৮৬০ সাল অবধি আইনসঙ্গতভাবে প্রকাশ্যে দাস ব্যবসা চলেছিল। এই ব্যবসা বন্ধ হলো যখন শিল্প প্রতিষ্ঠান এবং কৃষির জন্য সস্তায় মজুর পাওয়ার জরুরী প্রয়োজন হয়ে উঠল। অন্য সূত্রে বলা হয়েছে দাস প্রথা ১৮৪৩ সালে আইন করে বন্ধ করা হয়েছে। এই অবস্থায় যদি এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়ে থাকে যে সতীদাহ প্রথা নিবারণের আইনের সঙ্গে ইংরাজ বণিকদের স্বার্থও জড়িত ছিলো তবে কি তা একেবারে ভুল সিদ্ধান্ত হবে? এ জিজ্ঞাসা ন্যায়সঙ্গত কিন্তু এখনো অনুত্তর। দাস ব্যবসা সম্পর্কে রামমোহন বা অন্যান্যদেব বিস্ময়কর নীরবতা লক্ষ্যনীয়।

তাঁর দ্বিতীয় তত্ত্বটি শুধু আশ্চর্যজনকই নয়, ভারতবর্ষ তথা পৃথিবীর প্রতিটি পরাধীন দেশের নিপীড়িত জাতির পক্ষে বিপদজনক। তিনি উপনিবেশিক শাসন সম্পর্কে এমন এক নতুন আর নজির বিহীন তত্ত্ব হিন্দু সমাজের কাছে উপস্থিত করে ছিলেন, পৃথিবীর প্রতিটি জাতির ইতিহাসে যা বিরল। এই তত্ত্বটি এতই বিস্ময়কর যে "রামমোহন রচনাবলীর" ভূমিকা লেখক শ্রদ্ধেয় ডঃ অজিত কুমার ঘোষ এম. এ. ডি, ফিল, ডি. লিট মহাশয়কেও ভূমিকা লিখতে গিয়েও অবাক হতে হয়েছে। তিনি এতে এতই বেদনা বোধ করেছেন যে সত্যই উল্লেখ করার যোগ্য। তিনি অত্যন্ত নম্রভাবে লিখছেন, "............কিন্তু সব কিছু সত্ত্বেও দেশকে ভালোবাসা ও তার মুক্তি বিধানের স্বপ্ন দেখা—এ ধরণের কোনো জাতীয় আবেগ তাঁর মধ্যে দেখা যায় নি। ভাবলে একটু বিস্মিত হতে হয় যে,···· তিনি নিজের দেশের স্বাধীনতার কথা ভাবেন নি কেন। একটি বিদেশী শাসনের তিনি অবিমিশ্র প্রশংসা করলেন, কিন্তু সেই শাসনে ভারতবাসীর আত্মাধিকার ও সর্বাঙ্গীন উন্নতি যে সম্ভব নয় এটা তিনি বিচার করে দেখেন নি।............ নিজের দেশের স্বাধীনতার কথা তিনি আগে চিন্তা করেননি কেন, তার কারণ নির্ণয় করা যায় না।····" (রামমোহন রচনাবলী, হরফ প্রকাশনী।)

ভারতের একজন প্রখ্যাত লেখক শ্রদ্ধেয় এস. বি. চৌধুরী মহাশয় ভারী চমৎকার ভাবে একটি পরাধীন দেশের নিপীড়িত মানুষের মনোভাব অল্প কটি কথায় ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ

"Every conquest and rule of foriegn power, whether imperial or colonial, has in it stain of evil, it wounds the spirit of the conquered country....The subjugation of a foriegn one that destroys the national character........A strange element foriegn to the soil, to the manners, to the blood of the country and encroaching on its custom and institutions and also on the very means of subsistance of the people builds up stresses and strain."

যাদের মধ্যে বিন্দুমাত্র আত্মমর্যাদাবোধ বর্তমান, তারা বিদেশী শক্তির

দাসত্বের চেয়ে মৃত্যুকেই শ্রেয় বলে মনে করেন। তাই এদেশের হাজার হাজার মানুষ স্বাধীনতার জন্য অস্ত্র হাতে ইংরাজদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে, অসহ্য নির্যাতন সহ্য করেছে এবং অজস্র রক্ত ঢেলেছে, বৃটিশ তোপ আর বন্দুকের মুখে। আজও তারা লড়াই করে চলেছে। বারবার পরাজিত হয়েছে, কিন্তু হতাশ হয়নি। শত্রুর সাথে আপোষ করেনি, আবার উঠে দাঁড়িয়েছে, তাদের সে লড়াই আজও শেষ হয়নি। আজও আফ্রিকা, এশিয়া, লাতিন আমেরিকায় স্বাধীনতাপ্রিয় মানুষ বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে অস্ত্র হাতে লড়াই করে চলেছে রক্তাক্ত অবস্থায়। কিন্তু বিদেশী শাসন ও প্রভুত্বকে তারা কিছুতেই মেনে নেয়নি। পরাধীনতা দুঃখ দুর্দশার কারণ বলেই নয়, বিদেশী শাসন, বিদেশী প্রভুত্ব, নিজের দেশে আক্রমণকারীর অস্তিত্ব সমগ্র জাতির পক্ষে অপমানজনক। রামমোহন যে সময় ইংরাজদের স্বপক্ষে তত্ত্ব উপস্থিত করেছেন সে সময় চীনের জনগণ (আফিম যুদ্ধে) বিদেশী আক্রমণকারী ইংরাজদের বিরুদ্ধে মরণপণ লড়াই করে চলেছে। যত ক্ষুদ্র জাতিই হোক, দেশের স্বাধীনতা কোন সৎ মানুষই বিকিয়ে দেননা বিদেশী শত্রুর কাছে। কখনই বিরোধিতা করেন না নিজের দেশের নিপীড়িত জনগণের সংগ্রামের। রামমোহনও নিজে নেপলস-এর জনগণের নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের পরাজয়ের খবর শোনার সঙ্গে সঙ্গে বলেছিলেন "স্বাধীনতার যারা শত্রু, স্বেচ্ছাতন্ত্রের যারা মিত্র তারা কখনও জয়ী হয়নি, কখনও শেষ পর্যন্ত জয়ী হতে পারে না।" (স্বাধীনতার সংগ্রামে বাঙলা)। কিন্তু বাঙলার আকাশে কোম্পানীর পতাকা উড়তে দেখে তিনি সম্পূর্ণ উল্টো কথা বললেন। বললেন যে, এ হচ্ছে ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ। "........বিদেশী শাসন হলেও তিনি সুপারিশ করলেন, ভারতের পক্ষে বৃটিশ শাসনের অধীনে আরও কিছুদিন থাকাই মঙ্গল। তার ফলে হারাতে হবে না বেশী কিছু, অথচ বৃটিশের অভিভাবকত্বে ভারত রাজনীতিক স্বাধীনতার পথে এগিয়ে যেতে পারবে।" (ঐ গ্রন্থ)। এই হল তাঁর দ্বিতীয় তত্ত্ব! নেপলস-এর ক্ষেত্রে স্বাধীনতার শত্রু হলো স্বেচ্ছাতন্ত্রের মিত্র। আর ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে অর্থাৎ তাঁর নিজের দেশের ক্ষেত্রে যারা চক্রান্ত করে নিরপরাধ স্বাধীন শাসনকর্তাকে নিহত করল, দেশের স্বাধীনতা হরণ করল, তার বুকের উপর দাঁড়িয়ে থাকল অসীম স্পর্ধায় সেই জাতীয় শত্রুরাই ভারতকে এগিয়ে নিয়ে যাবে স্বাধীনতার পথে!

১৮২৩ খৃষ্টাব্দে রামমোহন এবং তাঁর অনুগামীরা ইংলণ্ডের সম্রাটের কাছে (King in Council) তাঁদের পক্ষ থেকে একটি আবেদন পত্র মারফত যে বক্তব্য উপস্থিত করলেন তা সমগ্র জাতির ক্রোধ এবং ঘৃণা সৃষ্টি না করে পারে না। কোন দেশপ্রেমিক ব্যক্তি এইরকম একটি পত্র জাতীর শত্রুর কাছে পাঠাতে পারেন না। পৃথিবীর ইতিহাসে এমন একটি নজির আছে বলে আমাদের জানা নেই।

৩—মার্কসবাদের বিচারে

আবেদন পত্র প্রসঙ্গে

ঐ আবেদন পত্রের একটি ক্ষুদ্র অংশ এখানে লিপিবদ্ধ করা হলো। তা থেকে তাঁদের সেই বক্তব্যের কিছুটা মর্ম উপলব্ধি করা যাবে।

"May it please your Majesty, we, your Majesty's faithful subjects, Natives of India and inhabitants of Calcutta, being placed by providence under the Sovereign care and protection of the august head of the British Nation, look up to your Majesty as the guardian of our lives, property and relegion, ...

....

"Divine Providence at last, in its abundant mercy, stirred up the English nation to break the yoke of those tyrants, and to receive the oppresed Natives of Bengal under its protection. Having made Calcutta the capital of their dominious, the English distinguished this city by such peculiar marks of favour, as free people would be expected to bestow, in establishing an English court of Judicature, and granting to all within its jurisdiction, the same civil rights as every Briton enjoys in his native country ; thus putting the Natives of India in possession of such privileges as their forefathers never expected to atain, even under Hindu Rulers. Considering these things and bearing in mind also the solicitude for the welfare of this country, uniformly expressed by Honourable East India Company, under whose immediate control we are placed, and also by the Supreme Councils of the British nation, your dutiful subjects consequently have not viewed the English as a body of Conquerors but rather as deliverers, and look up to your Majesty not only as a Ruler, but also as a father and protector." (Appeal to the king-in Council-1823) (রামমোহন রচনাবলী—হরফ প্রকাশনী থেকে উদ্ধৃত)। ঐ আবেদন পত্রে ইংলন্ডের রাজাকে 'আক্রমণকারী' বলে গণ্য করা হলো না, অভিহিত করা হলো 'মুক্তিদাতা' বলে ; শুধু শাসন কর্তা বলেই মনে করা হলো না ; অভিহিত করা হলো 'রক্ষক' এমন কি 'পিতা' বলে। ইংরাজদের প্রতি আনুগত্য ও বশ্যতা কোন্ পর্যায়ে উঠলে যে-আক্রমনকারীরা মিরজাফর, জগতশেঠ, উমিচাদ, প্রভৃতি

দেশদ্রোহীদের সঙ্গে চক্রান্ত করে বাঙলার শেষ স্বাধীন শাসন কর্তা সিরাজুদ্দৌল্লাহকে নিহত করে স্বাধীন বাঙলা দেশ দখল করলো, একে একে অন্যান্য রাজ্য এমন কি ভারতের পার্শ্ববর্ত্তী স্বাধীন রাজ্যগুলিও দখল করলো সেই দস্যু চূড়ামনি ক্লাইভদের সর্দার ইংলণ্ডীয় রাজাকে 'মুক্তিদাতা' 'রক্ষক' এমন কি 'পিতা' বলে সম্বোধন করা সম্ভব তা ভেবে দেখার মতো। এই ভাবে ঐ আবেদন পত্রে শুধু বাঙলা দখল করাই সমর্থন করা হলো না ; সমর্থন করা হলো পলাশী যুদ্ধের অভিনয় করে চক্রান্তের দ্বারা ইংরেজদের অন্যায়ভাবে সিরাজুদ্দুল্লাহকে নিহত ও দেশ দখল করাকেও।

রামমোহন ও তাঁর অনুগামীরা সরকারের প্রতি কি ধরনের মনোভাব পোষণ করতেন সেটা যে পূর্ব্বেই তাঁরা পত্রিকায় প্রকাশ করেছিলেন—যার প্রমান "Final Appeal to the Christian public" প্রবন্ধ এবং প্রবন্ধটির রচয়িতা যে রামমোহন রায় ঐ আবেদন পত্রে সে-সম্পর্কেও সম্রাটের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। উল্লিখিত "Final Appeal to the Christian public" এ লেখা হয়েছিল ঃ

"I now conclude my Essay in offering up thanks to the Supreme Disposer of the universe, for having unexpectedly delivered this country, from the long continued tyranny of its former Rulers, and placed it under the Govt. of the English, a nation who not only are blessed with the enjoyment of civil and political liberty, but also interest themselves in promoting liberty and social happiness, as well as free inquiry into literary and religious subject among those nations to which their influence extends" (ঐ গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত)।

যে-সময় দেশ জুড়ে বিভিন্ন শ্রেনীর জনগন অস্ত্র হাতে ইংরাজদের সঙ্গে মরনপণ সংগ্রামে লিপ্ত ঠিক সেই সময় বৃটিশ শাসক বর্গকে অভিহিত করা হলো ভারতীয়দের 'অভিভাবক' 'মুক্তিদাতা' 'রক্ষক' এমন কি 'পিতা' বলে। তাতে ইংরাজদের মত আক্রমনকারী জাতীয় শত্রুদেরই হাত যে শক্ত করা হলো, তা বলাই বাহুল্য। সে-সময় ইংরাজরা যে-সব দেশদ্রোহীর সঙ্গে চক্রান্ত করে পলাশী যুদ্ধের অভিনয় করে বাঙলার শাসন ক্ষমতা দখল করলো, ঐ চক্রান্তকারীরা ছাড়া ইংরাজদের পক্ষে সে-সময় আর কেউই ছিল না। এমন কি জমিদার শ্রেণীও না। গভর্নর জেনারেল হেষ্টিংসের বা অন্যান্য অনেকের বক্তব্য থেকেও তা বোঝা যায়। হেষ্টিংস "একটি বিবরনীতে উল্লেখ করেছেন ঃ 'বড় বড় জমিদারেরা তাঁদের প্রচণ্ড প্রভাব ব্যবহার করে থাকেন সরকারের বিরুদ্ধে এবং সেই জন্যই তাদের প্রভাব নষ্ট করা বাঞ্ছনীয়।" ('স্বাধীনতার সংগ্রামে বাঙলা গ্রন্থ' থেকে উদ্ধৃত)। গভর্নর জেনারেল লর্ড বেণ্টিঙ্ক ও (১৮২৮-১৮৩৫) "একটি সরকারী বক্তৃতায়

খোলাখুলি ভাবে প্রকাশ করেন। এই সম্পর্কে তিনি মন্তব্য করেন ঃ

"গণবিক্ষোভ বা গণবিপ্লব থেকে নিরাপত্তা রক্ষার দিক থেকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের একটি বিশেষ মূল্য আছে। এই বন্দোবস্ত অন্যান্য অনেক দিক থেকে এবং অনেক মূল বিষয়ে একেবারে নিরর্থক হলেও বৃটিশ আধিপত্যের উপর নির্ভরশীল এক ধনী জমিদার-গোষ্ঠীর সৃষ্টি করেছে।" (ঐ গ্রন্থ)। স্বাভাবিক ভাবেই ঐ 'আবেদন পত্র' এবং বিশেষ করে ঐ ধরণের 'উক্তি' আক্রমণকারী বৃটিশ শাসক বর্গের অর্থাৎ জাতীয় শত্রুরই হাত যে শক্ত করলো তা বলাই বাহুল্য। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে "চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত" করার পরেও যে-সুযোগ পাওয়া সম্ভব হয়-নি এবার ইংরাজরা সে-সুযোগ লাভ করলো। অর্থাৎ এতদিনে উর্ব্বর মাটির স্পর্শ লাভ করলো এবং যথা সময়ে প্রয়োজনীয় ফসল তোলার ব্যবস্থা করবে তারা। ভারতে জোরপূর্ব্বক বৃটিশ শাসন চাপিয়ে দেওয়াকে ন্যায়সঙ্গত বলে প্রমাণ করার এবং প্রমাণ স্বরূপ প্রভাবশালী ভারতীয়দের আনুগত্য (ঐ শাসনের প্রতি) ও বশ্যতা স্বীকৃতির দলিল পত্রেরও প্রয়োজন ছিল তাদের। ঐ আবেদন পত্র এবং উল্লিখিত প্রবন্ধটি হলো সেই ধরণেরই দলিল। স্বভাবতঃ তাঁদের আবেদন পত্র পাবার পর ইংরাজরা মস্তবড় সুযোগ লাভ করলো 'ভারতীয়দের কল্যাণের নামে' ইংরাজ শাসনবিরোধী জনগনের বিরুদ্ধে কঠোর দমন নীতি প্রয়োগ করার। ইংরেজরা যে বহু পূর্ব্ব থেকেই আপ্রাণ চেষ্টা করে আসছিল দেশীয় ধনী অভিজাত শ্রেণীর সমর্থন লাভের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়েই নয় পরবর্ত্তী কালেও। শাসক বর্গের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের বক্তব্য থেকে তা বোঝা যায়। মানচেষ্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক মিঃ রামসে মুর তাঁর "Making of British India" গ্রন্থে লিখেছিলেন যে—ইঃ ইঃ কোম্পানী 'rendeied immeasurable service to the people of India'. তাঁর মতে কোম্পানীর অমূল্যদান হচ্ছে ভারতে রাজনৈতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠা ; যা পূর্ব্বে কোনদিন ছিল না। দ্বিতীয়ত শান্তি শৃংখলা প্রতিষ্ঠা ; তৃতীয়ত "Right of law which under Company's rule took the place of arbitrary will of the innumerable despots." (২৩)

কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে (১৮৮৪ খৃঃ) ভারতসংক্রান্ত বিষয়ে বক্তৃতা দেবার সময় Sir John Strachy বলেছিলেন ; "There is hardly any country possessing a civilized administration where the public burdens are so light. Mr. J. S. Mill declared his belief that British Govt. in India was not 'not only one of the purest in intention but one of the most beneficent in act, ever known among mankind' ; I do not doubt that this is truer now." "whether all this makes our Govt. really popular is another question........The truth is that in a country in the condition

of India the more actively enlightened our Govt. becomes, the less likely it is to be popular." "our Govt. is highly respected ; the confidence of people in our justice is unlimited." সর্ব্বশেষে তাঁর মন্তব্য হলো : "it is to govern India with unflinching determination on the principles which our superior knowledge tells us are right although they may be unpopular." সাম্রাজ্যবাদীরা সারা ইউরোপ জুড়ে এমনভাবে প্রচার করতো যে, ইউরোপেরও কেউ কেউ বলতেন "The rule of the British crown over India since 1858 was certainly beneficial to Indian people although the Govt. was not popular in India as before." "As before" কথাগুলি লক্ষ্যনীয়। অনুমান 'As before' বলতে ১৮২৩-৩৩ এর বছরগুলি বোঝানো হয়েছে। আবার কেউ কেউ বিশ্বাস করতেন যে "awakening of India came from the British rule" "The British Rulers thus justified themselves before the world."

১৮৩২ খৃষ্টাব্দে রামমোহন গর্ডন নামে বিলেতের এক বন্ধুকে যে চিঠি লিখেছিলেন তারো "মর্ম" সাম্রাজ্যবাদী ইংরাজদের উপরিলিখিত বক্তব্যেরই প্রতিধ্বনি মাত্র। তিনি লিখেছিলেন "after which I first saw and began to associate with Europeans and soon after made myself tolerably acquainted with their laws and form of Govt. Finding them generally more intelligent, more steady and moderate in their conduct. I gave up my prejudice against them, and became inclined in their favour, feeling persuaded that their rule, though a foreign yoke, would lead more speedily and surely to the amelioration of the native inhabitants ; and I enjoyed the confidence of several of them even in their public capacity ...... that I was at last deserted by every person except two or three scotch friends, to whom, and the nation to which they belong, I always feel grateful........

.......I now felt a strong wish to visit Europe, and obtain, by personal observation, a more thorough insight into its manners, customs, religion, and political institution .." (২৪)

পূর্ব্বোল্লিখিত আবেদন-পত্রের ৪৩ তম অনুচ্ছেদটিও উল্লেখ্য : "........Although under the British Rule, the natives of India, have entirely lost this political consequence, your Majestiy's faithful subjects were consoled by the more secure

enjoyment of those civil and religious rights which had been so often violated by the rapacity and intolerance of the Mussalmans ; and not withstanding the loss of political rank and power, they considered themselves much happier in the enjoyment of civil and religious liberty than were their ancestors ;........"

রামমোহন এবং তাঁর অনুগামীদের বক্তব্যের মধ্যে তাঁদের অর্থাৎ এদেশের ব্যবসায়ী বুর্জোয়া এবং জমিদার শ্রেণীর মনোভাবটি পরিষ্কার ভাবে তুলে ধরা হয়েছে। রাজনীতি সচেতন মানুষ মাত্রেই স্বীকার করবেন যে এই মনোভাব হচ্ছে সেই বিশেষ শ্রেণীরই রাজনীতির প্রতিফলন—যাদের জন্ম বিদেশী উপনিবেশিক শক্তির গর্ভে। বিদেশী শক্তিকে মদত দেবার জন্যেই যাদের সৃষ্টি করা হয়ে থাকে। কিন্তু জাতির জীবনে বিপজ্জনক হলো এই যে এই বক্তব্য ভারতের ধনী শিক্ষিত জনসমাজের মধ্যে এক বিভ্রান্তির সৃষ্টি করলো। তাদের জন্য এমন এক নীতির সৃষ্টি করা হলো বৃটিশ শাসক বর্গের ধর্মীয় নীতির সঙ্গে যার হুবহু মিল খুঁজে পাওয়া যায়। "সম্রাটের জিনিষ সম্রাটকে ফিরিয়ে দাও"। তুমি হলে ঈশ্বরের ক্রীতদাস—ইহলোকে যা পাও তাতেই সন্তুষ্ট থাকো। তোমার জন্যে আছে মৃত্যুর পরে অনন্ত জগত সুখ ও শান্তির। সম্রাট সিজারের যা প্রাপ্য অর্থাৎ সম্রাট যা দাবী করে তা কড়ায় গণ্ডায় মিটিয়ে দেওয়া যদি ধর্মের বাণী হয়ে থাকে অথবা চেতনার উন্নত মানের পরিচয় দেওয়া হয়ে থাকে তাহলে সেই ধর্মে হস্তক্ষেপ করা দূরের কথা সীজারের কর্তব্য হবে সেই ধর্মকে আরো শক্তিশালী করে তোলা। রাজনৈতিক অধিকার হতে বঞ্চিত থেকে 'ধর্মাচরণের অধিকার' লাভ করে 'স্বাধীকারে' ও সম্মানিত 'জীবনে' বিশ্বাসী, সুস্থ মানুষের পক্ষে যদি সুখ শান্তি লাভ করা সম্ভব হতো, 'সম্পত্তি রক্ষার অধিকার' বলতে যদি বোঝাতো একটি পরাধীন দেশের শাসক শ্রেণীর প্রণীত আইনের দ্বারা অনুমোদিত "অধিকার" তাহলে বহু অর্থব্যয় করে উন্নতমানের অস্ত্র সজ্জিত বিশাল সৈন্যবাহিনী পুষে রাখার, শক্তিশালী মারনাস্ত্র নির্মাণের, অসংখ্য কারাগার তৈরী করার, নানা আইন কানুন প্রণয়ন করার, ভারত মহাসাগরে জলদস্যুতা করার, ভারতকে অন্যায় ভাবে দখল করার, এমনকি "সংবাদ পত্রের" সামান্য অধিকার হরণ-করার প্রয়োজন হতো না ইংরেজদের।

ইহলোকের বৈষয়িক বিরোধ গুলি যদি মিটে যেতো তাহলে হয়তো ধর্মাচরনের অধিকার লাভের প্রশ্ন উঠ্‌তো না। ধর্মে হস্তক্ষেপ করতে হয়নি সম্রাট সিজারকে কিন্তু বেশ কিছুদিন চিৎকার করে বেড়াতে হয়েছে মিঃ টমাস মুয়েন্‌জারকে চার্চের বিরুদ্ধে কেননা চার্চ তাঁর 'ইহলোকের" দাবী মিটাতে পারেনি। কিন্তু প্রতিকুল অবস্থার কাছে আত্ম-সমর্পণে অথবা তার বশ্যতা স্বীকারে অবস্থার তিলমাত্র পরিবর্তন ঘটেনা বরং আত্মসমর্পণকারীকেই করে

তোলে সেই প্রতিকূল অবস্থারই ক্রীড়নক।

স্বাভাবিক ভাবেই এক অলঙ্ঘনীয় ব্যবধান রচিত হলো জনগণ আর রামমোহন ও তাঁর অনুগামীদের মধ্যে। রামমোহন ও তাঁর অনুগামীরা এক হয়ে মিশে গেলেন প্রতিকূল অবস্থার যারা সৃষ্টিকারী তাদের সঙ্গে। তাঁদের উত্তীর্ণ হতে হলো এমন এক নির্জন দ্বীপে যেখানে ইংরাজরা আর তাদের দেশীয় ক্রীতদাসগুলি ছাড়া আর কেউই ছিলনা। আর তার বিপরীত বিন্দুতে অন্য আর এক দ্বীপে দাঁড়িয়েছিলেন ভারতের সংগ্রামী জনগণ এমনকি সেই মূর্খ নিরন্ন ভিক্ষুকটি পর্যন্ত তাঁর প্রাচীন পুঁথির জীর্ণ পাতাটি সম্বল করে দাঁড়িয়ে ছিলেন সেখানে, বিদেশীদের আক্রমণ থেকে জাতীয় মর্যাদা, আত্মসম্মান রক্ষার জন্য—যা জীবনের চেয়েও মূল্যবান। "Death is better than disgraceful life." কিন্তু রামমোহন ও তাঁর অনুগামীরা পরাধীন ভারতবর্ষেরই মানুষ। পরাধীন দেশের কোন মানুষকেই সাম্রাজ্যবাদীরা সহজে বিশ্বাস করতে পারে না। প্রতিটি পরাধীন মানুষের কাছ থেকে বিদেশী সরকারের প্রতি তার আনুগত্যের প্রমাণ চায়। রামমোহন ও তাঁর অনুগামীরা তার প্রমাণ দিতেও কুণ্ঠিত হননি। কিন্তু তাঁরা বৃটিশ শাসনের প্রতি কোলকাতার নাগরিকদের আনুগত্যের প্রমাণ হিসাবে যে-যুক্তিগুলি Supreme Court এর কাছে সেদিন অন্য একটি আবেদন পত্র মারফত উপস্থিত করেছিলেন তা স্বাধীনতাপ্রিয় মানুষের কাছে বিস্ময়ের উদ্রেক করলেও আবেদন পত্র লেখকদের কাছে এটা ছিল স্বাভাবিক এবং তাঁদের শ্রেণীর চরিত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ সঙ্গতি পূর্ণ।

ঐ আবেদন পত্রের যে অংশে কোলকাতার অধিবাসীদের আনুগত্যের প্রমাণের যুক্তি লিপিবদ্ধ করা হয়েছিলো সেই অংশটি এখানে উদ্ধৃত হলো। তাঁরা লিখেছিলেনঃ "Your Lordship is well aware, that the Natives ofCalcutta and its vicinity, have voluntarily entrusted Govt. with millions of their wealth, without indicating the least suspicion of its stability and good faith, and reposing in the sanguine hope that their property being so secured, their interests will be as permanent as the British Power itself ; while on the contrary, their fathers were invariably compelled to conceal their treasures in the bowels of the earth, in order to preserve them from the insatiable rapacity of their oppressive Rulers.

... .

During the last wars which the British Govt. were obliged to undertake against neighbouring Powers, it is well known, that the great body of Natives of Wealth and respectability, as well as the Landholders of consequence, offered up regular prayers to the object of their worship for the success of the

British arms from a deep conviction that under the sway of that nation, their improvement both mental and social, would be promoted, and their lives, religion and property be secured. Actuated by such feeling, even in those critical times, which are the best test of the loyalty of the subject, they voluntarily came forward with a large portion of their property to enable the British Govt. to carry into effect the measures necessary for its own defence, considering the cause of the British as their own and firmly believing that on its success, their own happiness and prosperity depended."

বৃটিশ সরকারের প্রতি আনুগত্যের এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ আর কি থাকতে পারে। আমরা আরো দেখি, মোগল শাসনের নাগপাশ ছিন্ন করে 'মারাঠা' ও 'শিখ' জাতির স্বাধীন রাজ্য গঠনে রামমোহন পরোক্ষে সন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন সম্রাটের কাছে প্রেরিত আবেদন পত্রের তৃতীয় অনুচ্ছেদে। তাঁরা লিখেছিলেন:
"The greater part of Hindustan having been for several centuries subject to Muhammadan Rule, the civil and religious rights of its original inhabitants were constantly trampled upon, and from the habitual oppression of the conquerors, a great body of their subjects in the Southern Peninsula (Dukhin), afterwards called Marhattahs and another body in the western parts now styled Sikhs, were at last driven to revolt; and when the Mussalman power became feeble, they ultimately succeeded in establishing their independance; "

কিন্তু সেই স্বাধীন মারাঠা রাজ্য যে-মুহূর্তে ইংরাজরা দখল করে তাদের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করলো সেই মুহূর্তে সেই স্বাধীন মারাঠা রাজ্যের উপর ইংরাজদের জয়কে ভারতবাসীদের জয় বলে ঘোষণা করা হলো। নিচের মন্তব্যটিও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য।

"Mr Elphin Stone observed in 1832 that 'Is it possible that a foreign Govt. avowedly maintained by the sword can long keep its ground in such circumstances?' Rammohon took great pain to prove that the loyalty of the people of India to the British Govt. was deep and unshakable. As proofs of loyalty he said that.... the citizens of Calcutta offered prayers for the victory of the British during third

Marhattah and Nepal wars."

উল্লেখ্য হুগলীর "সুবর্ণ বনিক সমাজের একজন প্রধান লক্ষ্মীকান্ত ধর ওরফে নকু ধর কোম্পানীকে ঋণ দিয়ে সাহায্য করেন। ইনিই আবার প্রথম মারাঠা যুদ্ধের ব্যয় নির্বাহের জন্য ইংরেজকে নয় লক্ষ টাকা দিয়ে সাহায্য করেন।" (স্বাধীনতার সংগ্রামে বাঙলা—নরহরি কবিরাজ) "কাশীর চ্যারিটি স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা জয়নারায়ণ ঘোষাল দেশীয় রাজাদের উপর বৃটিশ জয়কে অভিনন্দন জানাতে এক আলোক সজ্জার ব্যবস্থা করেন।" (Asiatic Journal 1818 ঐ গ্রন্থ থেকে)। শ্রদ্ধেয় নরহরি কবিরাজ মহাশয় মন্তব্য করেছেন ঃ "যারা এই সময়ে আত্মবিক্রয় করেছিল বিদেশী প্রভুদের কাছে তারা ছিলো দেশের জনসংখ্যার এক মুষ্টিমের অংশ। সমগ্র জাতির চোখে এই অংশ ছিল বিদেশী শাসনের আশ্রিত জাতির দুশমণ।" (ঐ)

আরো লক্ষ্য করার বিষয়, শুধু মারাঠার উপরই নয়, স্বাধীন প্রতিবেশী রাজ্য নেপালের উপরও ইংরাজদের জয়কে নিজেদের জয় বলে ঘোষণা করা হয়েছিলো।

আরো একটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে উঠলো তা হলো নিজের দেশের অন্যান্য রাজ্যগুলির এমনকি প্রতিবেশী স্বাধীন রাজ্যের উপর ইংরাজদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠাকে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার উপায় বলেও ঘোষণা করা হলো। নিজেদের আবেদন পত্রে তাঁরা নিজেরাই প্রকাশ করে ফেললেন যে তাঁদের অস্তিত্ব এদেশে ইংরাজদের অস্তিত্বের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল।

এখানে উল্লেখ যোগ্য যে অনুমান স্বাধীন নেপাল রাজ্য দখল করার মূলে অন্যতম একটি কারণ ছিল ভারতীয় জনগণের 'প্রথম মুক্তি যুদ্ধে' স্বাধীন নেপাল রাজার সক্রীয় সাহায্য ও সহযোগীতা। ভারতীয় মুক্তি যোদ্ধাদের পাশে দাঁড়িয়ে ভারত থেকে ইংরাজ শাসন উচ্ছেদের জন্য অস্ত্র হাতে যুদ্ধ করেছিলেন নেপালের অধিবাসীরাও। যুদ্ধের একটি পর্যায়ে নেপালের সীমান্ত এলাকায় মুক্তি যোদ্ধারা একটি শিবির গড়ে তুলেছিলেন। সেখানে ভারতের নানা অঞ্চল থেকে বিদ্রোহীরা আসতেন, যুদ্ধ শিক্ষা করতেন, যে রাজস্ব আদায় হতো তার হিসাব নিকাশের কাজ করার জন্য একটি কাছারিও ছিল। ইংরাজরা এখবর জানতে পারে এবং ভারতের মুক্তি যোদ্ধাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বলে স্বাধীন নেপাল রাজাকে। তারা বলে মুক্তি যোদ্ধাদের গ্রেপ্তার করে তাদের হাতে তুলে দিতে হবে। তিনি এ-প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। তাতে তারা স্বাধীন নেপাল রাজাকে আক্রমণের হুমকিও দেয়। বলা হয়েছে ঃ "The Govt ..... recorded a resolution that in case the Raja of Nepal failed to accede to a further representation for preventing the fakirs (Liberation Army of India—writer) from finding a retreat in the Nepal territory, the Governor General in council would 'take into

consideration the propriety of pursuing the Fakirs beyond the Company's limits," (Sannyasi and Fakir Raiders in Bengal by J. M. Ghose p 125)

ভারতের জনগণের সংগ্রামী প্রতিবেশী বন্ধুদেশ সেই নেপালের উপর বৃটিশ জয়কেও নিজেদের জয় বলে মনে করা হলো। এই অবস্থার বিচারে শিখ-রাজ্য দখল করার ব্যাপারে ইংরাজদের গভীর চক্রান্তের সঙ্গে কোলকাতার অধিবাসী-দের যুক্ত থাকার সম্ভাবনাকেও উড়িয়ে দেওয়া যায় না। বিশ্বস্ত সূত্রে জানা যায় যে ইংরাজরা শিখ রাজ্য দখল করার পূর্বে দেশীয় দালাল শ্রেণীর লোকদের সঙ্গে এক ঘৃণ্য চক্রান্তে লিপ্ত হয় শিখ রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে। শিখ রাজ্যের স্বাধীন শাসন কর্তার মৃত্যু হলে তাঁর পরিবারের লোকজনদের একের পর এক চক্রান্ত করে হত্যা করা হয়। বলা হয়েছে ঃ Ranjit Singh's second son Maharaja sher Singh was assassinated by Ajit Singh Sandhawalia who, pretending to show to his Sovereign the corbine he had got from an Englishman while on a visit to Calcutta, emptied the barrel into the Maharaja's chest killing him on the spot". (A Brief Account of Sikh People by Ganda Singh).

এই কোলকাতা ছিল সেদিন দেশী বিদেশী চক্রান্তকারীদের সদর ঘাঁটি। এখানেই শোনা যায় বাঙলার নবাবের বিরুদ্ধে এক গোপন ষড়যন্ত্রে আর্মেনিয়ান, হুগলীর বণিক সমাজ, শেঠ ও কতিপয় মুসলমান ইংরাজদের সঙ্গে মিলিত হয়। পলাশীর যুদ্ধের আগে কাঁদি ও পাইক পাড়ার জমিদার বংশের "রাধাকান্ত সিংহ সিরাজদ্দৌলার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন ও ইংরেজকে সরকারী দলিল পত্র দিয়ে সাহায্য করেন।"

উপরিলিখিত আবেদন পত্র ও রামমোহনের চিঠি পত্র থেকে এটা বুঝতে অসুবিধা হয়না—ওই পত্র গুলি বৃটিশ স্বার্থের সঙ্গে দেশীয় দালাল বুর্জোয়া ও জমিদার শ্রেণীর স্বার্থের অর্থাৎ বৃটিশ শাসক বর্গের সঙ্গে ঐ দুটি দেশীয় শ্রেণীর মিলিত হবার দেশীয় ঘোষণা পত্র ছাড়া আর কিছুই নয়। ওই সব দলিলের সঙ্গে সেদিনের বা বর্তমান কালের শ্রমজীবি জনগণের, স্বাধীনতাকামী কোন মানুষের কোন প্রকার সম্পর্ক যে থাকতে পারে না বা সেই ধরনের কোন সম্পর্ক অনুসন্ধান করাও যে বৃথা তার প্রমাণ ঐ আবেদন পত্র দুখানিই। এখানে উল্লেখ যোগ্য সরকার থেকে সংবাদ পত্র প্রকাশ (মুদ্রাযন্ত্র আইন) সম্পর্কে নতুন নিয়ম কানুন চালু করলে সে-সম্পর্কে আবেদনকারীরা ঐ দুটি আবেদন পত্র মারফত তাঁদের মতামত ব্যক্ত করেছিলেন।

সর্বশেষে সম্রাটের কাছে প্রেরিত আবেদন পত্রে উল্লিখিত " Final Appeal to the Christian public " সম্পর্কে একটা কথা বলা দরকার। লক্ষ্য করা যেতে পারে ঐ Final Appeal " এ বলা হয়েছে ঃ " Under the Govt. of

the English,—a nation who not only ....but also interest themselves in promoting liberty and social happiness, as well as free inquiry into literary and relegious subjects among those nations to which their influence extends."

এখানে খুব স্পষ্ট ভাবেই পরোক্ষে এশিয়া আফ্রিকার অন্যান্য জাতিগুলিকে পরাজিত করে ইংরেজদের অধীনস্ত করে রাখার প্রতি দৃঢ় সমর্থনই জানানো হলো। স্বাভাবিক ভাবেই আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও ওই ধরনের বক্তব্য শুধু উদ্বেগের কারণ হয়ে উঠলো না, ইংরেজদের মত উপনিবেশিক শক্তির অস্তিত্ব যেমন বিভিন্ন স্বাধীন জাতির অস্তিত্বের পক্ষে উদ্বেগের কারণ ছিল, তেমনি দেশীয় দালাল বুর্জোয়া শ্রেণীর অস্তিত্বও যে তাদের কাছে উদ্বেগের কারণ হয়ে উঠেছিলো বললে ভুল হবে না।

সংবাদ পত্রের স্বাধীনতা সম্পর্কে

সংবাদ পত্রের স্বাধীনতা সম্পর্কে বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবিরা এমন একটি ধারণার সৃষ্টি করতে চান যে রামমোহন সংবাদপত্রের স্বাধীনতার জন্য "সিংহের" মত লড়াই করেছিলেন। এ-সব কথাবার্তার সঙ্গে বাস্তবের কোন মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। জিজ্ঞাসা করা যেতে পারে বিশ্বের স্বাধীন দেশেও কি সংবাদ পত্রের স্বাধীনতা স্বীকার করা হয়? পুঁজিবাদীরা "সংবাদ পত্রের স্বাধীনতা" এই কথাটা প্রচার করে থাকে সংবাদ পত্রের প্রকৃত স্বাধীনতাকে হরণ করার মতলবে। এই শব্দগুলির দ্বারা তারা লুকিয়ে রাখতে চায় তাদের আসল উদ্দেশ্য। কোন শ্রেণীবিভক্ত সমাজে "সংবাদপত্রের স্বাধীনতা" স্বীকার করা সম্ভব হয় না। একটা পর্যায়ে এই স্বাধীনতা দমন করার প্রয়োজন হয়ে ওঠে শাসক শ্রেণীর স্বার্থে। যতক্ষণ শাসক শ্রেণীর স্বার্থে আঁচড় কাটে না বা তাদের গায়ে হাত পড়ে না ততক্ষণ সংবাদ পত্রগুলি 'স্বাধীনতা' পেয়ে থাকে। কিন্তু যে মুহূর্তে সংবাদ পত্রের কোনো আচরণে তাদের স্বার্থ বিপন্ন হয় সেই মুহূর্তেই তার 'স্বাধীনতা' খর্ব করা হয়। সংবাদ পত্রের স্বাধীনতা বা এই সব কথার জাল বুনে তারা এই সত্যকে গুলিয়ে দিতে চায়। এটা কোন গোপন কথা নয়। সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত অর্থাৎ সামন্ত শ্রেণীর বা পুঁজিবাদী শ্রেণীর শোষক গোষ্ঠীর বা তাদের গোপন বাহিনীর সম্পূর্ণ ধ্বংস না হওয়া পর্যন্ত কোনো শ্রেণীবিভক্ত সমাজে এমনকি সমাজতান্ত্রিক সমাজেও (এটিও শ্রেণীবিভক্ত সমাজ) এই প্রকার স্বাধীনতা দেওয়া বিপজ্জনক। এই জনাই প্রয়োজন হয়

সমাজতান্ত্রিক সরকারের জন্য "সর্ব্বহারার একনায়কত্ব"। এই সর্ব্বহারার একনায়কত্বকে এই কারণেই পুঁজিবাদী শ্রেণীর বা তার রাজনৈতিক দলগুলির এত ভয়। এই কারণেই বুর্জোয়া একনায়কত্বকে তারা আড়াল করে রাখতে চায় 'সংসদীয় গণতন্ত্রের' বা ঐ ধরণের বিভিন্ন আবরণ দিয়ে। সুতরাং বৃটিশ ভারতবর্ষের মত একটি পরাধীন দেশে 'সংবাদ পত্রের স্বাধীনতা"একটি কল্পনাতীত ঘটনা। এ-কথা কোন্ মূর্খ না বোঝে। রামমোহনের "free Press" এর দাবীর মূলে প্রধান উদ্দেশ্য ছিলো: "not to subvert the existing Govt. but to strengthen and popularise it through free press" "Rammohan hold that if freedom of discussion were allowed they could explain to the public the excellence of the system of Govt. established by the British in India." (২৫)

বৃটিশ শাসন সুদৃঢ় করার কাজে সংবাদপত্রের যে-একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে এই কথাটা তিনি কতকগুলি যুক্তির ভিত্তিতে বৃটিশ সরকারকে বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন। এ সম্পর্কে শ্রদ্ধেয় বিমান বিহারী মজুমদারের মন্তব্য উল্লেখ যোগ্য। তিনি বলেছেন: "The Raja was aware of the inherent difficulty of making law from England for a distant country in an age when rapid communication was not feasible. He suggested three methods of farreaching consequences for ensuring good laws for India. The fast and foremost is the Free Perss.

He adduced four different arguments to show that freedom of Press was necessary for making good laws, for India ... ." (History of Political thought)

যত সুন্দর সুন্দর আইন করা হোক না কেন এই free press এর সঙ্গে ভারতের 'স্বাধীনতা' বা বৃটিশ সরকারের অন্যায়ের বিরুদ্ধে কোন স্বাধীনতাপ্রিয় ভারতবাসীর সমালোচনা করার অধিকারের সঙ্গে কোন সম্পর্ক ছিলো না। এ স্বাধীনতা হলো বৃটিশ সরকারের পক্ষে সংবাদ পত্রকে সঠিকভাবে দক্ষতার সাথে ব্যবহার করার স্বাধীনতা। এটাই বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবিরা "স্বাধীনতা" শব্দটি আমদানী করে গুলিয়ে দেবার অপচেষ্টা করে থাকে।

এখানে পুনরায় স্মরণ করিয়ে দেওয়া দরকার যে রামমোহনের রাজনৈতিক আন্দোলন গড়ে উঠেছিল বৃটিশ শিল্প পুঁজির এবং দেশীয় ব্যবসায়ী বুর্জোয়া ও জমিদার শ্রেণীর স্বার্থে। স্বভাবতঃ তাঁর সংবাদ পত্র প্রকাশের মূল লক্ষ্য ছিলো ভারতীয় জনগণের মধ্যে বৃটিশ শাসনকে জনপ্রিয় করে তোলা এবং ব্যবসায়ী হিসেবে "সংবাদ পত্রের" ব্যবসা করে কিছু অর্থ উপার্জন করা। ভারতে যে কয়েকখানি সংবাদ পত্র ছিলো—সেইসব সংবাদ পত্র সম্পর্কে শাসকবর্গ

একটি পর্যায়ে কয়েকটি নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। সে-গুলি প্রত্যাহার করার জন্য রামমোহন এবং তাঁর অনুগামীরা প্রথমে সুপ্রীম কোর্টের কাছে এবং পরে ইংলন্ডের রাজার কাছে স্মারক পত্র মারফত যে আবেদন পত্র পেশ করেন এদেশের দালাল বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবিরা তাঁদের সেই আবেদনকে রামমোহনের সংবাদপত্রের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রথম সূত্রপাত বলে প্রচার করে থাকে। কিন্তু মজার কথা, এই স্মারকপত্র দুটির বক্তব্য জনসমাজের বিশেষ করে তরুণ শিক্ষিত সমাজের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখা হয়.এবং নিজেদের মনগড়া কথার জাল বিস্তার করা হয়। প্রকৃত পক্ষে বৃটিশ স্বার্থ সুরক্ষিত করার প্রতিশ্রুতি দেওয়াই যে তাঁদের প্রধান বক্তব্য ছিল স্মারকপত্র দুটিই তার জ্বলন্ত প্রমান। প্রথমে সুপ্রীম কোর্টের কাছে যে-আবেদন পত্রটি পাঠানো হয় তার দ্বিতীয় অনুচ্ছেদটি এখানে উল্লেখ করা হলো। ওই অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে ঃ " Your Memorialists beg leave, in the first place, to bring to the notice of your lordship, various proofs given by the natives of this country of their unshaken loyaltly to and unlimited confidence in the British Govt. of India which may remove from your mind any apprehension of the Govt. being brought into hatred and contempt or of the peace, harmony and good order of Society in this country, being liable to be interupted and destroyed, as implied in the preamble of the above Rule and ordinance."

"King in council" এবং সুপ্রীম কোর্টের কাছে লেখা আবেদন পত্রদুটির কিছু কিছু অংশ পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। এখানেও আরো কয়েকটি অনুচ্ছেদ উল্লেখ করলে সংবাদপত্রের স্বাধীনতার আন্দোলনের প্রকৃত চরিত্রটি সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে।

দেখা যায় King in council-কে লেখা আবেদন পত্রে সংবাদ পত্র সম্পর্কিত "আবেদনের" নামে ইংরাজ শাসনের সমালোচনার বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তি দিবার দাবীও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় করা হলো। তাই লেখা হলো "Your Majesty's faithful subjects could have surely no inducement in this distant quarter of the world to make contumelious and injurious reflections on your Majesty or any of the members of your Majesty's illustrious family, or to circulate them among people to whom your Majesty's name is scarcely known, and to the greatest part of whom, even the fame of your greatness and power has not reached ; but to those few Natives who are possessed of sufficient information to

understand the political situation of England, the English Newspapers and Books which are constantly brought to this country in great abundance, are equally intelligible with the periodical publications printed in Calcutta."........

"Whoever shall maliciously publish what has a tendency to bring the Govt. into hatred and contempt, or excite resistance to its orders, or weaken their authority, may be punished by Law as guilty of treason or sedition ; ...."

"Calcutta Journal" নামক পত্রিকার সম্পাদক "বাকিংহাম' ইংলণ্ডের শিল্পপতিদের আদর্শ laissezfaire বা অবাধ বাণিজ্যনীতির প্রচারক ও কোম্পনী শাসনের তীব্র সমালোচক ছিলেন। ফলে তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া কোম্পানীর পক্ষে জরুরী হয়ে পড়লো।" ফলে অস্থায়ী গভর্ণর জেনারেল জন অ্যাডামের সময় একটি বিশেষ ঘটনাকে উপলক্ষ করে Calcutta Journal এর সম্পাদককে শাস্তি দেওয়া হলো। নতুন আদেশও জারি করা হলো। 'অতঃপর কোনো ব্যক্তি কোন সংবাদ পত্র প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করিলে প্রধান সেক্রেটারীর স্বাক্ষরিত সকৌন্সিল গভর্ণর জেনারেলের অনুমতি গ্রহণ করিতে হইবে।" মনে রাখা দরকার যে—১৮১৩ খৃষ্টাব্দে কোম্পানীকে সনদ দেওয়ার সময় শিল্পপতি গোষ্ঠীর ভারতে অবাধ বাণিজ্যাধিকারের দাবী স্বীকৃত হয় এবং "১৮২৩ বরাবর তারা অনেক শক্তিমান হয়ে উঠেছে।" স্বভাবতই বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির কোনপক্ষই চায়নি বৃটিশ শাসক বর্গের ভারতীয় নীতির বা কাজের কোন প্রকার সমালোচনা হোক। স্বভাবতঃ সেদিকে লক্ষ্য রেখেই তারা বরাবরকার মত সংবাদ পত্রের ঢালাও অধিকার হরণ করতে বাধ্য হয়। সেই জন্যই ভারতের "মহান হিতৈষী" লর্ড বেন্টিংক সতীদাহ প্রথা রদের সময় যেমন প্রবল উৎসাহ দেখিয়েছিলেন সংবাদ পত্রের নিষেধাজ্ঞা তুলে নেবার সময় একেবারে পিছিয়ে গেলেন। বরং বৃটিশ শক্তি যতই ভারতে স্থায়ীত্ব লাভ করতে লাগলো ততই নতুন নতুন বিধি নিষেধ আরোপ করতে লাগলো। অদ্যাবধি ভারতে সংবাদ পত্রের উপর বহু বিধি নিষেধ চাপানো রয়েছে। যতদিন সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়ে না উঠবে ততদিন পুঁজিবাদীদের অনুকূলেই এই সব বিধি নিষেধ বজায় থাকবে। তার ব্যতিক্রম ঘটতে পারে না। একমাত্র শাসকশ্রেণীই সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ব্যবহার করে থাকে। রামমোহন শাসকবর্গের এ-সব অসুবিধার কথা জানতেন না তা নয় ; জানতেন। এবং জানতেন বলেই সতীদাহ প্রথা রদের জন্য জনমত গঠনের উপর যত জোর দিয়েছিলেন সংবাদপত্রের নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের জন্য জনমত গঠন করার উদ্যোগ গ্রহন করা দূরের কথা কতকগুলি অর্থহীন কথার অবতারণা করে নিজের পত্রিকার প্রকাশই বন্ধ করে দিয়ে পরোক্ষে সংবাদ পত্রের অধিকার সংকোচনের

আইনকেই মেনে নিতে উৎসাহী হয়ে উঠলেন। উল্লেখ্য যে সতীদাহ বা ধর্মীয় ব্যাপারে বহু প্রবন্ধ, রচনা গ্রন্থ, চিঠি-পত্র দেশে বিদেশে প্রচার করা হয়েছে কিন্তু সরকারী আইনের সমালোচনা করা বা সরকারী ব্যবস্থার বিরুদ্ধাচারণ দূরের কথা বিদেশে বা দেশে এ নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামাতে তাঁকে দেখা গেলো না। তাই সরকারী আইনের প্রতিবাদে পত্রিকা প্রকাশ বন্ধ করা হলো না। বন্ধ করা হলো যে মূল কারণে তা পরিষ্কার ভাবে উল্লিখিত হয়েছে তাঁর প্রথম আবেদন পত্রের চতুর্দ্দশ অনুচ্ছেদে ঃ

Those Natives who are in more favourable circumstances and of respectable character, have such an invincible prejudice against making a voluntary affidavit, or undergoing the solemnities of an oath that they will never think of establishing a publication which can only be supported by a series of oaths and affidavits abhorrent to their feeling and derogatory to their reputation amongst their Countrymen."

যদি এ সব বাধা না থাকতো অর্থাৎ এ কাজ গুলি যদি সহজেই করা সম্ভব হতো তাহলে তিনি পত্রিকা প্রকাশ বন্ধ করতেন কি না বলা শক্ত। রামমোহন নিজেই কারণ গুলির কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁর একটি পত্রিকার নাম 'মীরাৎ-উল-আখবার'। এই পত্রিকাটি বন্ধ করলে সেই প্রসঙ্গে যে-কথা লিখেছিলেন এখানে তা উল্লেখ করা হলো।

" 'মীরাৎ-উল-আখবার' শুক্রবার ৪ এপ্রিল ১৮২৩ (অতিরিক্ত সংখ্যা)"।

"পূর্ব্বেই জানান হইয়াছিল যে, মহামান্য গভর্ণর-জেনারেল ও তাঁহার কৌন্সিল দ্বারা একটি আইন ও নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, যাহার ফলে অতঃপর এই নগরে পুলিশ আপিসে স্বত্বাধিকারীর দ্বারা হলফ না করাইয়া ও গভর্ণমেন্টের প্রধান সেক্রেটারীর নিকট হইতে লাইসেন্স না লইয়া কোন দৈনিক সাপ্তাহিক বা সাময়িক পত্র প্রকাশ করা যাইবে না এবং ইহার পরেও পত্রিকা সম্বন্ধে অসন্তুষ্ট হইলে গবর্ণর জেনারেল এই লাইসেন্স প্রত্যাহার করিতে পারিবেন। ....এই অবস্থায় কতকগুলি বিশেষ বাধার জন্য, মনুষ্য সমাজে সর্ব্বাপেক্ষা নগণ্য হইলেও আমি অত্যন্ত অনিচ্ছা ও দুঃখের সহিত এই পত্রিকা ('মীরাৎ-উল-আখবার') প্রকাশ বন্ধ করিলাম।

বাধাগুলি এই ঃ—

প্রথমতঃ প্রধান সেক্রেটারীর সহিত যে-সকল ইউরোপীয় ভদ্রলোকের পরিচয় আছে তাহাদের পক্ষে যথারীতি লাইসেন্স গ্রহণ অতিশয় সহজ হইলেও আমার মত সামান্য ব্যক্তির পক্ষে দ্বারবান ও ভৃত্যদের মধ্য দিয়া এইরূপ উচ্চপদস্থ ব্যক্তির নিকট যাওয়া অত্যন্ত দুরূহ; আমার বিবেচনায় যাহা নিষ্প্রয়োজন সে কাজের জন্য নানা জাতীয় লোকে পরিপূর্ণ পুলিশ আদালতের দ্বার পার হওয়াও

কঠিন। কথা আছে,

.......ওহে মহাশয়, কোন অনুগ্রহের আশায় তাহাকে (সম্মান-লেখক) দারোয়ানের নিকট বিক্রয় করিও না।

দ্বিতীয়তঃ প্রকাশ্য আদালতে সম্ভ্রান্ত বিচারকদের সমক্ষে স্বেচ্ছায় হলফ করা সমাজে অত্যন্ত নীচ ও নিন্দার্হ বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে।

তাহাছাড়া সংবাদপত্র প্রকাশের জন্য এমন কোন বাধ্যবাধকতা নাই, যাহার জন্য কাল্পনিক স্বাত্বাধিকারী প্রমান করিবার মত বে-আইনী ও গর্হিত কাজ করিতে হইবে

তৃতীয়তঃ অনুগ্রহ প্রার্থনায় অখ্যাতি ও হলফ করিবার অসম্মান ভাজন হইবার পরও গবর্ণমেন্ট কর্তৃক লাইসেন্স প্রত্যাহৃত হইতে পারে, এই আশঙ্কার জন্য সেই ব্যক্তিকে লোক সমাজে অপদস্থ হইতে হইবে এবং এই ভয়ে তাহার মানসিক শান্তি বিনষ্ট হইবে। কারণ, মানুষ স্বভাবতঃই ভ্রমশীল; সত্যকথা বলিতে গিয়া তাহাকে হয়ত এরূপ ভাষা প্রয়োগ করিতে হইবে, যাহা গবর্ণমেন্টের নিকট অপ্রীতিকর হইতে পারে। সুতরাং আমি কিছু বলা অপেক্ষা মৌন অবলম্বন করাই শ্রেয় বিবেচনা করিলাম।.......

—হাফিজ! তুমি কোণঘেষাঁ ভিখারী মাত্র, চুপ করিয়া থাক। নিজ রাজনীতির নিগূঢ় তত্ত্ব রাজারাই জানেন।' " (রামমোহন রায়-ব্রজেন্দ্র নাথ বন্দোপাধ্যায়।)

"রামমোহন আর কোন পত্রিকা পরিচালন করেন নাই বটে, তবে মুদ্রাযন্ত্র বিষয়ক আইন বিদ্যমান থাকা কালেই মাস তিনেকের জন্য আর একখানি পত্রিকার অন্যতম স্বত্বাধিকারী হইয়াছিলেন, ইহা ৯মে ১৮২৯ তারিখে প্রকাশিত 'বেঙ্গল হেরাল্ড' "। (ঐ গ্রন্থ)

দেখা যায় এই পত্রিকাটি ইংরেজদের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে প্রকাশ করা হয় অর্থাৎ এই সংস্থাটি গড়ে উঠেছিল যৌথ উদ্যোগে। এর প্রধান মালিক ছিলেন আর, এম, মার্টিন। প্রধান সেক্রেটারীর (Chief Secretary) কাছে লেখা মার্টিনের একটি চিঠির অংশ উদ্ধৃত হলো।

"I have the honour to inform you for the information of Govt. that Rammohun Roy and Raj Kissen Sing have ceased to be proprietors of this newspaper, entitled the Bengal Herald, from the present date".—R. M. Martin, Principal Proprietor of the Bengal Herald, dated 30. 7. 1829 to G. Swinton, Chief Secretary to Govt. (ঐ গ্রন্থ)

এ থেকেও বোঝা যায় যে মুদ্রাযন্ত্র বিষয়ক আইনের প্রতিবাদে রামমোহন পত্রিকা বন্ধ করেন নি। রাজার আইন যখন তখন তা মাথা নিচু করেই মেনে নিয়েছিলেন। এবং দেখা গেলো তিনি Bengal Herald পত্রিকাও প্রকাশ

করলেন ইংরেজদের সঙ্গে যৌথ মালিকানায়। অথচ তিনি 'মিরাৎ-উল-আখবার' বন্ধ করার সময় অনেক কথাই বললেন এবং প্রতিজ্ঞা করলেন সরকারী অফিসের সামান্য লোক দারোয়ানের কাছে সম্মান খোয়াবেন না।

যদি সরকারী আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার মত মনোভাব দেখাতে ইচ্ছা করতেন তাহলে বলিষ্ঠ ভাবেই তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে পারতেন অথবা সরকারী আইন অমান্য করেই পত্রিকা প্রকাশ করতে পারতেন। তৎকালীন কোলকাতায় এমন লোকেরও সন্ধান পাওয়া যায়।

"The Bengal Gazette-এর সম্পাদক হিকি সকল রকম অন্যায় হস্তক্ষেপ ও ভীতি প্রদর্শনের বিরুদ্ধে সুদৃঢ় প্রতিবাদ জানিয়ে লিখেছিলেন 'Before he will bow, cringe or fawn to any of his oppressors, was the whole sale of his paper stopped, he would compose ballads and sell them through the streets of Calcutta as Homer did. He has now but three things to lose : his honour in the support of his paper—his liberty and his life ; two latter he will hazard in defence of the former, for he is determined to make it a scourge of all schemers and leading tyrants ; should these illegally deprive him of his liberty and confine him in a jail, he is determined to print there with every becoming spirit suited to his case and the deserts of his oppressors.' " (Echoes from old Calcutta by H. E. Busteed p 182-রামমোহন রচনাবলী ভূমিকা থেকে উদ্ধৃত)। আমরা দেখি ১৭৮২ খৃঃ বেঙ্গল গেজেটের সম্পাদক জেমস হিকি এবং ১৭৯৮ খৃঃ এশিয়াটিক মীরারের সম্পাদককে সরকারী শাস্তি গ্রহণ করতে। কেননা তাঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন (যে কোন কারনেই হোক) ভারতীয়দের প্রতি সংকারের নিপীড়ন মূলক আচরনের সমালোচক। হিকি ১৭৮০ খৃঃ ভারতের প্রথম সংবাদ পত্র "Bengal Gezette" কোলকাতা থেকে প্রকাশ করেন। শ্রদ্ধেয় সুধীর কুমার মিত্র মহাশয় তাঁর হুগলি জেলার ইতিহাস ও বঙ্গসমাজ গ্রন্থে লিখেছেন, "তিনি সাধারণ শ্রেণীর লোক হইলেও নির্ভীক ভাবে প্রত্যেকের বিরুদ্ধে লেখনি ধারণ করিতেন। তিনি লবণ ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধেও দরিদ্র প্রজাদের হইয়া লিখিতে কখনও কুণ্ঠিত হইতেন না। উক্ত কাগজের প্রথম পৃষ্ঠায় লেখা থাকিত 'A weekly Political and Commercial Paper Open to All Parties But Influence by none.' " (হুগলী জেলার ইতিহাস ও বঙ্গসমাজ ১ম খণ্ড ১৩৪ পৃঃ)। তিনি একসময় তাঁর কাগজে লিখেছিলেন, "যে অপরাধ করায় মহারাজা নন্দ কুমারের ফাঁসি হইয়াছিল, সেই একই অপরাধ করা সত্ত্বেও ক্লাইভ ইংলণ্ডে লর্ড উপাধি প্রাপ্ত হইলেন (ঐ গ্রন্থ)।" শ্রদ্ধেয় মিত্র মহাশয় আরও লিখেছেন

"ই, ই, কোম্পানীর গভর্নর হইতে আরম্ভ করিয়া কাউন্সিলের প্রত্যেক সভ্যকে আক্রমণ ও তাহাদের কার্য্যাদি সমালোচনা করিবার জন্য হেষ্টিংস হিকি সাহেবকে ছাড়িলেন না। তিনি তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিলেন। কলিকাতার জেলের মধ্যেই সত্য নিষ্ঠ হিকি সাহেব পরলোক গমন করেন। ১৭৮২ খৃঃ তাঁহার কাগজ বন্ধ হইয়া যায়। হিকির প্রতি হেষ্টিংসের নিগ্রহের কারণ সম্বন্ধে 'ওরিজিনাল এনকোয়ারী' নামক গ্রন্থে যাহা আছে তাহার কয়েকছত্র উদ্ধার যোগ্য: "It can not be doubted that the Files of Hickey's Bengal Gezette must throw singular light on the nature of the contentions which then agitated the public mind and the character of the man who then held the highest stations; not without access to such can a just view of that period ever be obtained."

"এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই যে হিকির বেঙ্গল গেজেটের কাগজপত্র সেই সময় সাধারণের মনের গতি প্রকৃতির উপর এবং যিনি সর্ব্বোচ্চ পদ সকল অধিকার করিয়াছিলেন তাহার চরিত্রের উপর আলোকপাত করিয়াছিল। এই সকলের পাঠ ব্যতিরেকে সেই সময়েব সম্বন্ধে প্রকৃষ্ট ধারণা করা যাইতে পারে না।" (হুগলি জেলার ইতিহাস ও বঙ্গসমাজ, ১ম খণ্ড, ১৩৫ পৃঃ থেকে উদ্ধৃত)।

শ্রদ্ধেয় সুরজিত দাশগুপ্ত মহাশয় লিখেছেন, "১৭৯৮ খৃঃ এশিয়াটিক মীরারে মন্তব্য করা হয় যে, এদেশে ইউরোপীয়দের সংখ্যা এত সামান্য যে শুধু ঢিল ছুড়েই ভারতীয়রা তাদের হত্যা করতে পারে। এই মন্তব্যকে তৎকালীন গভর্ণর জেনারেল লর্ড ওয়েলেসলী ইউরোপীয়দের বিরুদ্ধে সশস্ত্র উত্থানের জন্য ভারতীয়দের প্রতি প্ররোচনা বলে গণ্য করলেন। তাই তিনি কতকগুলি সরকারী নিয়ন্ত্রণ আরোপ করেন সংবাদপত্রগুলির ওপরে। তখন পর্যন্ত সংবাদপত্রগুলি ছিলো ইউরোপীয়দের।" কোম্পানীর কর্মচারীদের কাজের সমালোচনা করায় বাকিংহামকেও চলে যেতে হলো এ দেশ ছেড়ে। তাছাড়া ছিল কিছু দেশীয় সংবাদপত্র আর, "সেই সমস্ত সংবাদপত্রের মাধ্যমে জনগণের স্বাধীকার চেতনার আলোচনা তাদের আশঙ্কার কারণ ছিল"— এথেকে বোঝা যায় কোলকাতায় একটি ইংরাজ বিরোধী শক্তি ছিল। অনুমান তাদের মুখ বন্ধ করাই ছিল আইন জারী করার মুখ্য কারণ। স্বাভাবিক ভাবেই বিরুদ্ধ সমালোচনার সুযোগ থাকার কথা নয়। সেটা আশা করা আকাশ কুসুম স্বপ্ন দেখার মত। আর রামমোহন মহাশয়দের পক্ষে সরকারের বিরুদ্ধে সমালোচনা করার কোনো প্রশ্নই ছিলো না। এমন কি 'King in Council'-এর কাছে প্রেরিত আবেদন পত্রেই ঘোষণা করেছিলেন যে ঐ জাতীয় পত্রের সঙ্গে তাদের আদৌ কোনো সম্পর্ক নেই। সরকারের কেউ

বিরুদ্ধ সমালোচনা করুক, সরকারের বিরুদ্ধে ঘৃণার সৃষ্টি হোক বা সরকারী নীতির বিরুদ্ধে কেউ বিরুদ্ধাচরণ করুক আদৌ তাঁরা তা চাননি। শুধু তাই নয় ঐ পত্রগুলির বিরুদ্ধে সরকার যে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করলো তার প্রতিবাদ করা দূরের কথা বরং সেই শাস্তিমূলক ব্যবস্থার প্রতি তাঁদের যে পূর্ণ সমর্থন ছিলো তা তাঁরা পরোক্ষে পরিষ্কার ভাবেই জানালেন। তাই আবেদন পত্রের ৪২ তম অনুচ্ছেদে লেখা হলো, "If as your Majesty's faithful Subjects have been informed, this Government were dissatisfied with the conduct of the English News-Paper, called the " Calcutta journal ", the banishment of the Editor of that paper, and the power of punishing those left by him to manage his concern, should they also give offence, might have satisfied the Government ; but at any rate your Majesty's faithful subjects, who are natives of this country, against whom there is not the shadow of a charge, are at a loss to understand the nature of that justice which punishes them, for the fault imputed to others. yet notwithstanding what the local authorities of this country have done, your faithful subjects feel confident, that your Majesty will not suffer to be believed throughout your Indian territories, that it is British justice to punish millions for the fault imputed to one individual."

অবশ্য একথা মনে করার কোনো কারণ নেই যে রামমোহন সংবাদ পত্র সংক্রান্ত নিয়ম কানুনের বিলুপ্তি চান নি। কিন্তু তিনি যা চাননি সে হলো ইংরাজ শাসনের বিরুদ্ধে কোন প্রকার সমালোচনা। তিনি চেয়েছিলেন সেই শাসনকে সুদৃঢ় করে তোলার জন্য সংবাদ পত্র প্রকাশের সুযোগ সুবিধা। আমরা আগেই দেখেছি যে এশিয়াটিক মীরারের সম্পাদককে কি কারণে শাস্তি দেওয়া হলো। সরকারের বিরুদ্ধে ভারতীয় জনগণের সশস্ত্র উত্থানই ছিলো তাদের একমাত্র ভয়ের কারণ। বলাই বাহুল্য সারা দেশ জুড়ে চলছিল ইংরাজ শাসনের বিরুদ্ধে জনগণের সশস্ত্র সংগ্রাম। আন্দোলন যতই তীব্র হচ্ছিল ততই ইংরাজরা আরো ভীত হয়ে পড়ছিল। প্রথম মুক্তিযুদ্ধ (১৭৬৩-১৮০০) সবেমাত্র শেষ হয়েছে কয়েকবছর আগে, আবার ১৮২০ সালে ওয়াহবী বিদ্রোহের নেতা এসেছিলেন কলিকাতায়। বিভিন্ন জেলা থেকে হাজার হাজার মানুষ এসেছিল তাঁর কথা শুনতে। স্বভাবত সরকারের ভুল হয়নি সারা দেশ জুড়ে ওয়াহবী বিদ্রোহেরও সম্ভাবনা উপলব্ধি করতে। যদিও ধর্মের নাম নিয়ে লড়াইএর প্রস্তুতি চলছিল, তবু ইংরেজরা উপলব্ধি করতে ভুল করেনি

যে "ধর্মের মুখোস" পরা হলেও এ লড়াই-এর প্রস্তুতি তাদেরই বিরুদ্ধে। দেশীয় দালাল বুর্জোয়া এবং জমিদার শ্রেণীরও না বুঝবার কারণ ছিল না। স্বভাবত সংবাদ পত্রগুলির সামান্য সমালোচনা ইংরাজ বিরোধী সংগ্রামগুলিকে তীব্র করে তোলার কারণ হয়ে উঠতে পারে। খুব সঙ্গত কারণেই ইংরাজরা এ আশংকা করেছিল। আর রামমোহন চেয়েছিলেন সেই আশংকা থেকে মুক্ত করার জন্য সংবাদ পত্রকে ব্যবহার করতে। তাই তারা 'King in Council' কে লেখা আবেদন পত্রের ৩১ তম অনুচ্ছেদে লিখেছিলেন,

"....,your Majesty is well aware, that a Free Press has never yet caused a revolution in any part of the world, because, while men can easily represent the grievances arising from the conduct of the locel authorities to the supreme Government, and thus get them redressed, the grounds of discontent that excite revolution are removed; whereas, where no freedom of the Press existed,and grievances consequently remained unrepresented and unredressed, innumerable revolutions have taken place in all parts of the globe, or if prevented by the armed force of the Government, the people continued ready for insurrection"—

এ থেকে খুবই স্পষ্ট যে রামমোহনের সংবাদ পত্র প্রকাশের অন্যতম একটি উদ্দেশ্য ছিল—এ বিপ্লবগুলিকেই অঙ্কুরে বিনাশ করা। বিপ্লব দমনে, শান্তি শৃংখলা স্থাপনে ভালো আইন কানুন প্রণয়নের ব্যাপারে সংবাদ পত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে • রামমোহন এই কথাটাই বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন। রামমোহনের এইসব যুক্তি সম্পর্কে শ্রদ্ধেয় বিমান বিহারী মজুমদার মহাশয় বলেছেন।

"....The People would be able to ventilate their grievances. through the press and try to have them redressed. If grievances remained unrepresented and unredressed they might cause revolution. But the Free Press would obviate such a danger "

তিনি আরও লিখছেন, "The Second method Suggested by the Raja for good laws for India was the appointment of commission of inquiry from time to time. Thus writes the Raja 'your Majesty's faithful subjects are aware of no means by which impertial information on this subjects (i. e. the ascertaining of the real value of the system introduced in India)

can be obtained by the court of Directors or other authorities in England except in one of the following methods ; either first by the existing of Free Press in this country and establishments of news papers in different districts under the special patronage of the Court of Directors and subject to the control of the law only or Secondly by appointment of a commission composed of gentlemen of intelligence and respectibility totally unconnected with the governing body in this country which may from time to time investigate on the spot ... ...' of these two methods the Raja preferred Free Press to the commission as the later would entail great labour and expenses and as 'the publication of the truth and the natural expression of men's sentiments through medium of press entail no burden on the State.' ... ."

কাজেই স্বাধীনতা শব্দ থাকায় বিভ্রান্তিরই সৃষ্টি হয়। প্রকৃত পক্ষে দেখতে হবে কোন উদ্দেশ্যে সেই স্বাধীনতা ব্যবহৃত হচ্ছে। তিনি শুধুমাত্র তার একটি প্রস্তাব সরকারের কছে উত্থাপন করেছেন। পার্লামেন্টের উপদেষ্টা মন্ডলীই সে-কাজ করে থাকেন সরকারী শাসন যাতে সুষ্ঠুভাবে চলে। এবং এই প্রস্তাব হলো ব্রিটিশ স্বার্থরক্ষার স্বার্থে কত ভালোভাবে সংবাদ পত্রকে ব্যবহার করা সম্ভব। এর বেশী তিনি কিছুই চান নি। সুতরাং রামমোহন রায় জাতির স্বার্থে সংবাদ পত্রের স্বাধীনতার জন্য সিংহের মতো লড়াই করেছিলেন বলে যাঁরা আজও প্রচার করে থাকেন—তাঁদের উদ্দেশ্য বুঝতে অসুবিধা হয় না। যারা মনে করে থাকেন বৃটিশ শাসন কায়েম হলে দেশের মঙ্গল হবে তাদের সম্পর্কে মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু সংগ্রামী জনগণ যাঁদের শতকরা নিরানব্বই ভাগ মানুষ অর্ধশিক্ষিত, ক্ষুধার্ত তাঁদের কাছে শুধুমাত্র শত্রুপক্ষের অনুকূলে সংবাদ পত্রের স্বাধীনতা থাকা বিপজ্জনক।

ইংরাজী শিক্ষা সম্পর্কে

এদেশে ইংরাজী শিক্ষার প্রবর্ত্তক হিসাবে রামমোহনকে অনেকেই ভারতবর্ষের শিক্ষা জগতের জনক বলে তাঁর প্রতি পরম শ্রদ্ধা প্রকাশ করে থাকেন। বিনে বিদেশী ভাষা শিক্ষা বা বিদেশের জ্ঞান বিজ্ঞান আহরণ করে নিজেদের জ্ঞান

বিজ্ঞান-জগতকে পরিপুষ্ট করে তোলাকে কোনমতেই খাটো করে দেখা উচিত নয়। একটি স্বাধীন দেশ আর একটি পরাধীন দেশের যা কিছু ভালো যা কিছু উচ্চ শিক্ষা সভ্যতা, সংস্কৃতির বাহন—তার প্রতি যত্নবান হবে তাতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নাই; বরং তাতে উৎসাহ দেওয়াই হবে কোন বিচক্ষণ ব্যক্তির পবিত্র কর্ত্তব্য। কিন্তু প্রতিটি জ্ঞানী ব্যক্তির প্রথম এবং প্রধান কর্ত্তব্য হবে—বিচার করে দেখা কোন্ মহৎ উদ্দেশ্য নিহিত আছে এই কাজের মূলে। যদি দেখা যায়—সেই কাজের মূলে কোন মহৎ উদ্দেশ্যের পরিবর্ত্তে আছে হীন উদ্দেশ্য তাহলে তা একমাত্র আহাম্মক অথবা ওই হীন উদ্দেশ্যের সমর্থক ছাড়া কেউই সেই হীন উদ্দেশ্য সাফল্য মন্ডিত করার কাজে সহযোগিতা করতে এগিয়ে আসবে না। প্রাথমিক কর্ত্তব্য হবে তার সেই হীন উদ্দেশ্যকে ব্যর্থতায় পর্যবসিত করা। আরো মনে রাখতে হবে ইংরাজী ভাষা না শিখেই, ইংলন্ডের নিকটতম প্রতিবেশী দেশ ফ্রান্স ও জার্মান, রাশিয়া, এশিয়ার জাপান, জ্ঞানে বিজ্ঞানে উন্নতির উচ্চতম শিখরে উত্তীর্ণ হয়েছে। একটি হীন উদ্দেশ্যকে সফল করার জনাই ওই কাজটি স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা গোষ্ঠী বা শ্রেণীর জন্য অপরিহার্য্য প্রয়োজন। সেই কাজ যেমন ওই স্বার্থ সংশ্লিষ্ট শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষা করে তেমনি অন্যের স্বার্থ বিপন্ন করে। স্বভাবত বিচার করে দেখতে হবে—ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্ত্তনের আসল উদ্দেশ্য। বিচার করে দেখতে হবে আরো এই কারণে যে, একটি উপনিবেশিক শক্তি হলো ইংরাজী শিক্ষার উৎসাহদাতা যারা নিজের দেশে ভূমিদাসত্ব থেকে কৃষকদের কুটির শিল্প থেকে কারিগর শ্রেণীকে মুক্তির কথা বলে, কিন্তু উপনিবেশে এলে কোটি কোটি কৃষককে জমিদারদের ভূমির সঙ্গে বেঁধে রেখে "ভূমিদাসে" পরিণত করে, শুধু তাই নয় হাজার হাজার কারিগর এবং ব্যবসায়ী বুর্জোয়াদের জীবিকাচ্যুত করে জমি চষতে বাধ্য করার জন্য একধরণের সার্ফে পরিণত করতে কুণ্ঠিত হয় না, যারা নিজের দেশে মানবতার বা মানুষের মুক্তির কথা বলে আর উপনিবেশে এলে একটি বিরাট ভূখন্ডের কোটি কোটি মানুষকে টুঁটি টিপে ধরে "মদ্য" পান করায়, "আফিম" খেতে বাধ্য করে—তারা উপনিবেশের মানুষকে জ্ঞানে বিজ্ঞানে উন্নত করে তুলবে—একথা আমাদের কি বিশ্বাস করতে হবে? ইংরাজদের আসল উদ্দেশ্য সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করবো।

ইংরাজরা এদেশ দখল করে ভারতবর্ষকে ইউরোপিয় সভ্যতার আলোকে সুশিক্ষিত করে তোলার মহান মানবিক দায়িত্ব পালনের জন্য অবশ্যই নয়; বরঞ্চ নিছকই তাদের ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীক স্বার্থকে রক্ষা করা ও বিস্তার, লুন্ঠনের নতুন ক্ষেত্র সৃষ্টি করার মরিয়া তাগিদে। আর এই নীচ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করার জন্য এদেশে তাদের শাসন ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করার একান্ত প্রয়োজনীয়তাও তারা বোধ করে—তা বলাই বাহুল্য। পদানত দেশে নিজেদের আধিপত্য সুরক্ষিত করার জন্য উপনিবেশিক শক্তিগুলো চিরকাল নিজেদের সাংস্কৃতিক প্রভাবকে একটা শক্তিশালী

হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করে এসেছে। তাদের এই সাংস্কৃতিক প্রভাব পরাধীন দেশে সৃষ্টি করে এক পদলেহী বুদ্ধিজীবি শ্রেণী যারা তার সামগ্রিক উপনিবেশিক স্বার্থকে এদেশে সুরক্ষিত করাকেই নিজেদের পবিত্র কর্ত্তব্য বলে বিবেচনা করে। বিদেশী শাসনকে সুদৃঢ় করার ক্ষেত্রে দেশে দেশে এরাই প্রধান স্তম্ভ হিসাবে কাজ করে এসেছে। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই ইংরাজরা এদেশে ইংরাজী শিক্ষা এবং তার মধ্য দিয়ে তাদের সংস্কৃতি এদেশে চালু করে দেবার জন্য সচেষ্ট হয়। লর্ড মেকলে এই উদ্দেশ্যকে খুব পরিষ্কার ভাবে ব্যাখ্যা করেই বলেছিলেনঃ

"আমাদের এখন যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হবে এমন একটি শ্রেণী সৃষ্টি করতে যারা হবে আমাদের এবং আমরা যে লক্ষ লক্ষ লোককে শাসন করছি সেই শাসিতদের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান কারী। এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিরা হবে রক্তে ও রঙে ভারতীয় এবং রুচিতে, মতে, নীতিতে ও বুদ্ধিতে ইংরেজ।" অর্থাৎ একটা মুৎসুদ্দি বুদ্ধিজীবি শ্রেণী সৃষ্টি করা যারা ইংরাজ শাসনকে ভারতবর্ষে জনপ্রিয় করে তুলবে এবং ইংরাজদের শাসন ব্যবস্থা পরিচালনার কাজে অংশ নিয়ে তাকে এদেশের মাটিতে সুদৃঢ় করে তুলবে। পূর্ব্বেই তা উল্লেখ করা হয়েছে। আমরা একথা জোরের সঙ্গে বলতে পারি রামমোহনের মতো ব্যক্তিদের সক্রিয় উদ্যোগ ও সহযোগীতায় যে-শিক্ষা ব্যবস্থা ইংরাজী শিক্ষা প্রসারের জন্য গড়ে তোলা হয়েছিলো তার প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল ইংরাজদের একান্ত অনুগত পদলেহী ক্রীতদাস সৃষ্টি করা। তৎকালীন সময়ে ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত নব্য যুব সম্প্রদায় ইংরেজদের অন্ধ অনুকরণ সর্ব্বস্বতার এক ন্যক্কার জনক নজীর তৈরী করেছিলো। তারা ছিল ইংরেজদের বিশ্বস্ত ও দক্ষ ক্রীতদাস। ইংরেজদের ও ইংরাজী সংস্কৃতির ভজনা করতে করতে তারা যে শুধু শ্রম বিমুখই হয়ে উঠেছিল তাই নয়, সাথে সাথে শিখেছিল যা কিছু দেশীয় তাকে ঘৃণা করতে, শিখেছিল নিজের দেশের শ্রমজীবি মানুষকে, দেশীয় ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি সবকিছুকে অবজ্ঞা করতে এবং আদর্শহীন স্থূল জীবনে বিশ্বাসী একধরণের বিকৃত জীবন যাপনে হয়ে উঠেছিল অভ্যস্ত। যদিও ইংরাজী শিক্ষার বিস্তার সীমাবদ্ধ ছিল কেবলমাত্র শহরাঞ্চলে তবুও এরই অনিবার্য ফল হিসাবে অবহেলিত হলো দেশীয় শিক্ষা, ব্যাহত হলো দেশীয় ভাষার বিকাশ, অবহেলিত হলো দেশীয় সংস্কৃতি। রামমোহনের উদ্যোগে প্রবর্তিত সেই ক্রীতদাস সৃষ্টিকারী ব্যবস্থাটা আজও চালু রাখা হয়েছে শাসক শ্রেণীর স্বার্থে। আর আজও তার জের টানতে হচ্ছে সারা দেশকে। আজও আমাদের দেশের ভাষা সমূহ ও জনগণের সংস্কৃতি সুষ্ঠু ও স্বাধীনভাবে বিকাশ লাভ করার শক্তি অর্জন করে উঠতে পারেনি।

রামমোহন ও তাঁর প্রবর্ত্তিত ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত নব্য যুবকরাই সেই তথাকথিত "নতুন যুগের" ধারক বাহক যাকে বুর্জোয়া পান্ডিতরা "রেঁনেশা" বা "নব জাগরণ" হিসাবে চিহ্নিত করে এবং একে ইউরোপীয় "রেঁনেশার" সাথে

একাসনে বসাবার দুঃসাহস দেখিয়ে থাকেন। এর মধ্যেও যা কিছু বিদেশী তাকেই অন্ধভাবে অনুকরণ করার লজ্জাজনক প্রবনতারই সুস্পষ্ট প্রকাশ ঘটেছে। কারণ ইংলন্ড তথা ইউরোপের রেনেশা এবং উনিশ শতকের বাংলাদেশের তথাকথিত "নবজাগরণ" গুণগত ভাবেই দুটি বিপরীত চরিত্রের ঘটনা।

ইংলন্ড তথা ইউরোপের "রেনেশা" ছিল 'সামন্ত প্রথার বিরুদ্ধে ব্যবসায়ী বুর্জোয়া শ্রেণীর নেতৃত্বে পরিচালিত বৈপ্লবিক আন্দোলন। পঞ্চদশ শতাব্দির প্রথম (১৪৩২ খৃঃ) হইতে ষষ্ঠদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত সমগ্র ইউরোপ জুড়িয়া যে-যুগান্তকারী বৈপ্লবিক আন্দোলন চলিয়াছিল তার অনিবার্য্য পরিণতি স্বরূপ য়ুরোপের সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার ভিত্তি ধ্বসিয়া পড়িয়াছিল। প্রতিক্রিয়াশীল ও ধ্বংসোন্মুখ সামন্ত প্রথার বিরুদ্ধে তৎকালের প্রগতিশীল ধনতন্ত্রের চূড়ান্ত জয় ঘোষিত হয়েছিল।' এই রেনেশা গড়ে উঠেছিলো নবোদ্ভূত বুর্জোয়া শ্রেণীর নেতৃত্বে ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার ঐতিহাসিক প্রয়োজনে নতুন বুর্জোয়া আর্দশের ভিত্তিতে। এই নতুন আদর্শ হলো বুর্জোয়া মানবতাবাদের আদর্শ, স্বাধীনতার আদর্শ, পুরাতন অবক্ষয়ী ব্যবস্থার বাঁধন ভেঙ্গে এগিয়ে যাবার আদর্শ—এহলো সামন্ততান্ত্রিক জীবনাদর্শের সম্পূর্ণ বিপরীত। এই বৈপ্লবিক আন্দোলন সমগ্র ইংলন্ড তথা ইউরোপের জনগণকে এই নতুন আদর্শে দীক্ষিত করে ছিল এর মহান উদ্দেশ্য পূরণের কাজে তাদের সক্রিয় শরিক করে তুলেছিল। অর্থাৎ সামগ্রিকভাবে এক নতুন সমাজ চেতনার জন্ম দিয়েছিল।

"ইহাই হইল ইংলন্ডের রেনেশা, তাহার ভিত্তি হইল সামন্ততন্ত্রের ভগ্নদুর্গের উপর ধনতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা আর জাতীয় স্বাধীনতার বনিয়াদে জাতীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা।' সামন্তপ্রভু রাজার শাসনের পরিবর্তে সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ইংলন্ড তথা ইউরোপের দেশে দেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা। আর এই নবজাগৃতির আন্দোলনের মধ্য দিয়েই ইউরোপের দেশে দেশে বিকাশ লাভ করেছিল জাতীয় ভাষা—ইংলন্ডের ক্ষেত্রে ইংরাজী ভাষা।

এরই বিপরীতে উনিশ শতকের বাংলাদেশে যে পরিবর্ত্তনের ঢেউ এসেছিলো তা কোনো অবস্থাতেই বৈপ্লবিক চরিত্রের ছিল না এবং হওয়া সম্ভবও ছিল না। কারণ এই আন্দোলনের নেতৃত্ব কোনো নবোদ্ভূত স্বাধীন বুর্জোয়া শ্রেণীর হাতে ছিল না। সামন্ততন্ত্রকে উচ্ছেদ করে জাতীয় পুঁজিবাদ বিকাশের ও পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলার মতো কোনো ফসলই এর থেকে উঠে আসেনি। এ ছিল নেহাতই এক সংস্কার মূলক আন্দোলন যা গড়ে উঠেছিল বিদেশী শাসকবর্গের প্রত্যক্ষ উদ্যোগে। এর নেতৃত্ব ছিল দালাল ব্যবসায়ী বুর্জোয়া ও দালাল বুদ্ধিজীবি শ্রেণীর হাতে যারা বিদেশী শাসনকে জনপ্রিয় ও সুদৃঢ় করে তোলাই নিজেদের পবিত্র কর্ত্তব্য বলে জ্ঞান করতো। ফলে এ আন্দোলন ছিল সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এবং তারই পরিবেশ সৃষ্টির

উদ্দেশ্যেই পরিচালিত এ আন্দোলনের ক্ষেত্র ছিল খুবই সীমিত কেবলমাত্র শহরাঞ্চলে—তাও শহরের অভিজাত ও শিক্ষিত সমাজের মধ্যেই সীমিত—এর প্রভাব কোনো বৈপ্লবিক আলোড়নই সৃষ্টি করতে পারেনি। তাছাড়া গ্রামাঞ্চলে নিম্নস্তরের জনসমাজের মধ্যে কোনো আকাঙ্খিত প্রতিফলনই ঘটেনি। আজও সারা দেশের গ্রামাঞ্চলে এর কোনো ছাপই খুঁজে পাওয়া যাবে না। সর্বোপরি ইংল্যান্ড তথা ইউরোপের রেনেশাঁ জাতীয় স্বাধীনতার পতাকা তুলে ধরেছিল। বিপরীতে উনিশশতকের বাংলাদেশের এই ধর্মীয় আন্দোলনের পতাকা ছিল জাতীয় পরাধীনতা ও জাতীয় আত্মসমর্পনের পতাকা। রামমোহনকে এই তথাকথিত নবজাগরণের পথিকৃত বলা হয়ে থাকে। রামমোহনের সামগ্রিক কার্যকলাপ এ কথা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে যে এই জাতীয় আত্মসমর্পন ও জাতীয় পরাধীনতার পতাকাবাহী দেশীয় দালাল বুর্জোয়া এবং জমিদার শ্রেণীর পুরোধা ছিলেন রামমোহন।

এই তথাকথিত নবজাগরণের অন্যান্য ধারক ও বাহকরাও বিদেশী শাসক বর্গকে সেবা করেছেন ও বিদেশী শাসন বিরোধী সমস্ত সংগ্রামকেই খুবই নিষ্ঠার সঙ্গে বিরোধীতা করেছেন। তাই "নীলদর্পণের" লেখক দীনবন্ধু মিত্র মহাশয় নিজের মুখোশ নিজের হাতেই খুলে ফেললেন কৃষ্ণনগরের এক জনসভায়। তাঁকে বলতে শোনা গেল ঃ

"আর দিকে দিকে রাগান্ধ ইংরাজদিগের মস্তকে খন্ড খন্ড করিয়া (হরিশ্চন্দ্র) কাটিতে লাগিলেন। এবং যে সদুপায় দ্বারা রাজদ্রোহিতা একেবারে নিরাকৃত হইবে এবং ইংরাজ রাজ্য ভারতবর্ষে সগৌরবে চিরস্থায়ী হইবে তাহার প্রস্তাব করিলেন। মহাত্মা লর্ড ক্যানিং সাহেবের জন্য এবং আমাদের হরিশের জন্য আমরা অন্যায় অপমৃত্যু হইতে রক্ষিত হইয়াছি।" (যুগন্ধর মধুসূদন—৪১পৃঃ)

এইভাবেই ১৮৫৭ সালের প্রথম জাতীয় স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় 'নব্য বঙ্গের' "নব্য তরুণদের" মুখোস একেবারে খসে পড়লো। তাদের বিপ্লবীয়ানা যে কেবলমাত্র "মৌখিক বাগাড়ম্বর" ছাড়া কিছুই ছিল না তা তাঁদের বক্তৃতাগলির মধ্যে নিহিত। British Indian Association-এ দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় প্রথম স্বাধীনতা-যুদ্ধের বীর যোদ্ধাদের সম্পর্কে এমন বক্তৃতা দিতে সুরু করলেন মনে হবে তিনি যেন ইংরাজ সাহেবদের পায়ের তলায় হুমড়ি খেয়ে পড়লেন এবং ইংরাজরা আদেশ দিলে তিনি নিজেই গোটা দেশের ইংরাজ বিরোধীদের মাথা কেটে ফেলতে পারেন। তিনি কন্ঠস্বর সাধ্যমত উচ্চ পর্যায়ে তুলে বলেছিলেন ঃ

Misguided wretches who have taken a part in this rebellian and thereby disgraced their manhood by drawing arms against the very dynesty whose salt they have eaten, to whose paternal rule they and their ancestors have for the

last hundred years owed the security of their lives and properties and which is the best ruling power that we have had the good fortune to have within the last ten centuries." (ঐ গ্রন্থ)।

অনুরূপ ভাবে সাঁওতাল বিদ্রোহের সময় কোলকাতার দুটো পত্রিকায় কুৎসিত ভাষায় বিদ্রোহীদের গালাগালি দিতে কুন্ঠিত হয়নি।

তাতে লেখা হয়েছিল : "এই অসভ্য কুৎসিত কালো ভূতগুলির মনে মৃত্যু ভয় জাগাইয়া তোলা ব্যতিত এই বিদ্রোহ দমনের কোনো উপায় নাই" ইত্যাদি। যতদূর সম্ভব এই পত্রিকা দুটির পৃষ্ঠপোষণায় ছিল খোদ এংলো ইন্ডিয়ান ব্যক্তিরা।

সংক্ষেপে এই হলো রামমোহন প্রবর্ত্তিত ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত সমাজ ও তাদের তথাকথিত "নব-জাগরণের" বা "রেনেশার" প্রকৃত চেহারা যা স্বাধীনতাকামী প্রতিটি ভারতবাসীর ক্রোধ এবং ঘৃণার উদ্রেক না করে পারেনা।

ভারতের রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িকতা

পূর্বোল্লিখিত আবেদন পত্র দুটিতে কয়েকটি অংশে এমন এক বক্তব্য উপস্থিত করা হয়েছে—যার একটি বিশেষ অশুভ দিকও সুস্পষ্টভাবে চোখে পড়ে। রাজনীতি সচেতন ব্যক্তি মাত্রই একটু লক্ষ্য করলে বুঝতে পারবেন যে—ভারতের মত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের একটি দেশে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টির যথেষ্ট উপাদান নিহিত আছে ওই বক্তব্যের মধ্যে এবং তার কুফল যে সুদূর প্রসারী তা বলাই বাহুল্য। সকলের অবগতির জন্য ওই অংশগুলি এখানে লিপিবদ্ধ করা হলো। King-in-Council এর কাছে লেখা আবেদন পত্রের তৃতীয় অনুচ্ছেদের প্রথম অংশ :

"The Greater part of Hindustan having been for several centuries subject to Muhammadan Rule, the civil and religious rights of its original inhabitants were constantly trampled upon, and from the habitual opperssion of the Conquerors, a great body of their subjects in the Southern Peninsula (Dukhin) afterwards called Marhattahs and another body in the Western Parts now styled Sikhs were at last

driven to revolt ; and when the Mussalman power became feeble, they ultimately succeeded in establishing their independence ; but the Natives af Bengal wanting vigor of body and adverse to active exertion remained during the whole period of the Muhammedan conquest, faithfull to the existing Govt. although their property was often plundered, their religion insulted and their blood wantonly shed. Devine Providence at last, in its abundant mercy, stirred up the English nation to break the yoke of those tyrants and to receive the opperssed Natives of Bengal under its protection".

ঐ আবেদন পত্রের ৪৩ তম অনুচ্ছেদের শেষের দিকের একটি অংশ নিম্নরূপ :

"Although under the British Rule the natives of India have entirly lost this political conseguence, your Majesty's faithful subjects were consoled by the more secure enjoyments of those civil and religious rights which had been so often violated by the rapacity and intolerance of the Mussalmans ; . " এখানে লক্ষ্য করার বিষয় যে Natives বা 'Original inhabitants' বলতে শুধুমাত্র হিন্দু সম্প্রদায়কেই বোঝানো হয়েছে।

সুপ্রীমকোর্টের নিকট লেখা আবেদন পত্রের তৃতীয় অনুচ্ছেদের একটি অংশে বলা হয়েছে : Your Lordship is well aware—that the Natives of Calcutta and its vicinity have voluntarily entrusted Govt. wlth millions of their wealth reposing in the Sanguine hope that their property being so secured, their interests will be as permanent as the British power itself, while on contrary, their fathers were invariably compelled to conceal their treasures in the bowels of the earth in order to preserve them from the insatiable rapacity of their oppressive Rulers."

উপরোক্ত অংশ গুলির বক্তব্য খুবই পরিষ্কার। দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলা হয়েছে কয়েক শতাব্দি ধরে মুসলমানী শাসন চলেছে এদেশে। আর ঐ শাসনে হিন্দুদের ধর্মাচরণের, সম্পত্তি রক্ষার এবং নাগরিক অধিকার বরাবর পদদলিত করা হয়েছে। অত্যাচারী মুসলমানদের লুন্ঠনের ভয়ে পূর্ব্বপুরুষদের ধন দৌলত মাটির নীচে লুকিয়ে রাখতে হতো। বাঙ্গালী হিন্দুদের ধন সম্পদ লুন্ঠিত হয়েছে—তাদের ধর্ম লাঞ্ছিত হয়েছে, যথেচ্ছভাবে তাদের রক্ত ঝরেছে কিন্তু দৈহিক শক্তি আর সক্রীয় উদ্যোগের অভাবে বাঙালী হিন্দুরা বাধ্য হয় সমগ্র মুসলমানী শাসনকাল জুড়ে মুসলমান শাসকদের প্রতি অনুগত থাকতে।

এ-ধরণের বক্তব্য সাম্প্রদায়িক বক্তব্যেরই রূপ গ্রহন করেছে বললে ভুল হবে না। এই ধরণের বক্তব্য যে এই সর্বপ্রথম উপস্থিত করা হলো, তা নয়। ১৮০৪ খৃষ্টাব্দেই নানা ধর্মের আলোচনা প্রসঙ্গে রামমোহন এমন এক বক্তব্য প্রকাশ করেন যা সাম্প্রদায়িক দৃষ্টি-ভঙ্গিরই পরিচয় দেয়। তার মধ্যেও সাম্প্রদায়িক ভেদ-বিভেদ, বিদ্বেষ সৃষ্টির উপাদান যথেষ্ট নিহিত রয়েছে এবং এ বক্তব্য সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ সৃষ্টিরই সম্পূর্ণ অনুকূলে। ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে মুর্শিদাবাদে কলেকটরের খাসমুন্সি থাকাকালে তাঁর প্রথম গ্রন্থ "তুহফাৎ-উল-মুওয়া হিদ্দিন্" গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ঐ গ্রন্থে "ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও ইসলাম" এই শিরোনামায় একটি বক্তব্য লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। বক্তব্যটি নিচে উল্লেখ করা হলো :

"ঐ সব দৈবী নির্দেশে আস্থা রাখার জন্য ইসলামধর্মীরা ব্রাহ্মণজাতির অনেক ক্ষতি করেছে। ও তাদের উপর অনেক নির্যাতন করেছে. এমনকি মৃত্যু-ভয়ও দেখিয়েছে তবু তারা ধর্ম পরিত্যাগ করতে পারেনি। ইস্‌লামানুবর্তীরা কোরাণের পবিত্র শ্লোকের মর্মানুসারে (যথা পৌত্তলিকদের যেখানে পাও বধ কর ও অবিশ্বাসীদের ধর্মযুদ্ধ করে বেঁধে আন এবং তাদের কাছ থেকে অর্থ নিয়ে মুক্ত করে দাও বা বশ্যতা স্বীকার করাও) এগুলি ঈশ্বরের নির্দেশ বলে উল্লেখ করে, যেন পৌত্তলিকদের বধ করা ও তাদেরে নানাভাবে নির্য্যাতন করা ঈশ্বরাদেশে অবশ্য কর্তব্য। মুসলমানদের মতে ঐ পৌত্তলিকদের মধ্যে ব্রাহ্মণরাই সবচেয়ে পৌত্তলিক সেইজন্যই ইস্‌লামানুবর্তীরা সর্বদাই ধর্মোন্মাদে মত্তহয়ে, এবং তাদের ঈশ্বরের আদেশ মানবার উৎসাহে "বহু দেববাদিদের" ও শেষ পয়গম্বরের ধর্ম প্রচারে "অবিশ্বাসীদের" বধ করতে ত্রুটি করেনি" (রামমোহন রচনাবলী—হরফ প্রকাশনী থেকে উদ্ধৃত পৃঃ ৭২৭)।

দুটি সম্প্রদায়ের মধ্যে বিদ্বেষ, বিভেদ সৃষ্টির কাজে এই বক্তব্যের চেয়ে ধারালো অস্ত্র আর কি থাকতে পারে। আমরা দেখতে পাবো ইংরাজরা খুব সফলভাবে সাম্প্রদায়িকতার অস্ত্রটি প্রয়োগ করেছিল উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে তাদের প্রভুত্ব কায়েম রাখার জন্যে। বলাই বাহুল্য যে শুধু সামরিক বাহিনীর সাহায্যে ভারতবর্ষ দখল করা সম্ভব হয়নি ইংরাজদের পক্ষে! তাদের অন্যতম একটি কৌশল ছিল—ভেদ-বিভেদ সৃষ্টি করে প্রভাবশালী ভারতীয়দের একটি অংশকে বশীভূত করে তাদের সাহায্যে দেশীয় শাসন কর্তাদের বিরুদ্ধে গোপন ষড়যন্ত্র গড়ে তোলা এবং সময় সুযোগ এলে তাদের ক্ষমতাচ্যুত করে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করা। বাঙলা দখল করার সময় এই কৌশলই তারা গ্রহণ করে। এই একই কৌশল গ্রহণ করে দখল করেছিল স্বাধীন শিখরাজ্য। প্রতিটি রাজ্য দখল করার পূর্বে একটি পক্ষকে শাসন কর্তার বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়েছে। কিন্তু একটি দেশ বিদেশীদের পক্ষে জয় করা আর তার উপর নিজেদের শাসন কায়েম রাখা এক নয়। স্বভাবত তাদের শাসন কায়েম রাখার জন্যও তাদের নির্ভর করতে হয়েছিল সৈন্যবাহিনীর পাশাপাশি তাদের পুরোনো সেই "বিভক্ত করে

শাসন করো" এই নীতিটির উপর।

ভারতবর্ষে শাসন কায়েম রাখার জন্যে এই নীতিটি যে ইংরাজেরা বারবার প্রয়োগ করে এসেছে সে-সম্পর্কে কার্ল মার্কসের একটি ঐতিহাসিক উক্তি স্মরণীয়। তিনি বলেছিলেনঃ "প্রায় দেড়শো বছর ধরে গ্রেট বৃটেন তার ভারত সাম্রাজ্যের মেয়াদ বজায় রাখার অপচেষ্টা করেছে যে-মহাসূত্রে সেটি হলো, রোমানদের 'Divide-et-impera' (বিভক্ত করে শাসন করো)। বিভিন্ন জাতি, উপজাতি, বর্ণাশ্রম, ধর্মবিশ্বাস ও সার্বভৌমত্বের যে-যোগফল থেকে গড়ে উঠেছে ভারত নামের ভৌগলিক ঐক্য তাদের পরস্পরের বৈরিতাই বৃটিশ প্রাধান্যের মূলনীতি হয়ে এসেছে।" স্বভাবত ইংরেজদের অন্যতম প্রধান কাজ হয়ে উঠেছিল ঐ বৈরিতা সৃষ্টি করা। সেদিক থেকে ভারতবর্ষের মত একটি দেশে সে কাজটা ছিল কিছুটা সহজ। "ভারতবর্ষ এমন একটা দেশ যাহা কেবল হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যেই বিভক্ত নয়, এদেশটা বিভক্ত গোষ্ঠীতে-গোষ্ঠীতে, জাতিতে-জাতিতে।" শুধু তাই নয় পূর্বেই বলা হয়েছে, আছে বিভিন্ন জাতি, উপজাতি, বর্ণাশ্রম, ধর্ম বিশ্বাস। তাই মার্কস মন্তব্য করেছেন এই কথা বলে যে "কোন বৈদেশিক শক্তির পররাজ্য লোলুপতার শিকারে পরিণত হওয়া সেই দেশ ও সেই সমাজের বিধি লিপি না হইয়া কি পারে?" স্বভাবত দেশ দখল করলেও ইংরাজ শাসন বিরোধী শক্তি গুলিকে দুর্ব্বল করে ফেলার জন্যে, তাদের ধ্বংস করে ফেলার জন্যে ভেতর থেকে তার মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার কাজে তারা গোপন ষড়যন্ত্রে যে-লিপ্ত ছিল তাতে সন্দেহ প্রকাশের কোন অবকাশ নেই এবং সেদিক থেকে এই হীন উদ্দেশ্য সফল করে তোলার সবচেয়ে ধারালো অস্ত্র হলো সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ও ভেদাভেদ সৃষ্টি।

এই সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদ সৃষ্টির অপচেষ্টা তারা যে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখলের পর থেকেই করে আসছিল তা শাসক পক্ষের বিভিন্ন বিশিষ্ট ইংরেজের বক্তব্য থেকে সহজেই বোঝা যায়।

১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে লর্ড এলিনবরো বিশেষ করে হিন্দুদের সম্পর্কে সচেতন করে তোলার উদ্দেশ্যে বলেছিলেন "....আমাদের যথার্থ নীতি হলো হিন্দুদের সঙ্গে বন্ধুত্ব পুনঃ স্থাপন করা।" (হীরেন মুখার্জি—১৮৫৭ ও আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম প্রবন্ধ।) ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের প্রথম জাতীয় স্বাধীনতার যুদ্ধ সম্পর্কে স্যার জেমস আউটরাম বলেছিলেন যে এটা হচ্ছেঃ "হিন্দুদের বিক্ষোভের ভিত্তিতে একটি মুসলমানী ষড়যন্ত্র।" (ঐ প্রবন্ধ থেকে)

"স্যার হেনরী লরেন্স লর্ড ক্যানিংকে লেখেন—'আমি দুটি সম্প্রদায়ের ভেদবুদ্ধির দিকে তাকিয়ে আছি।' কিন্তু অযোধ্যার লেফট্‌ন্যান্ট গভর্ণর রাসেল আক্ষেপ করে বলেছেন—'বিদ্রোহের সময়........হিন্দু মুসলমানের মধ্যে বিভেদের সুযোগ নিতে পারা যায়নি'।" (৮২ পৃঃ স্বাধীনতার সংগ্রামে বাঙলা)।

স্বাভাবিকভাবেই ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে বা ঐ সময়েও যে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে বা একই ধর্মের বিভিন্ন গোষ্ঠী ও ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার বিশেষ প্রয়োজন ছিলো তা বলাই বাহুল্য। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ শাসনের বিরুদ্ধে জনগণের প্রথম যুদ্ধটির মূল অংশ থেমে গেলেও বিভিন্ন জেলায়, বিভিন্ন ভাবে যুদ্ধ চলছিল। তাছাড়া ১৭৯৩ থেকে ১৮০০ খৃঃ অবধি এই সময়েও প্রবল যুদ্ধ চলেছিল। বলা হয়েছে "এই সময় সন্ন্যাসী ও ফকিরদের একমিলিত বাহিনী রাজশাহী জেলায় প্রবেশ করিয়া ইংরেজ সরকারের রাজস্ব, ইংরেজদের বাণিজ্য কুঠি ও জমিদারদের কাছারি লুণ্ঠন করে।" (Letter from the collector of Murshidabad to the Governor General 11. 3. 1793 referred to in "ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গনতান্ত্রিক সংগ্রাম– ৪৮ পৃঃ)। আরোউল্লেখ করা হয়েছেঃ "এই সময় সন্ন্যাসী ও ফকিরদের একটি মিলিত বাহিনী কোচবিহার ও আসামে যাইয়া এবং আসামের 'মোয়ামারিয়া' বিদ্রোহের সুযোগ লইয়া ইংরাজদের আসাম হইতে বিতাড়নের প্রয়াস পাইয়াছিল।" "........তাঁহার (সোভান আলি—লেখক) সহকারী নেয়াজু শাহ, বুদ্ধু শাহ, ও ইমামবারি শাহ মিলিত ভাবে ১৭৯৯ হইতে ১৮০০ খৃঃ পর্যন্ত বগুড়ার জঙ্গলাকীর্ণ অঞ্চলে কেন্দ্র স্থাপন করিয়া এবং উক্ত অঞ্চলের বুভুক্ষ ও উৎপীড়িত কৃষকদের লইয়া "সন্ন্যাসী বিদ্রোহের পতাকা উড্ডীন রাখিয়াছিলেন।" (Letter Dated 9. 1. 1794 from commssr of Cooch Behar to governor genl and Letter dated 20. 2 1800 from the Magistrate of Dinajpur and letter dated 5. 9. 1800 from the same to Govr.-genl— । ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণ সংগ্রাম গ্রন্থ হতে গৃহীত)। কাজেই দেখা যাচ্ছে যুদ্ধ তখনো সম্পূর্ণ শেষ হয়নি বরং নতুন করে যুদ্ধ হবার সম্ভাবনাও থেকে গেছে। তাছাড়া, ঐ 'প্রথম যুদ্ধ' শেষ হতে না হতেই (১৮২০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্ব থেকেই) 'সর্ব্বভারতীয় ওয়াহবী যুদ্ধ' সুরু হবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। "১৮২০ থেকে ১৮২২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিয়া" তাঁদের আদর্শ প্রচার করেন সৈয়দ আহম্মদ। ওয়াহাবী আদর্শ প্রচারিত হলে হাজার হাজার মানুষ ওয়াহাবী মতাদর্শে অনুপ্রাণীত হয়ে ওঠে এবং পরবর্ত্তীকালে প্রায় সারা ভারতবর্ষ জুড়ে তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়। স্বাভাবিকভাবেই ইংরাজরা সব সময় সতর্কদৃষ্টি রেখেছিল ভারতীয়দের বিশেষতঃ বিপ্লবীদের গতিবিধির উপর। ঠিক এমনি সময় রামমোহন যে সাম্প্রদায়িক বক্তব্য প্রকাশ করলেন— তা ইংরাজদের হাতে ধারালো অস্ত্র হয়ে উঠ্‌লো দুটি সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির কাজে। কালক্রমে রামমোহনের ভূমিকা 'হিন্দু ধর্ম ও সমাজ' সংস্কারের' মধ্যে সীমাবদ্ধ থাক্‌লো না। ধর্ম, সমাজ ও রাজনীতিগত সমস্যাকে একসঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হলো এবং তাঁর আলোচ্য বিষয় হয়ে উঠলো—একমাত্র হিন্দু সমাজের রাজনীতিক সমস্যা। ফলে সুবিধে হয়ে গেলো সাম্প্রদায়িক রাজনীতির জন্ম নেওয়ার।

১৮২৮ খৃষ্টাব্দেই তিনি প্রস্তাব করলেন হিন্দু ধর্মের কিছু কিছু পরিবর্ত্তনের। তাঁর মতে হিন্দুদের রাজনৈতিক উন্নতি ও সামাজিক কল্যাণের দিকে লক্ষ্য রেখে এই পরিবর্ত্তন প্রয়োজন। একমাত্র হিন্দুদের রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের প্রশ্ন উঠলো এই সর্বপ্রথম। রাজনীতিকে করে তোলা হলো সাম্প্রদায়িক অর্থাৎ করা হলো একটি মাত্র সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ। ফলে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির জন্ম হলো এই সর্বপ্রথম। সেই সাম্প্রদায়িক রাজনীতি একদিন বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করলো "হিন্দু কলেজ" প্রতিষ্ঠার মধ্যে। বলাই বাহুল্য এই সাম্প্রদায়িক রাজনীতি ঔপনিবেশিক স্বার্থে ইংরাজদেরই প্রশ্রয়ে বেড়ে উঠতে লাগলো। কাজেই ঘড়ির ইংরাজ ব্যবসায়ী হয়ে উঠলেন ইংরাজী শিক্ষার অনুরাগী। পরিকল্পিত পথেই একসাথে এগিয়ে এলেন রামমোহন আর ডেভিড হেয়ার সাহেব। শ্রদ্ধেয় অমিতাভ মুখোপাধ্যায় বলেছেন :

"The Calcutta Christian obseiver of 1832 tells us that the idea of starting the Hindoo college was rooted by David Hare in an informal meeting at Rammohon's House, (1815)... Hare proposed the establishment of a College for teaching European literature and science." (Reforms & Regulation in Bengal by Rammohan Ray) তিনি আরো লিখেছেন : The primary object of the institution was defined as the 'tuition of the sons of respectable Hindoos in the English and Indian languages in the literature of and secince of Europe and Asia.

The institution was meant inclusively for the members of the Hindu communites but the education to be given here was completely secular and western (Ibid p-28) "In 1822 Rommohan started the Anglo Hindoo School near Cornwallis Squire, Cal. for an imparting of a free education in English to Hindoo boys . . " (Ibid)। হিন্দুকলেজ প্রতিষ্ঠার মূলে যে-সাম্প্রদায়িক রাজনীতি ও উপনিবেশিক শক্তির মদত ছিলো—তা আরো পরিষ্কার ভাবে বোঝাযায় শ্রদ্ধেয় সীতাংশু মৈত্রের নিম্নলিখিত মন্তব্য থেকে। তিনি লিখেছেন : "১৮১৭ সালে যে-উচ্চশিক্ষার বিদ্যালয় মহাসমারোহে স্থাপিত হইল তাহার নাম দেওয়া হইল হিন্দু কলেজ। কেন, মুসলমানরা কি এদেশের বাসিন্দা ছিলেন না?·········কিন্তু মুসলমানদের হাত হইতেই যে-রাজ্য ছিনাইয়া লইয়া আবার তাহাদেরই বিশ্বাস ইংরাজরা করিতে পারে নাই ; মুসলমানরাও বিশেষ করিয়া শিক্ষিত উচ্চ পদস্থ মুসলমানরাও তখনই তখনই ইংরাজকে রাজা বলিয়া স্বীকার করিয়া পরম অনুগত হইয়া উঠিতে পারে নাই। কিছুপরে তো ওয়াহাবী (ফরাজী) আন্দোলনই হইয়া গেল। সে বিদ্রোহ মূলক আন্দোলনই ছিল

মুসলমানদেরই, এবং পরিচালিত হইয়াছিল ইংরাজদের বিরুদ্ধে। হিন্দুরা সেই আন্দোলনে সম্ভবতই উত্যক্তই হইয়াছিল।" (যুগন্ধর মধুসূদন—৫৫পৃঃ) এখানে হিন্দু বলতে হিন্দু ধনী অভিজাত শ্রেণীকেই বুঝতে হবে। ওয়াহাবী আন্দোলন কোনো সাম্প্রদায়িক আন্দোলন ছিল না। ওয়াহাবী আন্দোলনে হিন্দু ব্যবসায়ী সম্প্রদায় যেমন যোগদান করে তেমনি কৃষকরাও। অপরপক্ষে ধনী মুসলমানরাও ঐ আন্দোলন শুধু বর্জন করে নাই; বিরোধীতাও করে। কারণ ওই আন্দোলন মুসলমান আন্দোলন ছিল না, ছিল ইংরাজদের বিরুদ্ধে। যাই হোক ওই ওয়াহাবী আন্দোলনে 'হিন্দুদের' উত্যক্ত হবার কারণ সম্পর্কে শ্রী মৈত্র লিখেছেন: "কেননা সমগ্র মুসলিম প্রভুত্বের যুগে নিরাপত্তা ও শান্তি বলিয়া জীবনে কাহারও কিছু ছিল না। ছিল কেবল আকস্মিক আক্রমণ, লুটতরাজ, প্রভুত্বদম্ভ ইত্যাদি। ইংরাজ আসিয়াই প্রথমে সমাজ ও ব্যক্তির জীবনে নিরাপত্তা ও শান্তি ফিরাইয়া আনিল। তাই হিন্দুরা ইংরাজদের প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞ ছিলেন। মুসলমান ও হিন্দু এক জাতীয় চেতনার মধ্য দিয়া কখনও এক হইয়া যায় নাই।...হিন্দুরা তাই এখন নিজেদের স্বাতন্ত্র্য এবং মুসলমানদের প্রতি যুগ যুগ সঞ্চিত অবজ্ঞা আর ঘৃণা প্রকাশ করিবার সুযোগ পাইলেন। তাই হিন্দু কলেজের নাম হইল হিন্দু কলেজ।" ঐ গ্রন্থ-৫৫পৃঃ)। লক্ষ্যনীয় যে শ্রী মৈত্রের এই বক্তব্য রামমোহনের বক্তব্যেরই প্রতিধ্বনিমাত্র। যাই হোক তাঁর বক্তব্য থেকে এটা পরিষ্কার হয়ে যায়—হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার মূলে ছিল সাম্প্রদায়িক চেতনা ও রাজনীতি এবং পরিকল্পিতভাবেই অন্যান্য সম্প্রদায়কে বিশেষ করে মুসলমান জনসমাজকে বাদ দেওয়া হয়। এই ভাবেই সাম্প্রদায়িক রাজনীতিরও পথ দেখানো হয় জাতীয় চেতনার মূলে কুঠারাঘাত করে। ফলে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের পথ ধরে ইংরেজদের পরম অনুগত শিক্ষিত মধ্য শ্রেণী শুধু মুসলমান বিদ্বেষীই হয়ে উঠলেননা, বিরোধী হয়ে উঠলেন জাতীয় স্বাধীনতারও। তাই জাতীয় স্বাধীনতার ধ্বংস স্তূপের উপর তাঁরা সুদৃঢ় করে তুলতে সচেষ্ট হয়ে উঠলেন ইংরাজ শাসনের নতুন সৌধ। এই রাজনীতিরই অবশ্যম্ভাবী পরিণতি ইংরাজ শাসকবর্গের সঙ্গে একাত্ব হয়ে ওঠা। শ্রদ্ধেয় মৈত্র লিখেছেন: "তা দেখা যায় ইংরাজ শাসনের প্রারম্ভকাল হইতে ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের ওয়াহাবী বিদ্রোহের অবসান পর্যন্ত একশত বৎসরের একদিকে হিন্দু মধ্যশ্রেণী ইংরাজ শাসনের সহিত পূর্ণ মাত্রায় সহযোগীতা করিয়া ভূমিব্যবস্থা, শাসনকার্য, শিক্ষা, প্রভৃতি শাসন ব্যবস্থার সকলক্ষেত্রে সুবিধাজনক স্থান অধিকার করিয়া লইয়াছিল........" (ঐ গ্রন্থ)। এই একশত বছরের মধ্যে ইংরাজরা অসংখ্য যুদ্ধের সম্মুখীন হয়েছে। তন্মধ্যে ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের "প্রথম জাতীয় স্বাধীনতা যুদ্ধের" কথা ভুলে গেলে চলবে না। সমস্ত প্রকার সাম্প্রদায়িক রাজনীতিকে পদদলিত করে সমস্ত সম্প্রদায়ের সমস্ত শ্রেণীর মানুষ এমনকি সন্ন্যাসী ফকির অবধি ঐক্যবদ্ধভাবে অস্ত্র হাতে লড়াই করছে ইংরাজদের

বিরুদ্ধে ; ইংরাজ শাসন উচ্ছেদ করে জাতীয় স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করবে এই আশায়। হিন্দু লড়াই করেছে মুসলমান মৌলবীর নেতৃত্বে আর মুসলমান লড়াই করেছে হিন্দু ব্রাহ্মণের নেতৃত্বে। আর সবচেয়ে বিস্ময়ের কথা একজন মুসলমান বাদশাকেই বসানো হয়েছে সিংহাসনে। সামন্ত প্রভুরা বেইমানী না করলে আবার ভারতবর্ষ ফিরে পেতো তার নিজের গৌরব যা ধুলায় লুণ্ঠিত করেছিল ইংরাজরা। সেই লড়ায়ের দিনগুলি কোলকাতায় ইংরাজদের পরম অনুগত শিক্ষিত শ্রেণীর পক্ষে বুক চাপড়ানো আর স্বাধীনতা সংগ্রামীদের গালাগালি দেওয়া ছাড়া করণীয় আর কিছুই ছিল না। শ্রীমৈত্র তাই লিখেছেন : "এইটুকু শুধু মনে ক্ষোভ রহিয়া যায় যে এই সব মনীষীরা...... তখনও হিন্দু ও মুসলমানকে একজাতি বলিয়া ভাবিতে শেখেন নাই এবং সেই দুর্বলতার সুযোগ ১৮৫৭ এর পরে ইংরাজরা ভালো করিয়া লইয়াছিল।" (ঐ গ্রন্থ ৬৬ পৃঃ)।

শুধু যে হিন্দু সাম্প্রদায়িক রাজনীতিরই জন্ম হলো আর মুসলমান সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলি ছিল নিষ্ক্রীয় একথা মনে করার কোন কারণ নাই। ইংরাজদের "বিভেদ সৃষ্টির' 'উদার হাত' দুদিকেই বাড়ানো ছিল। মনে রাখতে হবে উপনিবেশিক শক্তি উপনিবেশের মানুষকে ভালোবেসে কিছু করেনা। তার স্বার্থ রক্ষার জন্য সে সব কিছুই করে থাকে। তাই মুসলমান সম্প্রদায়ের ধনী অভিজাত শ্রেণীকে আশীর্বাদ করতে ইংরাজরা কার্পণ্য করেনি। দুটি সম্প্রদায়কে দুটি ভিন্ন শিবিরে তারা বন্দী করে রাখতে চায়। তাই দেখা গেল : "Warren Hastings, the Governor General, founded the Calcutta Madrasah in 1780 partly inspired and with the object of giving the sons of respectable Muhammedan Families the education which would fit them for responsible and lucrative offices in State." (Reforms and Regulation in Bengal by Rammohan Roy—byA. Mukherjee)।

অবশ্য শ্রদ্ধেয় সীতাংশু মৈত্রও লিখেছেন : ১৭৮১ খৃষ্টাব্দেই হেষ্টিংস কলিকাতা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন আর ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে যোনাথন ডানকানের উদ্যোগে কাশিতে সংস্কৃত কলেজ স্থাপিত হয়।" (যুগন্ধর মধুসূদন)।

"স্যার সৈয়দ্ আহমেদ আলিগড়ে মুসলমান সমাজকে ইংরাজী শিক্ষার দিকে মুখ ফেরাতে আহ্বান জানালেন। বাঙলা দেশেও ইংরেজী শিক্ষার প্রেরণা কোনো কোনো ব্যক্তি ও একটি ছোট্ট গোষ্ঠীর মধ্যে দেখা গেল।" (স্বাধীনতার সংগ্রামে বাঙলা ১৭৫ পৃঃ)। আবার "১৮৬৩ খৃীঃ নবাব আবদুল লতিফ 'মোহামেডান লিটারেরী সোসাইটি' স্থাপন করলেন। জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চার মধ্যে দিয়ে মুসলমান সমাজে মানসিক সচেতনতা সৃষ্টি করা এই সোসাইটির উদ্দেশ্য বলে ঘোষণা করা হল। এই সোসাইটিতে যে সব বিষয় নিয়ে আলোচনা চলতো তার কয়েকটি যেমন : ইতিহাসের প্রয়োজনীয়তা, নৌ পরিচালনা ও

বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি, আমেরিকার আবিষ্কার, সভ্যতার মোড় ফেরার কাহিনী, মুসলমান আইনের মূলনীতি সমূহ।"

"কিছু পরে অনুরূপ উদ্দেশ্য নিয়ে সৈয়দ আমির হোসেনের উদ্যোগে 'ন্যাশনাল মোহমেডান অ্যাসোসিয়েশন' নামে আর একটি সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। সৈয়দ আমির হোসেন মুসলমানদের শিক্ষা সম্বন্ধে একটি ইংরেজী পুস্তিকা প্রকাশ করেন (১৮৮০)। তাতে মুসলমানদের উচ্চ ইংরেজী শিক্ষার উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়। তিনি বললেন ইংরাজী না শিখলে ভারতবর্ষের অন্যান্য জাতির সঙ্গে প্রতিযোগীতায় মুসলমানদের হার ভিন্ন আর কিছু হবে না তা দেখতেই পাওয়া যাচ্ছে।" (ঐ গ্রন্থ ১৭৬ পৃঃ)। লক্ষ্যণীয় যে সৈয়দ আহমেদ ইংরেজদের 'স্যার' উপাধি প্রাপ্ত ব্যক্তি। ইংরেজদের অনুগ্রহ পুষ্ট ব্যক্তি ছাড়া এই "স্যার" উপাধি লাভ করা সম্ভব হতো না। 'নবাব' আবদুল লতিফও যে সমাজের উচুতলার ইংরাজ ঘেঁষা মানুষ তা 'নবাব' উপাধি থেকেই বোঝা যায়। স্বাভাবিক ভাবে এই ভদ্রমোহদয়রা যে দেশের একটি বিশেষ সম্প্রদায় "মুসলমানদের" অভিভাবক হয়ে উঠবেন এবং ইংরেজী শেখাবার জন্য তৎপর হয়ে উঠবেন তাতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নাই। "স্বভাবত ভারতবর্ষের অন্যান্য জাতির সঙ্গে অর্থাৎ 'হিন্দুদের' সঙ্গে "প্রতিযোগীতার" দিকে মুসলমানদের টেনে নিয়ে গেলেন। কিন্তু 'মুসলমান' শব্দ ব্যবহার করলেও প্রকৃতপক্ষে শুধু ধনী অভিজাত মুসলমানদেরই প্রতিনিধি ছিলেন এঁরা। যাই হোক উপরের বিবরণগুলি থেকে এটা বেশ বোঝা যায় যে সেকালে এইভাবে মুসলমান ধনী অভিজাত শ্রেণীর মধ্যে মুসলিম সাম্প্রদায়িক রাজনীতিরও জন্ম দেওয়া হয়েছিলো হিন্দু সাম্প্রদায়িক রাজনীতির পাশা-পাশি আর তা ঘটেছিলো ইংরেজদের পৃষ্ঠপোষকতায়ঃ অবশ্য এই সাম্প্রদায়িক নেতৃত্বের অধীনে ছিল শুধুমাত্র ধনী অভিজাত শ্রেণীর লোকজন —দেশের একটি ক্ষুদ্র অংশ। বিরাট জনগণ এঁদের পেছনে ছিল না। নরহরি কবিরাজ মহাশয়ও বলেছেন ঃ "এইভাবে মুসলমান সমাজের মধ্যে এক আলোড়ন শুরু হল সন্দেহ নাই। তবে এই আলোড়ন—এই সমাজের একটি অতি ক্ষুদ্র অংশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল ;............" (ঐ গ্রন্থ)।

লক্ষ্যকরার বিষয় যে তাঁদের আলোচ্য বিষয় হয়ে উঠেছিল ঃ 'ইতিহাসের প্রয়োজনীয়তা' আর 'নৌপরিচালনা'। প্রথমত ঃ ইংরেজদের লেখা ইতিহাসই হয়ে উঠেছিল সাম্প্রদায়িক বিভেদ সৃষ্টির অস্ত্র। সুতরাং শিক্ষিত মুসলমান সমাজকে হিন্দু বিদ্বেষী করে তোলার জন্যে এই অস্ত্র প্রয়োগের প্রয়োজন ছিল। দ্বিতীয়ত ঃ ইংরেজদের বাণিজ্য জাহাজ চালাবার লোকজন চায়। হিন্দুরা সংস্কারবশতঃ 'জাহাজের' কাজে যোগ দিতে উৎসাহী ছিল না। সুতরাং মুসলমান খালাসীর ছিল বিশেষ প্রয়োজন ইংরেজদের স্বার্থে। স্বভাবতঃ এরও মূলে যে ইংরেজদের চতুর গোপন হাত ছিল

তা বলাই বাহুল্য। তাই দেখা গেল দুটি সম্প্রদায়ের মানুষকে দুটি সম্প্রদায়ের তথাকথিত নেতারা সাম্প্রদায়িক রাজনীতির পথ ধরে টেনে নিয়ে গেলেন আর তাদের পেছনে থাকল ইংরেজরা। তাই আমরা দেখি কালক্রমে একদিন "প্রধানতঃ ব্রাহ্ম আন্দোলনের নেতাদের উদ্যোগেই এইসময়ে 'জাতীয় মেলা' বা 'হিন্দু মেলা' নামে স্বদেশী ভাবোদ্দীপক একটি উৎসবের সূত্রপাত (১৮৬৭) হল।" (ঐ গ্রন্থ)। এইভাবে "মহা হিন্দু সমিতি" গঠনেরও প্রস্তাব করা হলো "বৃদ্ধ হিন্দুর আশা" গ্রন্থে। "জাতীয় মেলা 'হিন্দু মেলা' বলে পরিচিত হল। 'হিন্দু', 'জাতীয়' দুটি কথা প্রায় এক অর্থবাচক হয়ে উঠল।" খোলাখুলিভাবেই একদিন বলা হলো ঃ "হিন্দু সমাজই আমাদের কার্য্যের ক্ষেত্র হইবে।" এসব "জাতীয়তা বাদ" "স্বাদেশিকতা" শব্দগুলি যাঁরা সযত্নে আমদানি করলেন— 'হিন্দুবাদ,' 'হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা' জন্ম দেবার উদ্দেশ্যে—তাঁরা পেশার দিক থেকে ছিলেন চাকুরীজীবি অনেকেই আবার 'সরকারী চাকুরে'। অর্থাৎ এঁদের স্বাদেশিকতা হলো ইংরেজ শাসন অবনত মস্তকে মেনে নিয়ে—সাম্প্রদায়িক রাজনীতি, সংস্কৃতি, সাহিত্য সৃষ্টি করে ইংরেজদের উপনিবেশিক শাসনকে সুদৃঢ় করে তোলার 'স্বাদেশিকতা'। তাই বাঙলার এই শ্রেণীর বুদ্ধিজীবিরা সাম্রাজ্যবাদী ঐতিহাসিকদের লেখা ইতিহাসকে "পুরোপুরি সত্য ইতিহাস ধরে নিয়ে মুসলমান বিদ্বেষ প্রচারে কলম ধরলেন।" (স্বাঃ সংগ্রামে বাঙলা)। শ্রদ্ধেয় নরহরি কবিরাজ মহাশয় সঠিকভাবেই লিখেছেন ঃ "সাম্রাজ্যবাদী ঐতিহাসিকেরা এই সময়ে মুসলমান আমলের ইতিহাসের বিকৃত ব্যাখ্যা উপস্থিত করে একটি সাম্প্রদায়িক বুদ্ধির মূলে ইন্ধন জোগাতে থাকলেন।" শুধু ইতিহাসের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা সীমাবদ্ধ থাকেনি। যথা সময়ে সাহিত্যের মধ্যেও আমদানী করা হলো সাম্প্রদায়িক নোংরামী—ইংরাজ শাসনকে জনপ্রিয় করে তোলার জন্যে। এদিক থেকে বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নাম পুরোভাগে। তাঁর 'আনন্দ মঠ' উপন্যাস তার জলন্ত দৃষ্টান্ত। ইংরাজরদের 'বীরের জাতি' বলে প্রমাণ করার জন্যে আর নিজের দেশের সংগ্রামী বীরদের ছোট করে দেখানোর জন্যে বঙ্কিম বাবু প্রথম মুক্তি যুদ্ধে বন্দী সেনাপতি টমাস সম্পর্কে যা লিখেছেন সেটুকু এখানে উল্লেখ করা হলো। যুদ্ধ বন্দী ইংরেজ সেনাপতি টমাস তাঁর ইংরাজ সৈন্যদের উদ্দেশ্যে বলছেন ঃ "ইংরেজ"! আমি ত মরিয়াছি, প্রাচীন ইংলন্ডের নাম তোমরা রক্ষা করিও, তোমাদিগকে খ্রীষ্টের দিব্য দিতেছি, আগে আমাকে মার, তারপর এই বিদ্রোহী দিগকে মার।" আর অমনি "ভোঁ করিয়া একটি বুলেট ছুটিল, একজন আইরিশম্যান কাপ্তেন টমাসকে লক্ষ্য করিয়া বন্দুক ছুড়িয়াছিল। ললাটে বিদ্ধ হইয়া কাপ্তেন টমাস প্রাণ ত্যাগ করিলেন।"

ইতিহাসের লোক মাত্রই স্বীকার করবেন যে এটি লেখকের অন্যতম একটি 'বানানো' গল্প মাত্র। কেননা ইতিহাসের পাতায় দেখা যায় সম্পূর্ণ অন্যকথা। প্রকৃত ঘটনাটি নিম্নরূপ। শ্রদ্ধেয় সুপ্রকাশ রায় মহাশয় তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ

"ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গনতান্ত্রিক সংগ্রামে" লিখেছেন: "রংপুরের বিদ্রোহীদের দমন করিবার জন্য একটি বিরাট সৈন্যবাহিনী লইয়া আসিলেন ইংরাজ সেনাপতি টমাস্। ১৭৭২ খৃষ্টাব্দের ৩০শে ডিসেম্বর প্রাতঃকালে রংপুর শহরের নিকটবর্ত্তী শ্যামগঞ্জের ময়দানে সেনাপতি টমাস বিদ্রোহীদের উপর আক্রমণ আরম্ভ করেন। বিদ্রোহী বাহিনীর চতুর নায়কগণ প্রথমে সসৈন্যে পলায়নের ভান করিয়া ক্রমশ পিছু হটিতে থাকে এবং এইভাবে টমাসের বাহিনী-টাকে পার্শ্ববর্তী গভীর জঙ্গলের মধ্যে টানিয়া লইয়া যায়। ইংরেজ বাহিনী জয়ের উল্লাসে মত্ত হইয়া তাহাদের গোলাগুলি নিঃশেষ করিয়া ফেলে। এইবার সুযোগ বুঝিয়া বিদ্রোহীরা অবিলম্বে ইংরেজ বাহিনীর উপর ঝাঁপাইয়া পড়ে এবং চারি দিক হইতে ইংরেজ বাহিনীটাকে ঘিরিয়া ফেলে। ঐ অঞ্চলের সকল গ্রামের কৃষকগণও তীরধনু, বল্লম ও লাঠি লইয়া বিদ্রোহীদের দলে যোগদান করে। সেনাপতি টমাস বিপজ্জনক অবস্থা উপলব্ধি করিয়া তাঁহার বাহিনীর দেশীয় সেপাহীদের পাল্টা আক্রমণের নির্দেশ দেন। কিন্তু দেশীয় সেপাহীরা স্বদেশের কৃষকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে অস্বীকার করে। অল্প সময়ের মধ্যেই টমাসের বাহিনী পরাজিত ও ছত্রভঙ্গ হয়। সেনাপতি টমাস স্বয়ং বিদ্রোহীদের তরবারির আঘাতে নিহত হন।" (৩৬-৩৭ পৃঃ)। শ্রদ্ধেয় রায় আরো লিখেছেন যে "এই সম্পর্কে রংপুর জেলার সুপারভাইজার পার্লিং সাহেবের খেদোক্তিটি বিশেষ তাৎপর্য্য পূর্ণ: "কৃষকেরা আমাদের সাহায্য তো করেই নাই, বরং তাহারা লাঠি প্রভৃতি লইয়া সন্ন্যাসীদের (বিদ্রোহীদের—লেখক) পক্ষে যুদ্ধ করিয়াছে। যে সকল ইংরেজ সৈন্য জঙ্গলের লম্বা ঘাসের মধ্যে লুকাইয়া ছিল তাহাদিগকে তাহারা খুঁজিয়া বাহির করিয়া হত্যা করিয়াছে। কোন ইংরেজ সৈন্য গ্রামে ঢুকিলে কৃষক-গণ তাহাদের হত্যা করিয়া তাহাদের বন্দুকগুলি অধিকার করিয়াছে।" (Two letters dt. 29th & 31st December 1772 from Mr. Purling, Supervisor of Rangpur to the Revenue Council—এই পত্র দুখানি হইতে এই যুদ্ধের বর্ণনা ও এই উক্তিটি গৃহিত হইয়াছে—ঐ গ্রন্থ ৩৭ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত) সাহিত্যিক বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায়ের ঐ 'আনন্দমঠেই' আর এক স্থানে লেখা হচ্ছে: "সকলে বলিল: মুসলমান পরাভূত হইয়াছে, দেশ আবার হিন্দুর হইয়াছে। সকলে একবার হরি হরি বল।"

তারপর আবার লেখা হচ্ছে: "গ্রাম্য লোকেরা মুসলমান দেখিলেই তাড়াইয়া মারিতে চায়। কেহ কেহ সেই রাত্রে দলবদ্ধ হইয়া মুসলমানদিগের পাড়ায় গিয়া তাহাদের ঘরে আগুন দিয়া সর্বস্ব লুটিয়া লইতে লাগিল। অনেক যবন নিহত হইল, ..."। লেখক এমনই ইংরেজ ভক্ত যে দিনকে একেবারে রাত করে ফেললেন।

লেখক মুক্তিযোদ্ধাদের "হিন্দু" বানিয়ে ফেললেন এবং তারপর সেই "হিন্দু জনতাকে" 'দাঙ্গাহাঙ্গামা করে বেড়ায় এমন'—"উপদ্রব কারী" বানিয়ে ফেললেন।

এটা সংগ্রামী হিন্দু-জনতার বিরুদ্ধে কুৎসা ছাড়া আর কি হতে পারে। প্রথমতঃ এই যুদ্ধ ছিল (উভয় সম্প্রদায়ের) দেশের ব্যবসায়ী বুর্জোয়াদের নেতৃত্বে (অর্থাৎ যাদের বলা হতো সন্যাসী ও ফকির) ইংরাজ শাসনের বিরুদ্ধে উভয় সম্প্রদায়ের জনগণের যুদ্ধ। হিন্দু কৃষকগণের দ্বারা মুসলমান কৃষকদের ঘরে আগুন লাগাবার বা মুসলিম কৃষকদের নিহত করার কোন প্রশ্নই উঠে না। ঐ উত্তর বঙ্গেই পরের বছরের একটি ঘটনার কথা এখানে উল্লেখ করলাম। শ্রদ্ধেয় সুপ্রকাশ রায় লিখেছেন: "২৮শে জানুয়ারী ক্যাপ্টেন জোনস-এর ইংরেজ বাহিনীর সহিত এক খণ্ডযুদ্ধে দর্পদেব নামক এক সন্যাসী সেনাপতির নেতৃত্বে পরিচালিত সন্যাসী, ফকির ও স্থানীয় কৃষকদের এক মিলিত বাহিনী পরাজিত ও ছত্রভঙ্গ হয়।" (পূর্বগ্রন্থ—৩, পৃঃ)।

উপনিবেশিক স্বার্থ রক্ষার হাতিয়ার "আনন্দমঠের" চেয়ে ভালো আর কি হতে পারে। শ্রী চট্টোপাধ্যায়ই বোধ হয় সর্ব প্রথম ব্যক্তি—যিনি দেশের ইতিহাস বিকৃত করে, ইতিহাস স্রষ্টাদের বিকৃত করে সাম্প্রদায়িক উপাদান দিয়ে সাহিত্য রচনা করেছিলেন জাতীয় স্বার্থের বিরুদ্ধে। তিনি শুধু ইংরেজদের একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারীই ছিলেন না, তাঁর পিতাও ছিলেন একজন রাজপুরুষ এবং জমিদার শ্রেণীর। একথা ভুলে গেলে চলবেনা উপনিবেশিক শক্তির গর্ভেই এই শ্রেণীটির জন্ম। সুতরাং ইংরেজ শাসনকে জনপ্রিয় করে তোলার জন্য, তা মেনে নেবার জন্য 'উপনিবেশিক সাহিত্য' সৃষ্টি করা তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু সেই সাহিত্য স্রষ্টাকে যখন "জাতীয়তা বাদের জনক" বলা হয় তখনই দুঃখ হয়।

দেশে শুধুমাত্র সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ, ভেদ-বিভেদ সৃষ্টিরই অপচেষ্টা হয়নি, ইংরেজ শাসন বিরোধী বিপ্লবী যুদ্ধ সম্পর্কেও শুধু বিভ্রান্তিই নয় বিরূপ ধারণাও সৃষ্টি করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে রামমোহনের একেশ্বর বিশ্বাসীদিগকে উপহার গ্রন্থের মধ্যে "ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও ইসলাম" শিরোনামায় উল্লিখিত বক্তব্য স্মরণীয়। ঐ বক্তব্যের মধ্যেই বিভ্রান্তি ও বিরূপ ধারণা সৃষ্টির যথেষ্ট উপাদান রয়েছে। বিশেষ করে ইসলাম ধর্মের "যে-মর্মটি" উল্লেখ করা হয়েছে সেই "মর্মটির" মধ্যে।

ইংরাজ শাসনের বিরুদ্ধে জনগণের প্রথম যুদ্ধে (অর্থাৎ "সন্ন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহে") এবং পরে 'ওয়াহবী যুদ্ধে' শত্রুদের সম্পর্কে বিশেষত ইংরাজদের পক্ষ অবলম্বনকারী জমিদার শ্রেণীর বিরুদ্ধে যে ধরনের 'শাস্তিমূলক ব্যবস্থা' গ্রহণ করা হতো সেগুলির সঙ্গে উল্লিখিত 'মর্মের' যথেষ্ট সাদৃশ্য রয়েছে দেখা যায়। এই দুটি যুদ্ধকেও 'ধর্মযুদ্ধ' বলে ঘোষণা করা হয়। জানা যায় মুক্তি যুদ্ধের বিরুদ্ধাচরণ করায় অপরাধী জমিদারদের বন্দী করা হতো। শাস্তিস্বরূপ অর্থ-দন্ড দেওয়া হতো, তাদের কাছ থেকে রাজস্ব আদায় করা হতো। বশ্যতা স্বীকার করানো হতো এমনকি অপরাধীদের মৃত্যুদন্ডও দেওয়া হত। এইসব জমিদার, জায়গীরদার, ইজারাদার যেমন উচ্চশ্রেণীর মুসলমান ছিলেন তেমনি

ছিলেন উচ্চ বর্ণের হিন্দু-ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রীয় অথবা কায়স্থ। স্বভাবত যেহেতু হিন্দু ব্রাহ্মণ আর জমিদার একই ব্যক্তি তখন তাঁকে যে-কোনো ধরণের শাস্তি দেওয়াকে একজন "হিন্দু ব্রাহ্মণের প্রতি অত্যাচার করা হলো" বলে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা খুব সহজ। প্রথম যুদ্ধ সম্পর্কে কয়েকটি ঘটনার কথা এখানে উল্লেখ করা হলো। প্রথম মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে একটি বিবরণে প্রকাশ "তিনহাজার পাঁচশত সন্ন্যাসীর একটি দল এক জমিদারের গোমস্তা কিংকর সরকারের বাড়ী এবং রামপ্রসাদ রায় নামক এক ধনী ব্যক্তির বাড়ী লুন্ঠন করিয়াছে। তাহারা অন্যান্য ধনীদেরও অব্যাহতি দেয় নাই। দুজন স্থানীয় জমিদার ইহাদের হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভের আশায় স্থানীয় এক উকিলের মারফত তিন হাজার পাঁচশত টাকা দিয়া ইহাদের শান্ত করিয়াছে"। (Letter No. Dt. 29.1.1773 from Collector, Dacca ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গনতান্ত্রিক সংগ্রাম—৩৮ পৃষ্ঠা হইতে উদ্ধৃত)। "স্থানীয় শাসক ও জমিদারগণ বিদ্রোহীদের 'কর' দিয়া তাহাদের সহিত আপাতত আপোষের প্রস্তাব করিল"। (ঐ গ্রন্থ ৩৮ পৃঃ) "ইতিমধ্যে বিদ্রোহীরা ১৩০০ টাকা সহ স্থানীয় জমিদার ও তাহার দুজন কর্মচারীকে ধরিয়া লইয়া ময়মনসিংহ জেলার দিকে দ্রুত অগ্রসর হয়……।" (ঐ গ্রন্থ ৩৮ পৃঃ)। "এই বাহিনী মুর্সিদা পরগণার অত্যাচারী মহাজন ও জমিদারগণের সম্পত্তি লুন্ঠন করিয়া ও তাহাদের আটক করিয়া অসহায় চাষীদের মুক্ত করিবার চেষ্টা করে। মহাজন ও জমিদারদের অনেকে তাহাদের হস্তে নিহত হয়।" (Letter from the Collector of Murshidabad to the Governor General dt. 11th March 1793—ঐ গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত)।

ঐ যুদ্ধের নেতৃত্বের পুরোভাগে ছিলেন সেখ মজনু শাহ। নেতৃত্বে স্বাধীন ব্যবসায়ী বুর্জোয়া শ্রেণী থাকলেও মূল বাহিনী ছিল কৃষক এবং কারিগর শ্রেণী। জমিদার শ্রেণীর অনেকেই এমনকি দেশীয় সৈন্য বাহিনীও এই যুদ্ধে যোগ দেন। বিদ্রোহীরা ছিলেন সকল সম্প্রদায়ের সকল শ্রেণীর মানুষ। নেতৃত্বে যাঁরা ছিলেন, তাঁরা ছিলেন নতুন মানবতাবাদী মতাদর্শে দীক্ষিত একটি নতুন সমাজের মানুষ। এই যুদ্ধ 'ধর্মের মুখোস' পরলেও কোন সম্প্রদায়ের 'মামুলী ধর্মযুদ্ধ' ছিল না। ছিল ইংরাজদের বিরুদ্ধে জনগণের বিপ্লবী যুদ্ধ। মুক্তি যোদ্ধাদের সামনে ছিল দেশপ্রেম, দেশের স্বাধীনতা ; তাই যুদ্ধের আক্রমণের লক্ষ্যমুখ ছিল ইংরাজ শাসনের বিরুদ্ধে। শ্রদ্ধেয় এ, এন, চন্দ্র বলেছেন : "They also, it is believed, were led by a patriotic feeling in as much as they thought the British to be intruders in the Country and of interfering in their national politics" (The Sannyassi Rebellian, page-39) তিনি আরও লিখেছেন, "The Sannyassi and Fakir took the lead ; they taught them that to unite against foreign subjugation, to possess unflinching devotion

to the Country to destroy the 'Adharma' and to establish 'Dharma' was the best way to achieve merit and the best way to serve the Country. And the workers, the peasants and resident mendicants learned and joined them as apt people." (i b i d—page-157)

এইসব সন্ন্যাসী ও ফকীররা ছিলেন একই সঙ্গে সন্ন্যাসী ও ফকির এবং ব্যবসায়ী বুর্জোয়া। নতুন মতাদর্শেরও প্রচারক। এরা সকলেই একটি সংঘও গড়ে তুলেছিলেন। এই সঙ্ঘই ছিল তাদের রাজনৈতিক সংগঠন ধর্মীয় নামের আবরণে। এ'রা উভয় সম্প্রদায় থেকে এলেও এ'রা ছিলেন প্রচলিত ধর্মীয় ধ্যান ধারণার বিরোধী। স্বভাবত, এঁদের হিন্দু বা মুসলমান বলে মনে করা ভুল। শ্রদ্ধেয় চন্দ্র উল্লেখ করেছেন: "The wandering Fakirs were not orthodox followers of Islam in the strictest sense but had adopted many popular elements in course of their wandering. Mainly they belonged to the mystic order of Sufism with the general tendency 'towards pantheism the belief that God is not distinct from his creatures but that all exists is God," (The Prospects of Islam—Lawrence Brown—quoted from Sannyassi Rebellian)। অনুরূপভাবে সন্ন্যাসীরাও ঐ একই মতাবলম্বীর মানুষ এবং পুরোহিত তন্ত্র বিরোধী। সামন্ত তন্ত্রের স্বার্থে সৃষ্ট মানুষে মানুষে সমস্ত প্রকার ভেদ-বিভেদের দেয়াল ভেঙ্গে ফেলে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন মানুষে মানুষে ঐক্য। দেশব্যাপী সৃষ্টি করেছিলেন নব জাগরণ। এই ভারতবর্ষে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন আচারে, ব্যবহারে, ধর্মে, চিন্তাভাবনায়, সাহিত্যে, সংস্কৃতিতে উন্নত এক অখণ্ড মানব সমাজ। প্রাক বৃটিশ ভারতের এ এক বিস্ময়কর ঘটনা। রায়সাহেব যামিনী মোহন ঘোষ তাঁর বিখ্যাত সরকারী গ্রন্থ "The Sannyassi and Fakir Raiders in Bengal" এ উল্লেখ করেছেন: "..... that the Mahammedan Fakir orders being organised in imitation of Hindu Sannyasis, adopted a similar dress and similar habits. It was difficult to distinguish one from the other ; Specially in later years, hard pressed by the English Sannyassis and Fakirs sometimes united forces." (p 12)। যুদ্ধের শিবিরে বিদ্রোহীরা (Sannyasi and Fakirs) একই সঙ্গে স্ত্রীপুত্র কন্যাসহ বাস করতেন। এইরকম একটি মারাঠা শিবির থেকে Braughton ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে যে-চিঠিগুলি লিখেছিলেন তাতে একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করে লিখেছিলেন: "The member of Fakirs in the Camp is enormous. They are of all description, Mohammedans

and Hindus, men & women, boys and girls. They are an intolerable nuisence wandering among the tents throughout the day." (Ibid p 10). এই বিবরণ থেকে মনে হচ্ছে যে—১৮০৯ সালের পরেও যুদ্ধ একেবারে থেমে যায়নি এবং এই যুদ্ধে মারাঠা সৈন্যরাও এসে যোগদান করেছিলেন। প্রাক বৃটিশ ভারতে এক সময় তারা শিখদের সঙ্গে যোগ দিয়ে লড়াই করেছিলেন আফগানদের বিরুদ্ধে।

আরো বিভিন্ন ঘটনা ও বিবরণ থেকে এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে ইংরাজ শাসন বিরোধী এই যুদ্ধ কোন মামুলি ধর্মযুদ্ধ ছিল না, ছিল দেশের ব্যবসায়ী বুর্জোয়াদের নেতৃত্বে জনগণের বিপ্লবী যুদ্ধ। সেদিন ইংরাজ শাসনকেই বলা হয়েছিল "অধর্ম" কেননা অন্যায়ভাবে এদেশ তারা দখল করেছিল। তাই সেই শাসন উচ্ছেদ করে স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করাই ছিল তাদের কাছে 'ধর্ম"। এই ধর্মের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত ছিল "দেশ প্রেম"। এই যুদ্ধে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের বিদ্রোহীরা এসে যোগ দিয়েছিলেন। এঁরাই নেপালের সীমানার মধ্যে একটি শিবিরও গড়ে তুলেছিলেন।

সেদিক থেকে এই যুদ্ধ ছিল একটি শ্রেণী সংগ্রাম। নিপীড়ক জাতির বিরুদ্ধে নিপীড়িত জাতির জনগণের সংগ্রাম। এই যুদ্ধের নেতৃত্বে ছিলেন ভবানী পাঠক, দেবী চৌধুরাণী, মুশা শাহ, কৃপানাত, রামানন্দ গোস্বামী, জহুরী শাহ, হাজারি সিং, ফটিক বড়ুয়া, যুগল পীর, অজিত গিরি, দোমিন গিরি, প্রমুখ। এদের সকলের পুরোভাগে ছিলেন শেখ মজনু শাহ। যাই হোক এই বিপ্লবী যুদ্ধে কোনো মুসলমান জমিদার বা মহাজনকে শত্রুপক্ষ অর্থাৎ ইংরেজদের পক্ষ অবলম্বন করায় শাস্তি দিলে যেমন কোনো মুসলমানকে শাস্তি দেওয়া বোঝায় না তেমনি কোনো ব্রাহ্মণ জমিদারকে অনুরূপ অপরাধে শাস্তি দিলে ব্রাহ্মণকে শাস্তি দেওয়া বোঝায় না। কিন্তু যদি সেইভাবে প্রচার করা হয় তবে সে হবে সত্যের অপলাপ মাত্র। বস্তুত প্রাক বৃটিশ ভারতে এঁরাই ছিলেন ইংরাজ বণিকদের বিরোধী পক্ষ এবং সামন্ততন্ত্র বিরোধী সংগ্রামের শরিক। কিন্তু রামমোহনের পূর্বোল্লিখিত বক্তব্যের মধ্যে পরোক্ষে যেন ইঙ্গিত করা হয়েছে এই যুদ্ধ মুসলমানদের ধর্মযুদ্ধ এবং এযুদ্ধের উদ্দেশ্য হলো হিন্দুদের হত্যা করা। কাজেই তাঁর উল্লিখিত "মর্ম"টি নিঃসন্দেহে বিভ্রান্তিকর এবং বিরূপ ধারণা সৃষ্টিকারী। লেখক বঙ্কিম বাবু পরবর্ত্তীকালে ঐ যুদ্ধ সম্পর্কে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে অন্য কৌশল অবলম্বন করেছেন।

রামমোহনের উল্লিখিত আবেদন পত্রগুলির বক্তব্যে তুর্কি, আফগান ও মোগল শাসকদের 'মুসলমান' এবং তাদের শাসনকে মুসলমান শাসন বলে উল্লেখ করায় হাজার হাজার মুসলমান সাধারণ মানুষ সম্পর্কেও বিরূপ ধারণার সৃষ্টি করা হয়েছে হিন্দু জনগণের মধ্যে। অথচ দেখা যায় ইংরেজ শাসনকে বলা হয়েছে 'ইংরেজ শাসন'; 'খৃষ্টান শাসন' বলে উল্লেখ করা হয়নি।

স্বাভাবিক ভাবে হিন্দু শাসক শ্রেণীর সঙ্গে মুসলমান শাসক শ্রেণীর বিরোধকে সাম্প্রদায়িক বা ধর্মীয় বিরোধ এবং হিন্দু জনসমাজের উপর 'মুসলমানদের' অত্যাচার বলে মনে হওয়া খুবই স্বাভাবিক। ওই সব শাসন কর্তা মুসলমান ধর্মে বিশ্বাসী, সুতরাং তাদের শাসন মুসলমানদের শাসন বলার অর্থ হলো, তাদের রাষ্ট্র নীতি যেন নির্ধারিত হয়েছে মুসলমান সম্প্রদায়ের সর্ব্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুসারে। এই ধারণা শুধু ভুলই নয়, অন্যায়। একমাত্র সাম্প্রদায়িক ব্যক্তি বা মূর্খরা ছাড়া কেউই এ ধরণের ধারণা পোষণ করতে পারে না।

বলাই বাহুল্য কোনো শাসন কালকে ধর্ম দিয়ে বিচার করা যায় না। বিচার করতে হবে সামাজিক অর্থনীতি আর জন সমাজের সংস্কৃতির দিকে লক্ষ্য রেখে। আমরা আগেই দেখেছি শাসক হিন্দু আর শাসিত হিন্দু এক আর অভিন্ন ছিল না। অনুরূপ ভাবে শাসক মুসলমান আর শাসিত মুসলমান এক নয়। দুটি বিবদমান শ্রেণীর মানুষ। শাসক মুসলমান শাসিত মুসলমানের মিত্র নয়; শত্রু। সাম্প্রদায়িক আবরণ দিয়ে দুটি বিবদমান শ্রেণীকে আড়াল করা সম্ভব কিন্তু বাস্তবে এক শ্রেণীভুক্ত করে ফেলা যায় না। সাম্প্রদায়িক আবরণের সাহায্যে আড়াল করা গেলেও শ্রেণী দ্বন্দ্বকে চাপা দেওয়া যায়না। শাসক শ্রেণীর শোষণ, লুণ্ঠনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত তাদের অত্যাচার, উৎপীড়ন। শোষণ, লুণ্ঠন, অত্যাচার, উৎপীড়ন এসবই শাসকশ্রেণীর রাজনীতিরই অঙ্গ। আর সেই রাজনীতি নির্ধারিত হয় তাদের শ্রেণী স্বার্থ দ্বারা। সাম্প্রদায়িক স্বার্থ দ্বারা নয়, সাধারণ মানুষের স্বার্থ দ্বারা নয়।

প্রথম মুক্তি যুদ্ধের মতই ওয়াহবী যুদ্ধকেও নিছক 'ধর্ম যুদ্ধ' বলা যায় না। যদিও ধর্মের আবরণ ব্যবহার করা হয়েছে অনিবার্য কারণ বশতঃ। সর্ব্ব ভারতীয় নেতৃবৃন্দ একটি বিশেষ সম্প্রদায় ভুক্ত হলেও শুধুমাত্র সেই বিশেষ সম্প্রদায়ের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল তা নয়। মধ্য যুগের ইউরোপের ধর্ম যুদ্ধগুলির মতই এই যুদ্ধ ছিল সমস্ত শ্রেণীর মানুষের বিপ্লবী যুদ্ধ। মহামতি এঙ্গেলস বলেছেন যে সমগ্র মধ্যযুগ জুড়ে জনগণের বিপ্লবী যুদ্ধগুলি ছিল ধর্ম যুদ্ধ। বস্তুত ধর্মীয় আবরণ থাকলেও তারও মূলে ছিল দেশ প্রেম, দেশের স্বাধীনতা, বিভিন্ন শ্রেণীর বৈষয়িক স্বার্থ। এই স্বার্থই বিপন্ন হয়ে উঠেছিল বিদেশী শাসন ইংরেজ শাসনের দ্বারা। তাই এই যুদ্ধেরও লক্ষ্য ছিল ইংরাজ শাসনের উচ্ছেদ, দেশের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা। পরবর্ত্তীকালে ওয়াহবী যুদ্ধ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা যেতে পারে। তাতে রামমোহনের বক্তব্যের ক্ষতিকর দিকগুলি আরও সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে বলে আশা করা যায়।

প্রতিটি শ্রেণী বিভক্ত সমাজে শ্রেণী দ্বন্দ্ব, শ্রেণীস্বার্থের সংঘাত অনিবার্য্য। যতদিন শাসক শ্রেণীর হাতে রাষ্ট্রযন্ত্র থাকবে ততদিন কোনপ্রকার অধিকার থাকতে পারে না অন্য শ্রেণীগুলির। সমস্ত সম্প্রদায়ের শ্রমজীবি জনতাকে ততদিন নির্ভর করতে হয় তাদের মর্জির উপর। যখনই জনগণের সংগ্রাম

শাসক শ্রেণীর স্বার্থ ক্ষুন্ন করে তখনই তারা ব্যবহার করে তাদের সমস্ত দমন যন্ত্র। তাতে কুণ্ঠিত হয় না তারা। কোনো সম্প্রদায়কেই তারা ক্ষমা করে না। তাই অধিকার অর্জনের জন্য তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র তুলে ধরতে হয় সমস্ত সম্প্রদায়ের মানুষকে। এই হচ্ছে শ্রেণী বিভক্ত সমস্ত সমাজের ইতিহাস। কোথাও এর ব্যতিক্রম নাই।

তাই স্বার্থহীন ভাষায় বলা যেতে পারে হিন্দু জনগণের উপর শাসক শ্রেণীর আক্রমণ শুধুমাত্র হিন্দু জনগণের উপর নয়; মুসলমান জনগণের উপরও। কেননা মুসলমান শ্রমজীবি জনগণ গোটা দেশের সমগ্র শ্রমজীবি জনতার একটি অচ্ছেদ্য অংশ। তাই মোগল আমলে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের শাসকবর্গের বিরুদ্ধে অস্ত্র তুলে ধরেছিলেন উভয় সম্প্রদায়ের জনগণ।

"কি হিন্দু রাজাদের আমলে, কি মুসলমান রাজাদের আমলে দেশে যখন ঘোর অরাজকতা দেখা দিত এবং সামন্ত প্রভুদের স্বৈরাচার চরমে উঠ্‌তো তখন কৃষকদের প্রতিরোধের অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়"। তাই দেখিঃ "দশম শতাব্দীর মধ্যভাগে পালবংশের পতনের যুগে রাজা দ্বিতীয় মহীপালের অত্যাচারে বাঙলার জনসাধারণ অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। এই সময়ে মহীপালকে বধ করে কৈবর্ত নায়ক দেশ রক্ষা করেন। এবং তাঁর এই মহৎ কাজের জন্য তাঁকে জনসাধারণ রাজা নির্ব্বাচিত করেন। এই ঘটনাটি ইতিহাসে 'কৈবর্ত বিদ্রোহ' নামে বিখ্যাত।"

তুর্কি আফগান বা মোগল আমলেও "সামন্ত প্রভুদের অত্যাচার আরও বেড়েছিল।" "তাই এই সময়ে কৃষক বিদ্রোহের সংখ্যাও অনেক বেশী। সুলতান আলাউদ্দিনের রাজত্বে রণথম্বরে জনসাধারণের মধ্যে দারুণ বিক্ষোভ দেখা দেয়।....উৎপীড়িত জনসাধারণ মরিয়া হয়ে হাজি মৌলা নামে জনৈক কোষাগার রক্ষীর নেতৃত্বে বিদ্রোহ করে। এই সময়ে হাজি মৌলার পাশে শুধু জনসাধারণ এসে দাঁড়ায়নি, স্থানীয় মুচি সম্প্রদায়ের লোকেরা তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে তুমুল যুদ্ধ চালিয়েছিল।"

"মুহম্মদ তুঘলকের আমলেও" তারা (জনগণ—লেখক) "সুলতানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলো।" কিন্তু রামমোহন উল্টো করে ধরলেন ভারতবর্ষের প্রকৃত ইতিহাসকে।

প্রথমত: তাঁর বক্তব্যে সাম্প্রদায়িক হানাহানির প্রশ্ন প্রাধান্য লাভ করায় শ্রেণী সংগ্রামগুলিকে আড়াল করা হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ তুর্কি, আফগান ও মোগল শাসকদের একটি বিশেষ ধর্মের সঙ্গে জড়িয়ে ফেলায় প্রকৃত ঘটনাবলী গুলিয়ে ফেলা হয়েছে। তৃতীয়তঃ প্রাক বৃটিশ ভারতের প্রকৃত চিত্রটি এবং ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর ধ্বংসাত্মক চরিত্রটি উপস্থিত করা হয়নি।

রামমোহনের বক্তব্য ইতিহাস বর্জিত

রামমোহন যে-বক্তব্যের ভিত্তিতে ইংরেজদের "হিন্দুজাতির" 'মুক্তিদাতা' বলে অভিহিত করলেন—তার মূলে আদৌ কোন বাস্তব ভিত্তি আছে কিনা—তা যাচাই করে দেখা যাক্।

প্রথমেই মানব জাতির স্বাধীকার সম্পর্কে মহামতি মার্কস ও এঙ্গেলসের একটি ঐতিহাসিক বক্তব্য স্মরণ করা যেতে পারে। বলা হয়েছেঃ "যতদিন মানব জাতি সকল প্রকার শোষণ উৎপীড়ন হইতে মুক্তি লাভ না করিবে, যতদিন মানুষ কেবল জৈব অস্তিত্ব বজায় রাখিবার জন্যই সংগ্রাম করিয়া চলিবে, ততদিন তাহার কোনো স্বাধীন অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। সর্ব্বাঙ্গীন মুক্তি লাভের পরেই কেবল সে তাহার নিজের ইতিহাস গড়িয়া তুলিবে।" এই দীর্ঘ সময় সেই মানব জাতির কি করণীয়—সে সম্পর্কেও সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

"তাহার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত মানব জাতির ইতিহাস কেবল শ্রেণী সংগ্রামের ইতিহাস, শোষক ও শোষিত শ্রেণী সমূহের দ্বন্দ্ব সংঘর্ষের ইতিহাস। এই শ্রেণী সংগ্রামই চালক শক্তিরূপে মানব জাতির ইতিহাসকে উহার চরম পরিণতির দিকে অর্থাৎ প্রকৃত ইতিহাসের আরম্ভের দিকে লইয়া যায়।" (২৬) স্বভাবতঃ একথা বলার অপেক্ষা রাখেনা যে—রাজনৈতিক স্বাধীনতা ছাড়া কোন প্রকার অধিকার রক্ষা করা যায় না। তা সম্পত্তি রক্ষার, বা ধর্মাচরণের অধিকার হোক অথবা নাগরিক অধিকারই হোক। রাজনৈতিক অধিকারই মানুষকে দেয় তার নিজের ইচ্ছামত নিজের ভাগ্য রচনা করবার স্বাধীনতা। ইংরেজরা সেই রাজনৈতিক ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত করেছিল ভারতীয়দের। তাই সেই নিপীড়ক জাতির বিরুদ্ধে নিপীড়িত জাতির সংগ্রামই ছিল প্রাথমিক কর্ত্তব্য, সেই জাতীয় সংগ্রাম থেকে দূরে সরে গিয়ে ধনী অভিজাত শ্রেণীকে সেই নিপীড়িক জাতি ইংরেজদের কাছে আত্মসমর্পণের সুপারিশ করা হলো শুধু মাত্র জৈবিক অস্তিত্ব রক্ষার জন্য আর এই সত্যকে আড়াল করে রাখা হলো ধর্মাচরণ, সম্পত্তি আর নাগরিক অধিকার রক্ষার প্রশ্নকে বড় করে তুলে। এইভাবে স্বাধীনতা সম্পর্কে যেমন বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা হলো তেমনি বিপথগামীও করা হলো ইংরাজ শাসন বিরোধী সংগ্রামী শক্তিগুলিকে। অপরপক্ষে জাতির একটি অচ্ছেদ্য অংশকে অর্থাৎ মুসলমান ধর্মাবলম্বী শাসন কর্তা সহ সমগ্র মুসলমান ধর্মী জনগণকে জাতীয় শত্রু বলে চিহ্নিত করা হলো এবং তাদের শাসন থেকে মুক্তির প্রশ্নকে জাতির মূল প্রশ্ন করে তোলা হলো। কিন্তু বাস্তব অবস্থা ঠিক তার সম্পূর্ণ বিপরীত।

একথা সর্ব্বজনবিদিত যে প্রাক বৃটিশ ভারতে জনগণের কোনো অংশেরই

(সম্পত্তি রক্ষার ধর্মাচরণের অথবা নাগরিক অধিকার) যথার্থ রাজনৈতিক স্বাধীনতা ছিলো না। যেমন হিন্দু জনগণের ছিলনা তেমনি মুসলমান জনগণেরও ছিলনা। স্বভাবতঃ ধন-সম্পত্তি, ধর্ম, নাগরিক সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যাপারে জনগণের অধিকার বলতে বোঝাতো শাসক শ্রেণী কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত অধিকার এবং সেটাই ছিল স্বাভাবিক। প্রাক বৃটিশ ভারত ছিলো সামন্ততান্ত্রিক ভারত। সামন্ত প্রভুরা জনগণের মিত্র একথা সামন্ত প্রভুরাও বলেনা এবং বিশ্বাসও করে না। রাজা মহারাজা, জমিদার, জায়গীরদার, রানা, রায়, সুলতান, নবাব, বাদশাহ, এরা সকলেই একবাক্যে বলে থাকে --তারা প্রত্যেকেই জনগণের প্রভু। জনগণের ভাগ্য বাঁধা থাকে এদের হাতের মুঠোয়। কিন্তু এ সব সমস্যা একটি স্বাধীন দেশের আভ্যন্তরীন সমস্যা। প্রতিটি দেশের এই আভ্যন্তরীণ সমস্যা সমাধান করবে সেই দেশের মানুষ। এটা হচ্ছে স্বাভাবিক ঘটনা। ভারতের আভ্যন্তরীন ব্যাপারে বৃটেনের মত একটি বহির্দেশীয় শক্তির হস্তক্ষেপ সম্পূর্ণ অন্যায়ই নয়; বিদেশী হস্তক্ষেপের কোনো প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু রামমোহন প্রজার উপর রাজার উৎপীড়নকে রাজা ও প্রজার মধ্যেকার দেশের আভ্যন্তরীন সমস্যা বলে গণ্য করলেন না; বরং তাদের চোখে সমস্ত 'মুসলমান'ই হয়ে উঠলো 'বিজয়ী শক্তি' এবং হিন্দু জনসমাজ বিজিত শক্তি; এর সহজ অর্থ দাঁড়ায় বিজয়ী মুসলমান শক্তির সঙ্গে বিজিত হিন্দুদের বিরোধই যেন প্রধান সমস্যা। আভ্যন্তরীন সমস্যা হয়ে উঠলো বিজয়ী মুসলমান শক্তির শাসন হতে বিজিত হিন্দু-জাতির মুক্তির সমস্যা। এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই শুধু হিন্দুদেরই এ দেশের 'আদি অধিবাসী' বলে উল্লেখ করা হলো আর মুসলমানদের বিজয়ী মুসলমান রাজ শক্তি অর্থাৎ বিজয়ী বিদেশী বলে তুলে ধরা হলো। নিজের দেশের প্রাক্তন শাসকবর্গকে যে 'বিজয়ী' অর্থাৎ 'বিদেশী' শক্তি বলে গণ্য করা হলো আর ইংরেজদের সম্পর্কে যে তারা বললেন: "Your dutiful subjects consequently have not viewed the English as a body of conquerors but rather as deliverers." এই চিন্তার মূলে বিদ্বেষ থাকতে পারে কিন্তু কোন বাস্তব যুক্তি নেই। একটি বিদেশী উপনিবেশিক শক্তি—নিপীড়িত জাতির মুক্তি-দাতা—এ ঘটনা অস্বাভাবিক।

ইংরেজদের মত বিদেশী আক্রমণকারীদের কাছে এই ধরণের বক্তব্যের অবতারণা—তাদের আক্রমণকে ন্যায় সঙ্গত করে তোলার এক ধরণের "অপচেষ্টা" মাত্র। একটি কুযুক্তি খাড়া করে ইংরেজদের আক্রমণকে 'উৎপীড়ক মুসলমান শক্তির' নিরবচ্ছিন্ন নির্যাতন থেকে দেশের 'আদি' অধিবাসী হিন্দুদের মুক্তির একটি "উপায়" রূপে খাড়া করা হলো মাত্র। কিন্তু বাস্তবে শাসকবর্গ ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী বলে তাঁদের শাসনের সঙ্গে ইসলাম ধর্মের বা ঐ ধর্মে বিশ্বাসী সাধারণ মানুষের কোনো সম্পর্ক ছিল না, থাকারও কথা নয়। অথবা প্রাক্তন শাসকবর্গ বিদেশী ছিলেন একথাও যুক্তি সম্মত নয় অথবা তাঁদের ধর্মে বিশ্বাসী বলে

সাধারণ মুসলমান জনসমাজও বিদেশী, এদেশের আদি অধিবাসী নয়—এ কথা মনে করারও কোনো কারণ নেই। কতকাল পূর্ব্বে প্রাক্তন শাসকবর্গের পূর্ব্ব পুরুষ বিদেশ থেকে এলেও এতদিন এদেশেরই অধিবাসী হয়ে গেছেন। তাঁদের সঙ্গে ইংরেজদের বিরাট পার্থক্য আছে। তাঁরা এদেশেরই মানুষ হয়ে গেছেন, এদেশের মানুষের সুখদুঃখের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে ফেলেছেন নিজেদের। তাই দেখি রাজকার্য্যে পরামর্শ দেবার জন্যে নিযুক্ত করা হয়েছে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় শ্রেণীকে। মুসলমান জায়গীরদারকে পদচ্যুত করে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে হিন্দুকে। আবার একজন মুসলমানকে দেখি মোগল শাসন বিরোধী মহারাষ্ট্র নায়ক শিবাজীর নৌবাহিনীর সর্ব্বোচ্চ পদে নিযুক্ত হতে। অনার্য্যদের পরাজিত করে এদেশের অধিবাসী হয়ে উঠলো আর্য্যরা—যারা একদিন ছিলো বিদেশী। শক, হুন সকলেই এলো বিদেশ থেকে। এসে আর ফিরে গেলো না তার স্বদেশে। স্বদেশের সম্পর্ক চিরকালের মত ছিন্ন করে এই দেশকেই করে ফেললো তাদের নিজেদের দেশ। একই ভাবে একদিন পাঠান, মোগলদের কাছেও এদেশ হয়ে উঠলো তাদের স্বদেশ। আর যদি মুসলমানদেরই কথা ধরা যায় তারা যে কারণেই ধর্মান্তরিত হোক—তারাও বিদেশী নয়। পূর্ব্ব থেকে এ দেশেরই ছিল অধিবাসী। ধর্মও এক ধরনের মতাদর্শ। মতাদর্শের বা ধর্মের কারণে বা ধর্ম পরিবর্তন করায় কোনো মানুষ বিদেশী হয়ে যায় না।

প্রাক্তন শাসন কর্তারা এদেশে বসবাস করেই এদেশ শাসন করেছে। এদেশের পয়সা এদেশেই ব্যয় করেছে। শ্রদ্ধেয় হরবংশ মুখিয়া সঠিকভাবেই বলেছেন: "দেখা যাচ্ছে এঁরাই ভরতের জীবনের মূল ধারাটির সঙ্গে একেবারে মিশে গেছেন এবং নিজেদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব সম্পূর্ণ বিসর্জন দিয়ে এই জীবন প্রবাহকে তাঁরা যেভাবে সমৃদ্ধ করেছেন আর কোনো কিছুতেই তা হয়নি।" (সাম্প্রদায়িক ও ভারত ইতিহাস রচনা—৫২ পৃঃ) কিন্তু ইংরাজরা এদেশে এসেছিলো এদেশকে শুধুমাত্র শোষণ, লুন্ঠন করতে আর সেই শোষণ লুন্ঠনকে কায়েম রাখার জন্য শাসন করতো। এদেশকে নিজের দেশ বলে মনে করা দূরের কথা, এদেশ থেকে লুণ্ঠিত প্রতিটি পয়সা জমে উঠেছে ইংলন্ডের পুঁজিপতিদের অর্থ ভান্ডারে; সেখানে সেই লুণ্ঠিত ধন সম্পদ ব্যয় করে বিলাস বহুল জীবন যাপন করেছে আর সেই সময় এদেশের কোটি কোটি কৃষককে ভূমি থেকে উৎখাত করে শোচনীয় দুঃখ দুর্দশার মধ্যে ঠেলে দিওয়া হয়েছে। এদেশ শাসন করেছে সুদূর ইংলন্ড থেকে। আর শুধু এদেশের মানুষকেই নয়, তার ভাষা, শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, সভ্যতা সব কিছুকে করেছে ঘৃণা। আর তাদের এই ঘৃণ্য আচরণকে সভ্যতার মানদন্ড বলে প্রচার করেছে এদেশের কতিপয় অনুগ্রহপুষ্ট জমিদার আর দালাল বুর্জোয়া শ্রেণী। বিখ্যাত ইংরাজ বক্তা এডমান্ড বার্কের একটি বক্তৃতার একটি ক্ষুদ্র অংশ আমরা এই প্রসঙ্গে স্মরণ করতে পারি।

"The Asiatic conquerors very soon abated of their ferocity

bcause they əmade the conquered country their own. They rose or fall with the rise and fall of the territory they lived .... therfefore trade, the manufacturers and the commerce of the country flourished .

But under the English Govt. all this order is reversed. The Tartar invasion was mischievous but it is our protection that destroys India young men, boys almost govern thereof without Society and without sympathy with the natives Every rupee of profit made by an Englishman is lost for ever to Indian." etc. (R. C. Dutta Economic History of India under early British Rule p 49-50)

দ্বিতীয়ত ঃ দেশের শাসন কর্তা বলতে শুধুমাত্র মোগলদেরই বোঝায়না, এই শাসনকর্তা কারা—তা বিজ্ঞান সম্মতভাবে নির্ণয় করা প্রয়োজন। কেন্দ্রের শাসন ক্ষমতা আফগান বা তুর্কি বা মোগলদের হাতে থাক্‌লেও রাজ্যের শাসন ক্ষমতা থেকে গেছে পুরোনো শাসক বর্গেরই হাতে। প্রকৃত পক্ষে রাজ্যে শাসন কার্য্য চালাতেন তারাই কেন্দ্রীয় শাসকদের সহযোগী শক্তিরূপে। সেখানে রাজা, মহারাজা, রাণা, জায়গীরদার, জমিদার, চৌধুরী, এরাই ছিলেন সর্ব্বেসর্ব্বা। সেদিক থেকে দেশের শাসক বর্গ বলতে শুধুমাত্র তুর্কি, আফগান আর মোগল সুলতান বা অভিজাত শ্রেণীকে বোঝাতো না, পুরোনো শাসকরাও ছিলেন দেশের শাসক শ্রেণীর একটি অচ্ছেদ্য অংশ। নিজের এলাকায় তাঁরাই ছিলেন প্রভাব প্রতিপত্তিশালী এবং প্রবল ক্ষমতাবান ব্যক্তি। এঁদের অধিকাংশই ছিলেন উচ্চ বর্ণেরই হিন্দু—ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়। তাছাড়া ছিলো বিরাট হিন্দু আমলাবাহিনী। সেকালেও আমলা শ্রেণী অনুপস্থিত ছিলনা। আফগানরা এদেশে আসার পূর্ব্বমুহূর্তে যে ভারতবর্ষ ছিল তার একটি সমাজ চিত্র একটি নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে পাওয়া যায়। তাতে বলা হয়েছে ঃ

"একদিকে সারা দেশ জুড়ে ছোট বড় অসংখ্য পরস্পর বিবদমান রাজ্যের মধ্যে চলছিল অবাধ মাৎস্যন্যায়। সামন্ততান্ত্রিক শোষণ ও শাসনে পিষ্ট হচ্ছিল সাধারণ মানুষ। রাজার সঙ্গে কৃষক সাধারণের যোগাযোগ ছিল যে মধ্যবর্ত্তী সামন্ত শ্রেণীর মাধ্যমে তাদের বহুবিধ দাবী মেটাতে মেটাতে সাধারণ মানুষের প্রাণ হচ্ছিল ওষ্ঠাগত। আর তাদেরই কাছ থেকে অতিরিক্ত কর হিসেবে নিংড়ে আনা অর্থ সম্পদের প্রাচুর্য্যে সামন্ত শ্রেণীর বিলাসিতার মাত্রা বেড়ে যাচ্ছিল। ক্রমশঃ বাড়ছিল মন্দির সংখ্যা আর তার সম্পদের পরিমাণ। দেয় কর ছাড়াও কৃষকদের সামন্ত প্রভুকে দিতে হতো শ্রম বিনামূল্যে। আর শক্তিমান সামন্ত প্রভুর দল প্রতিদানে গ্রামের গোচারণ ভূমিটুকু পর্য্যন্ত আত্মসাৎ করে নিয়ে তাদের অবস্থা করে তুলেছিলো অসহায়। (রোমিলা থাপার—A History

of India, Vol. 1 p 17)। এছাড়া অদৃষ্টবাদী হিন্দু ধর্মের বায়নাক্কাতো ছিলই। ছিল অর্থনৈতিক শোষণের সহায়ক ধর্মীয় অনুশাসন, আচরণ বিধি……সর্বস্তরে তখন রাজত্ব করছিল এক সংকীর্ণ বিভেদ ও দ্বীপ কেন্দ্রিক মানসিকতা। (সাম্প্রদায়িকতার ইতিহাস ও সাম্প্রদায়িক ইতিহাস— নিশঙ্ক গুপ্ত রচিত। 'প্রস্তুতি পত্রিকা থেকে উদ্ধৃত)।

তৎকালীন সামন্ত তন্ত্রের সামাজিক অর্থনৈতিক কাঠামোটি টিকে ছিল গ্রামীণ সমাজকে কেন্দ্র করে। এই গ্রামীণ সমাজে গণতান্ত্রিক আবরণের আড়ালে একদিকে ছিল একটি সুবিধা ভোগী শ্রেণী অন্যদিকে বিরাট মেহনতী জনতা। এই সুবিধা ভোগী শ্রেণীটিই ছিল একাধারে শাসক, বিচারক, শাস্তিদাতা, শান্তি রক্ষক এবং ধর্মরক্ষক। এই মুষ্টিমেয় কতিপয় ধনী অভিজাত পরিবার বাস করতো সমাজের উপর তলায়, বিলাসবহুল জীবন যাপন করতো আর অগণন শ্রমজীবি মানুষ পড়ে থাকতো একেবারে নিচু তলায়। তাদের জীবন কাটতো অমানুষিক দুঃখ কষ্টে দুঃসহ অবস্থার মধ্যে, অপমানে লাঞ্ছনায়। তাদের ফেলে রাখা হতো উপর তলার ক্রীতদাসের পর্যায়ে। শ্রদ্ধেয় রামকৃষ্ণ মুখার্জির মতেঃ "The feature of 'Primitive democracy' was visible in the village community society in the communal ownership in land and in the function of the village council" কিন্তু "class exploitation were established not only by the control of the feudal lords over the village but also by the control excercized by the priest and headmen within the village who living on the surplus labour of peasantry and the rural artisans and belonging to the castes of Brahmins and Khatriyas represented the interests of ruling class in the smallest units of the feudal Society." "The remaining castes on the other hand 'were tied to their place in production to the particular production of handicrafts and agriculture and the share of the produce that they had to yeild to the others was also laid down and enforced.' Thus 'hereditary serfdom of a type was the foundation of the village communities' and such communities with their socioreligious super structure of the caste ideology was 'the basis of the structure of Indian feudalism" (quoted from Rise and dall of E. I. Comp. by R. K. Mukheriee).

এই সব বিবরণ থেকে এটা বোঝা যায় যে প্রাক-সুলতান যুগে কি রাজ্যে কি গ্রামীণ সমাজে কয়েকজন মুষ্টিমেয় ব্যক্তি সমাজের বিভিন্ন পদে থেকে

শোষণের বোঝা চাপিয়ে দিয়েছে সমগ্র জনগণের উপর অন্যদিকে শ্রমজীবি জনগণের ধর্ম, সংস্কৃতি, আচরণ, অর্থনৈতিক জীবন—সব কিছুর জীম্মাদার ছিল উপর তলার ঐ কতিপয় ব্যক্তি। উপর তলার ধনী অভিজাত শ্রেণী মাত্রই ছিল উচ্চবর্ণের হিন্দু-ক্ষত্রিয় আর ব্রাহ্মণ। এরা সকলেই মিলিত ভাবে শোষণ লুণ্ঠন করে এসেছে নিচুতলার কৃষক, কারিগর, মেথর, হাড়ি, মুচি, ডোম—হাজার হাজার শ্রমজীবি মানুষকে, এমনি করে কায়েম রেখে এসেছে তাদের প্রভুত্ব আর এই কারণেই- এরা সকলেই ছিলো ওই হাজার হাজার শ্রমজীবি মানুষের শ্রেণীশত্রু। একই ধর্মে বিশ্বাসী বলে এই বিবদমান শ্রেণীগুলির অস্তিত্ব উড়িয়ে দেওয়া যাবে না।

আফগান, তুর্কি ও মোগলরা এসে ক্ষমতা দখল করে নিজেদের শাসন কায়েম করলেও রাজ্যে এবং গ্রামীণ সমাজে তাঁরাই থেকে গেছেন সমাজের উপর তলায় নতুন শাসকবর্গের সহযোগী শক্তিরূপে। সেদিন তাঁরা আক্রমণকারী শক্তির ঠিকমত মোকাবিলা না করে বা তাদের উচ্ছেদ না করে সেই শক্তির কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন, তাদের সঙ্গে আপোষ করেছেন এই শর্তে যে তাঁরা নিয়মিত ভাবে কেন্দ্রকে কর দিয়ে যাবেন এবং তাদের সঙ্গে সহযোগীতা করবেন মিত্র শক্তি রূপে আর তার বিনিময়ে পূর্বের মতই তাঁরা জনগনের উপর প্রভুত্ব করার অর্থাৎ তাদের শোষণ লুণ্ঠন করার অধিকার ভোগ করবেন।

ইতিহাস লেখক শ্রদ্ধেয় সুধীর কুমার মিত্র মহাশয় তাঁর "হুগলী জেলার ইতিহাস ও বঙ্গ সমাজে (৩য় খণ্ড)" উল্লেখ করেছেন: …………"আমাদের ইতিহাসের একটি লক্ষ্যনীয় বিষয় এই যে এখানে রাজা, বাদশা বদল হতো বটে কিন্তু আমলা শ্রেণী মোটামুটি একই থেকে যেতো।…………মুসলমান শাসকেরা শাসন বিভাগের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ উচ্চপদ ছাড়া অন্যান্য পদে হিন্দু আমলাদেরই নিযুক্ত রেখেছিলেন … এরই জন্য আমরা দেখি মুসলমান রাজত্বকালে বহু হিন্দু জায়গীরদার, দেওয়ান, কানুনগো হিসাবে অসীম প্রতিপত্তি ও সম্মানের সঙ্গে জীবন অতিবাহিত করেছেন। এ'রা মুসলমান দরবারের কর্মচারী হলেও নিজেদের এলাকায় প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন।" (দেশ পত্রিকা ১৭ই মাঘ ১৩৬৫ সাল প্রভাত কুমার দত্তের রচনা।)

উপর তলায় প্রভু বদলে গেলেও গ্রামীণ সমাজে পূর্বের মত সেই একই প্রধান ও পুরোহিত শ্রেণী একই ভূমিকা গ্রহণ করেছেন যতদিন সেই গ্রামীণ সমাজে কোনো উল্লেখযোগ্য পরিবর্ত্তন ঘটেনি।

অর্থাৎ পূর্ব্বতন শাসক বর্গই একই পদ্ধতিতে শ্রমজীবিদের শোষণ লুণ্ঠন করে এসেছেন।

এই প্রসঙ্গে ইতিহাস লেখক শ্রদ্ধেয় হরবংশ মুখিয়ার মন্তব্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি প্রথমেই কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তুলেছেন! "ভারতবর্ষে কীভাবে তুর্কী শাসন প্রতিষ্ঠিত হলো? বহু সংখ্যক হিন্দুকে হত্যা করে, না জোর করে তাদের

ধর্মান্তর ঘটিয়ে? তুর্কী আক্রমণের বিরুদ্ধে যে কোনোরকম গণপ্রতিরোধ একেবারেই দেখা দিলো না তারই বা কারণ কী?" ("মধ্যযুগীয় ভারতের ইতিহাস ও সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি"—সাম্প্রদায়িকতা ও ভারত ইতিহাস রচনা গ্রন্থ—৪৩ পৃঃ)। তারপরেই তিনি ঐ গ্রন্থেই উল্লেখ করেছেন, "দ্বাদশ বা ত্রয়োদশ শতকে তুর্কীরা প্রায় বারো হাজার সৈন্য নিয়ে এখানে তাঁদের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করলেন।.......কিন্তু যুদ্ধ ক্ষেত্রে প্রতিপক্ষের সমগ্রীভূত শক্তিকে পরাজিত করা আর সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা এক নয়, এবং তারা নিশ্চয় উপলব্ধি করেছিলেন প্রথমটি অপেক্ষাকৃত সহজ। যদি তারা কেন্দ্র থেকে গ্রাম পর্যন্ত সর্বস্তরে পূর্বতন সরকারী কর্মচারীদের পদচ্যুত করে নিজেদের লোক নিয়োগ করতেন তাহলে তাদের যে প্রতিরোধের মুখোমুখি হতে হতো তা প্রতিরোধ করার ক্ষমতা তাদের ছিল না। তাই.......পুরোনো হিন্দু শাসক গোষ্ঠীর অপেক্ষাকৃত নিম্নস্তরের ব্যক্তিদের সঙ্গে (অর্থাৎ রাজা, রাণা, জমিদার, চৌধুরী প্রভৃতি) তারা একটি রফা করলেন। সেই রফা অনুযায়ী ঠিক হলো যে জমিদার শ্রেণীর লোকেরা তাদের পুরোনো জমি, পদমর্যাদা, সুযোগ সুবিধা সবই রাখতে পারবেন যদি তারা প্রতি বছর সুলতানকে একটি নির্দিষ্ট খাজনা দিতে সম্মত থাকেন। যতদিন এই কর তারা ঠিকমত নির্দিষ্ট সময়ে দেবেন (কর দেওয়া মানেই সুলতানের আধিপত্য স্বীকার করে নেওয়া) এবং পরস্পরকে আক্রমণ না করবেন ততদিন তাদের স্থানচ্যুত করা হবেনা"।

"কাজেই শাসন ব্যবস্থার নিম্নস্তরে হিন্দুরাই সর্বেসর্বা রয়ে গেলেন। এই ভাবে তাঁরাই ভারতে তুর্কী সাম্রাজ্য পত্তনে সাহায্য করলেন এবং শাসনব্যবস্থার ভারও তাদের হাতেই রইলো। তাদের সাহায্য না পেলে তুর্কীদের বেশীদিনের জন্য ভারতে অবস্থান কোনমতেই সম্ভব হতো না। তাই তারাও শাসকশ্রেণীরই অংশভুক্ত রয়ে গেলেন—তুর্কীদের মত তাদেরও অস্তিত্ব কৃষকের অতিরিক্ত উৎপাদনের উপর নির্ভর করত"। (ঐ গ্রন্থ—৪৩-৪৪ পৃঃ)।

শ্রদ্ধেয় নরহরি কবিরাজ মহাশয় লিখেছেন: "হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সামন্ত প্রভু ও জমিদারেরা কৃষক কারিগরদের উপর অকথ্য শোষণ চালাতো। কৃষকেরা নিজেদের লাঙল ও গরু দিয়ে চাষের কাজ চালাত। অথচ ফসলের একটা বড় অংশ তাদের জমিদারদের গোলায় তুলে দিয়ে আসতে হতো।" তিনি আরো মন্তব্য করেছেন: "কৃষকদের স্বাধীনতা বলে কিছুই ছিল না। জমিদার, খাজনা আদায়কারী ও আমলারা কৃষকদের উপর জোরজবরদস্তী করতো, খাজনা দিতে না পারলে কৃষকদের স্ত্রীপুত্র কেড়ে নিয়ে ক্রীতদাস হিসাবে বিক্রী করে দিতো"। "অপর দিকে এই সমাজের উপর তলায় বাস করতো হিন্দু মুসলমান অভিজাত শ্রেণী—রাজা, জমিদার, জায়গীরদার প্রভৃতি।.. কৃষকদের কাছ থেকে তারা যে খাজনা আদায় করতো তার দ্বারা সংগৃহীত অর্থে এই সম্প্রদায়টি

ভোগ বিলাসে মত্ত থাকতো।" "তাছাড়া গ্রামের মোড়লেরাও অত্যাচার করতো কৃষকদের উপর। মোড়লেরা গ্রামের নেতা। এই নেতারা রক্ষক ও ভক্ষক দুইই ছিল।"

এই হচ্ছে ঐতিহাসিক সত্য। এই ঐতিহাসিক সত্যকে অস্বীকার করা রামমোহন ও তাঁর অনুগামীদের পক্ষেও সম্ভব হয়নি। সম্রাটের কাছে লেখা আবেদন পত্রের ৪৩ তম অনুচ্ছেদেই তাঁদের উল্লেখ করতে হয়েছে:
"Your Majesty, is aware that, under their former Muhammadan rulers, the natives of this Country enjoyed every political privilege in common with Mussulmans, being eligible to the highest offices in the state, entrusted with the command of armies and the Government of provinces and often chosen as advisers to their Prince, without disqualification or degrading distinction on account of their religion or the place of their birth .. and besides the highest salaries allowed under the Govt. they enjoyed . , while natives of learning and talent were rewarded with numerous situations of honour and emolument." লক্ষ্যনীয় যে "বিশেষ অনুগ্রহ" আদায় করার আশায় এই "সত্যটি" নতুন মনিবদের কাছে পেশ করেছিলেন। রামমোহন যে পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন—এই পরিবারটিও ছিল মোঘল সম্রাট এবং নবাবদের অনুগ্রহ-পুষ্ট পরিবার। তাঁর প্রপিতামহ, পিতামহ সকলেই ছিলেন প্রাক্তন শাসকবর্গের উচ্চস্তরের আমলা এবং তাঁর পিতাও ছিলেন বিরাট জমিদার। অর্থাৎ এই পরিবারটিও ছিল শাসকশ্রেণীর একটি অচ্ছেদ্য অংশ। স্বভাবতই শাসকশ্রেণীর অংশভুক্ত হয়ে একই ভাবে শোষণ লুন্ঠন করে এসেছে জনগণকে। মজার কথা এ জন্যে তিনি গর্বও অনুভব করেছেন এবং নিজের আভিজাত্যের প্রমাণ হিসাবে এইসব ঘটনা গভর্নর জেনারেল লর্ড মিন্টোকে জানিয়েছিলেন অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে। যে-মুসলমান শাসকবর্গের বিরুদ্ধে তাঁর ক্রুদ্ধ অভিযোগ দেখা যায় সেই শাসকবর্গের সহযোগী শক্তিরূপে নিজের পিতৃ-পুরুষের অংশ গ্রহণে তিনি গর্বিত। তাই তিনি ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে ১২ই এপ্রিল লর্ড মিন্টোকে লিখেছিলেন:
Your petetioner's grandfather was at various times, chief of different districts during the Administration of His Highness the Nawab Mohabut Jung and your petetioner's father for several years, rented a farm from Govt. the revenue of which was, Lakhs of rupees." (মোগল দরবার থেকে তাঁরা রায়-রায়ান উপাধিও লাভ করেছিলেন—তাদের কাজ দেখিয়ে)। এখানে উল্লেখ্য যে ভাগলপুরে থাকতে সেখানকার কলেক্টর হ্যামিলটন্ প্রকাশ্যে রাস্তার মধ্যে রামমোহনকে

অপমান করায় তিনি প্রতিকার প্রার্থনা করে এই পত্রটি লিখেছিলেন।

উপরিলিখিত বিবরণগুলি থেকে এখন এটা পরিষ্কার যে নতুন শাসকদের রাজস্ব বাবদ দেওয়ার ফলে পুরোনো হিন্দু শাসকবর্গের কিছু আর্থিক ক্ষতি হলো ঠিক কিন্তু রাজা, রাণা ও রায় নতুন শাসন ব্যবস্থায় সর্ব্বেসর্ব্বাই রয়ে গেলেন। কিঞ্চিৎ রদবদল ছাড়া পূর্ব্বাবস্থার কোনোই উল্লেখযোগ্য পরিবর্ত্তন ঘটলো না। ফলে "নতুন শত্রুর" সঙ্গে "পুরোনো শত্রুরা" একযোগে সমস্ত শ্রমজীবি মানুষকে শোষণ লুন্ঠন করতে লাগলো। এ'দের অধিকাংশই ছিলেন উচ্চবর্ণের হিন্দু। জানা যায় কর্মচারী হিসাবে ব্রাহ্মণেরা জিজিয়া করই শুধু আদায় করতেন না তাঁরা আইনজ্ঞ হিসাবে সম্রাটদের পরামর্শও দিতেন হিন্দু আইন সম্পর্কে। তাঁদের যে-এই কাজ করতে হতো তার বিরুদ্ধে তাঁদের কোনদিন বিক্ষোভ প্রকাশ করতে দেখা যায়নি। বরং তাঁরা বিক্ষোভ প্রকাশ করেছেন— শুদ্রদের পাশে বসে কাজ করতে হবে বলে। তাঁরা মোগল শাসকদের "বিষ্ণুর" অংশ বলে মেনে নিয়েছিলেন এবং এই ভাবে তাঁদের শাসনকেই ধর্ম সম্মত বলে মনে করেছিলেন—এমন প্রমাণও পাওয়া যায়।

এই অবস্থায় এ-কথা নিঃসন্দেহে আমরা বলতে পারি উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুরা যখন নতুন মুসলমান শাসকদের সহযোগী শক্তিতে পরিণত হলো তখন উভয়ের মধ্যে বিরোধও ছিলো। কিন্তু সে-বিরোধ ধর্মের বিরোধ নয়, সে-বিরোধ বৈষয়িক স্বার্থ নিয়ে, ক্ষমতা নিয়ে, লুন্ঠনের প্রাপ্য অংশ নিয়ে। এই বিরোধ হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের বিরোধ নয়। শ্রদ্ধেয় মুখিয়া বলেছেন, "তুর্কিরা তদানিন্তন রাজনৈতিক বা সামাজিক কাঠামোর ওপর কোনরকম আঘাত করেন নি, কেবলমাত্র ওপর দিকে সামান্য আংশিক পরিবর্ত্তন করেছিলেন।

"কাজেই যা কিছু বিরোধ তা শাসকশ্রেণীর মধ্যেই আবদ্ধ ছিলো। এই সংঘাত সাম্রাজ্যের শাসকশ্রেণীর অন্তর্বিরোধও হতে পারতো যেমন হিন্দু ও মুসলমান জায়গীদারদের অসংখ্য বিদ্রোহ ; আবার দুটি শাসকের মধ্যে বিরোধও হতে পারতো ;……।" এই প্রসঙ্গে প্রসিদ্ধ ইতিহাস লেখক ডঃ ইরফান হাবিবের মন্তব্য স্মরণ করা যেতে পারে। তিনি লিখেছেনঃ At the sametime considerble antagonism between imperial ruling class and , Zaminders seems to have existed on the score of their respective shares in the surplus produce in the peasantry. With its armed retainers and its local customary ties with the peasants Zaminder class appeared to the Moghol and nobility a subversive element in the whole political structure. Moreover, as the land revenue burden increased the Zaminders found themselves either unable to collect it or saw their own share being reduced." (২৭)

এই বিরোধ—হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের শ্রমজীবি জনসাধারণের নিকট থেকে লুণ্ঠিত সম্পদের ভাগ বাঁটোয়ারা নিয়ে, শোষণের অধিকার এবং শোষণ-ক্ষেত্রের দখল নিয়ে। এই কথাটা কত সত্য তা হাড়ে হাড়ে টের পেতো কৃষকেরা, ব্যবসায়ী আর কারিগর শ্রেণী। তাই এইসব কৃষক কারিগরদের বোকা বানাবার জন্য এবং তাদের বোকা বানিয়ে নিজেদের শক্তি বৃদ্ধির জন্য এই বিরোধকে সর্ব্বসাধারণের অর্থাৎ ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে সকলের বিষয় করে তোলার উদ্দেশ্যে ধর্মের মুখোশ পরানো হতো, অর্থাৎ কখনও কখনও ধর্মীয় বিরোধ বলে চালানো হতো। যেহেতু বৈষয়িক ব্যাপারগুলি ছিল বহুক্ষেত্রে ধর্মের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। এই কৌশল গ্রহণ করে নিজেদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করা সহজ হয়ে উঠতো। শ্রদ্ধেয় মুখিয়া লিখেছেন ঃ "প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক কারণে শাসকশ্রেণীর মধ্যে যে আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব দেখা যায় তাকে প্রায়ই ধর্মীয় বা আদর্শগত রূপ দেওয়া হয়েছে।" (পূর্ব্বোল্লিখিত ৪৩-৪৪ পৃঃ)। এ-গুলি যে ধর্মীয় বিষয়-সংক্রান্ত যুদ্ধ ছিল না—তার আরো একটি প্রমাণ, এই বহু বিরোধের পরও উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে দাঙ্গাহাঙ্গামা বাধবার কোন খবর পাওয়া যায় না। তাই শ্রদ্ধেয় মুখিয়া বলেছেন ঃ "একটি বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ ব্যাপার আমাদের লক্ষ্য করা উচিত। সপ্তদশ শতকে যখন মারাঠা, শিখ ও জাঠ অভ্যুত্থান দেখা দিলো এবং মোগল রাষ্ট্রের সঙ্গে মারাঠী ও শিখদের প্রচণ্ড সংঘর্ষ বাধলো তখনো কিন্তু সামাজিক জীবনে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়নি। এমনকি, ঔরঙ্গজেবের সর্ব্বাধিক স্বৈরাচারের পর্বেও হয়নি।........
মারাঠা, শিখ, জাঠ অভ্যুত্থানের প্রকৃত কারণ ছিল অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক, কিন্তু ধর্মীয় নয়, ... " (পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ ৫১-৫২ পৃঃ)।

শিখ নেতা বান্দা সিংয়ের যুদ্ধ সম্পর্কে শ্রদ্ধেয় গান্দা সিং তাঁর A Brief account of the Shikh People-এ লিখেছেন ঃ "Although he (Banda Singh – writer) was then himself pursued from place to place, he would not let his struggle assume the shape of a communal strife. His was a political struggle for emancipation of his country from the tyranny of Mughols who happened to be Muslim by faith".

মুসলমান ওমরাহরা কি সুলতানদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতেন না? করতেন। হিন্দু জমিদাররাও ঠিক একই কারণে একই ধরনের কলহ বিবাদে লিপ্ত হতেন। আবার এরকম নজিরেরও অভাব নাই যে—প্রয়োজন হলে সুলতানরা মুসলমান জায়গীরদারকে বিতাড়ন করে হিন্দু জায়গীরদারকে দায়িত্ব অর্পণ করতেন। এমনকি নিজেদের ঘনিষ্ঠ লোককেও তাড়ানো হতো। হুগলী জেলার ইতিহাস ও বঙ্গ সমাজে (৩য় খণ্ড) উল্লেখ করা হয়েছে ঃ অযোধ্যার নবাব সাদৎ আলি বেনারস প্রভৃতি বিরানব্বইটি পরগনা তাঁহার বন্ধু মীর রোস্তম আলীকে

বন্দোবস্ত করিয়া উক্ত প্রদেশের শাসনভার তাঁহার উপর অর্পণ করেন। রোস্তম আলি অলস ও রাজকার্য্যে অপটু ছিলেন বলিয়া নবাব (অযোধ্যার নবাব সাদৎ আলি—লেখক) তাহাকে অপসৃত করিয়া ১৭৩০ খৃষ্টাব্দে গঙ্গাপুরের জমিদার মনসারাম সিংহকে তৎপদে নিযুক্ত করেন।" (১১১১ পৃঃ)

আবার দেখা যায় হিন্দু রাজাদের মধ্যে প্রবল সংঘর্ষ। ঐ গ্রন্থেই উল্লেখ করা হয়েছে যে রাজা বলবন্ত সিংহ স্থানীয় সর্দারগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলে "ডোভী পরগণার অন্তর্গত হরিহরপুরের রাজা বিষ্ণুদাসের সহিত তাহার সংঘর্ষ হয় এবং কথিত আছে যে, হিয়াতী সিংহ নামক জনৈক ব্যক্তি ফৈজাবাদের পথে মনসারামকে নিহত করেন।" আবার দেখা যায় রাজা বিষ্ণুদাসকে ৫ শত অনুচর ও ১00 ব্রাহ্মণ সঙ্গে নিয়ে নবাব সাদৎ আলির রাজ্য ত্যাগ করে নবাব মুর্শিদ কুলি খাঁর রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করতে।

কিন্তু সবেরই মূলে ছিল বৈষয়িক স্বার্থ, রাজস্বের প্রাপ্য অংশ অথবা রাজনৈতিক ক্ষমতার ভোগ-দখল ইত্যাদি। কেউই পশ্চাদপদ হতোনা কৃষক কারিগরদের শোষণ লুণ্ঠন করে নিজেদের আয়ের পরিমাণ বাড়াতে এবং ভোগ বিলাস বহুল জীবনযাত্রা নির্ব্বাহে। তৃতীয়ত—রামমোহন একজন ইসলাম ধর্মাবলম্বী সাধারণ মানুষ ও মুসলমান শাসন কর্ত্তাকে এক ও অভিন্ন করে ফেলেছেন এমনভাবে মনে হবে যেন শাসকবর্গের রাজনীতি নির্ধারিত হত সমগ্র মুসলমান সম্প্রদায়ের স্বার্থে। কিন্তু একথা সর্ব্বজন বিদিত যে একই ধর্মে বিশ্বাসী হলেও শাসকবর্গের স্বার্থ আর সাধারণ মানুষের স্বার্থ এক হয়ে যায় না। আর সাধারণ মানুষের স্বার্থে শাসকশ্রেণীর নীতিও নির্ধারিত হয়না। যে কোন শ্রেণী বিভক্ত সমাজে বিবদমান শ্রেণীগুলির স্বার্থ যে এক নয় আমরা তা পূর্ব্বেই উল্লেখ করেছি। শাসক আর শাসিত, শোষক আর শোষিতের স্বার্থ পরস্পর বিরোধী। একে অন্যের শ্রেণীশত্রু। শোষিত শ্রেণীকে দমন করে রাখার জন্য শাসক শ্রেণী প্রয়োগ করে থাকে তার রাষ্ট্র শক্তি। তাই রাষ্ট্র শক্তি হাতছাড়া হয়ে গেলে তারা আর শাসক শ্রেণী থাকে না। সাধারণ মুসলমান জনগণ শোষিত শ্রেণীরই একটি অংশ। ধর্ম তার এই শ্রেণী চরিত্রকে বিলোপ সাধন করতে পারে না। "প্রকৃত পক্ষে উচ্চ স্তরের মুসলমানরা নিম্নশ্রেণীর মুসলমানদের সর্ব্বান্তকরণে ঘৃণা করতেন।" এই ঘৃণার উৎস অর্থনৈতিক বৈষম্য আর এই কারণেই নিম্নশ্রেনীর মুসলমানরাও ঘৃণা করতেন উচ্চস্তরের মুসলমানদের। এ ঘৃণা মুসলমানকে মুসলমান হিসেবে নয়, এ ঘৃণা একটি শ্রেণীর প্রতি অন্য শ্রেণীর ঘৃণা। অনুরূপভাবে একজন মুসলমান কৃষক ঘৃণা করে থাকে হিন্দু জমিদারকেও হিন্দু হিসেবে নয়, শ্রেণী শত্রু হিসেবে। তাই আমরা দেখি—কোনো সম্রাটের আমলেই মুসলমান প্রজার অবস্থা ভালো ছিল না হিন্দু প্রজাদের চেয়ে। তাই মোগল সম্রাটদের বিরুদ্ধে শিখদের যুদ্ধে শিখদের পক্ষে যোগদান করেছিলেন বহু মানুষ—যারা মুসলমান ধর্মে বিশ্বাসী।

হিন্দুদের মতই সমান ভাবে শোষিত ও লুণ্ঠিত হয়েছে জায়গীরদার আর জমিদারদের দ্বারা। তাই দেখা যায় উভয় সম্প্রদায়ের শ্রমজীবি মানুষ শাসক শ্রেণীর সমস্ত ভেদনীতি ব্যর্থ করে মিলিতভাবে অস্ত্র তুলে ধরেছে শত্রু পক্ষের বিরুদ্ধে।

তাই আমরা দেখতে পাই সমগ্র প্রাক-বৃটিশ যুগের ইতিহাসও শ্রেণী সংগ্রামেরই ইতিহাস; সামন্ত প্রভুদের—জমিদার, জায়গীরদার আর তাদের সর্বোচ্চ শাসনকর্তার বিরুদ্ধে সমস্ত শ্রেণীর উৎপীড়িত জনগণের সংগ্রামের ইতিহাস—শ্রেণী সংগ্রামের ইতিহাস। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামার কলঙ্কিত ইতিহাস নয়। বরং উভয় সম্প্রদায়ের শ্রমজীবি জনতার ঐক্য গড়ে তোলার, ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যাবার ইতিহাস। ভারতের প্রতিক্রিয়াশীল ও জনগণের শত্রুদের পক্ষে এই ইতিহাসকে চিরকাল বিকৃত করে পরিবেশন করা সম্ভব হবে না। সংগ্রামী শ্রমজীবি জনগণ তাদের এই অপচেষ্টা শ্রেণীশত্রুদের ধ্বংস করেই ব্যর্থ করে দেবে এবং আজ হোক কাল হোক জনগণের শত্রুদের কড়ায় গন্ডায় তাদের সমস্ত প্রকার "অপচেষ্টার" মূল্য পরিশোধ করতে হবে। দালাল বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবিরা মহারাষ্ট্র নায়ক বীরযোদ্ধা শিবাজীকে একটি বিশেষ ধর্মীয় সম্প্রদায়ের "নায়ক" রূপে জনসমক্ষে উপস্থিত করে থাকেন। তাঁদের উদ্দেশ বুঝতে অসুবিধা হয় না দেশের প্রগতিশীল মানুষের পক্ষে। এইভাবে ভারতের মাটিতে ইংরেজদের সেই পুরোনো "ভেদ-বিভেদ সৃষ্টি করে শাসন করো" নীতির অনুগামী সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ জিইয়ে রেখে শ্রমজীবী জনগণের-শ্রমিক কৃষকের অভ্যুত্থানের মূলে কুঠারাঘাত করতে চায় তারা। ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে ফেলতে চায় বিপ্লবী জনগণের ঐক্যকে। এই দালাল বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবিরাই হলো প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলির রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বাহিনী। প্রকৃতপক্ষে দেখা যায় মহারাষ্ট্র নায়ক শিবাজী ছিলেন সামন্ত শোষক শ্রেণীরই শত্রু। ছিলেন নিপীড়িত শ্রমজীবি জনতার নেতা—কৃষক, কারিগর শ্রেণীর মুক্তি যুদ্ধের সর্বাধিনায়ক। তাঁর নেতৃত্বে গড়ে উঠেছিল নিপীড়িত কৃষকদের সংগ্রাম; সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামার রূপ গ্রহণ করেনি তা কোনোদিন; এছিল রাজনৈতিক আন্দোলন শিখদের আন্দোলনেরই মত। যে ভক্তিআন্দোলন গড়ে উঠেছিলো সারা ভারতবর্ষ জুড়ে, তারই ঢেউ প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল মহারাষ্ট্রেও। ভক্তি আন্দোলনের ভাবধারাতেই পরিপুষ্ট হয়ে উঠেছিলো মারাঠা কৃষক আন্দোলন। ভক্তি আন্দোলন বা অনুরূপ সংস্কার আন্দোলন ধর্মীয় আবরণ গ্রহণ করলেও সেই আন্দোলন ছিল সামন্ত সমাজের শ্রেণী বৈষম্যের, সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি আর বিভিন্ন দমন পীড়ণমূলক বিধি ব্যবস্থার বিরুদ্ধে। এইসব আন্দোলনের প্রধান বাণী ছিলো—মানুষে মানুষে মিলন, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে মিলন। সেই আন্দোলন ছিল পুরোহিত তন্ত্র ও পীর-পয়গম্বর বিরোধী। সকল মানুষের গ্রহণযোগ্য এক নতুন সভ্যতা সংস্কৃতি গড়ে উঠছিল এই সব আন্দোলনকে কেন্দ্র করে। মারাঠা

আন্দোলন সেই ভক্তি আন্দোলনেরই অনিবার্য পরিণতি। তাই দেখা যায়ঃ "The backbone of Shivaji's army was composed of the peasantry who belonged to two low castes named Maratha and Kumbi." (P 18 Jadunath Sarkar—Shivaji and His time) গ্রামীণ সমাজে নিম্ন বর্ণের যে শ্রমজীবি জনগণ নির্যাতীত হতো উচ্চ বর্ণের ধনী অভিজাত শ্রেণীর দ্বারা—যাদের ঘৃণিত শত্রু ছিল ওই উচ্চবর্ণের ধনী অভিজাতরা—সেই শ্রমজীবি জনগণকেই সংগঠিত করেছিলেন শিবাজী যদিও তাঁর জন্ম জমিদার শ্রেণীর পরিবারে। তাই সেই অমর "মহারাষ্ট্রীয় বীর শিবাজী লুণ্ঠিত ধনরত্ন সাধারণের সম্পত্তি বলিয়া বিবেচনা করিতেন এবং তিনি যাহারা এইরূপে লুণ্ঠন কার্য্যে বিশেষ পারদর্শী তাহাদিগকে কেবল পুরস্কৃত করিতেন না তাহাদের উচ্চ পদ দিতেন।"(হুগলী জেলার ইতিহাস ও বঙ্গ সমাজ—২য় খন্ড ৭০৪ পৃঃ) শিবাজীর লড়াই ছিল নির্যাতীত-দরিদ্র শ্রমজীবি জনগণের লড়াই তাদের শ্রেণী শত্রুদের বিরুদ্ধে। এ-লড়াই মুসলমানদের বিরুদ্ধে হিন্দুদের লড়াই নয়। মামুলি ধর্মযুদ্ধও নয়। মারাঠাদের এ-লড়াই প্রথম শুরু হয়েছিল মারাঠা পন্ডিত রামদাসের নেতৃত্বে সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে। রামদাস ছিলেন ভক্তি আন্দোলনের প্রখ্যাত নায়ক। শিবাজীর লড়াই আওরঙ্গজেবের আমলেই শুরু হয়নি, শুরু হয়েছে শাহজাহানের আমল থেকে। "In Maharastra under the leadership of their Great leader Shivaji the people were already fighting against Mughal tyranny from the time of Shahjahan's Rule." সেদিন মারাঠা জনগণের মধ্যে বৈপ্লবিক ভাবধারা বয়ে এনেছিলেন একনাথ, রামদাস, তুকারাম প্রমুখ পন্ডিত ব্যক্তিগণ—যাঁরা ছিলেন নিম্নশ্রেণীর দরিদ্র ব্যবসায়ী সম্প্রদায়। বলা হয়েছেঃ "... the Marathas, being inspired by the teachings of the Bhakti Movement, were imbibed with a new spirit of "Self reliance", courage, perseverence, a Stern Simplicity, a rough straight forwardness, a sense of Social equality and consequently pride in the dignity of man as man" quoted from Rise and Fall of E. I. Comp. P 142) অনুমান স্বার্থসংশ্লিষ্ট মহল থেকে এই মহারাষ্ট্রীয় সংগ্রামী জনগণের সংগ্রামের নাম দেওয়া হয়েছিল 'বর্গীর হাঙ্গামা'। এই 'বর্গীরাই' যেমন বাংলার ধনীদের আক্রমণ করেছিলেন তেমনি শিখদের সঙ্গে মিলিত হয়ে আক্রমণকারী আফগানদের বিতাড়িত করেছিলেন শিরহিন্দ এবং লাহোর থেকে।

বলা হয়েছে "একবার বর্গীরা বাঁশবেড়িয়া রাজের গড়বাটী অবরোধ করিয়াছিল।" "It had a fort mounted with four pieces of cannon and surrounded by a trench when the Marathas came near

Tribeni the people fled hither for protection." (হুগলী জেলার ইতিহাস ও বঙ্গ সমাজ—২য় খণ্ড, ৭০৪ পৃঃ)।

"বর্গী" নাম দিয়ে মহারাষ্ট্রের সংগ্রামী জনগণের যতই কুৎসা রটনা করা হোক তাঁদের আক্রমণের লক্ষ্যমুখের দিকে তাকালে সহজেই বোঝা যায় এ আক্রমণ সামন্ত প্রভুদের বিরুদ্ধে। আক্রমণের মুখে পড়ে "কেহ গাড়ীতে, কেহ পাল্কিতে, কেহ হাতীতে, কেহ ঘোড়ায়, কেহ নৌকায় পলাইতেছে।

....মহাধনীরা যখন যাইতেছেন, তাঁহাদের ঘরের যতকিছু মূল্যবান বস্তু সব সঙ্গে লইয়া যাইতেছেন। ব্রাহ্মণগণ যাইতেছেন—তাহাদের কেউ চঞ্চল বালক, গলদেশে গৃহদেবতা শালগ্রাম শিলা ঝোলান ...." (ঐ গ্রন্থ)। "বর্গীর হাঙ্গামায় রাঢ়দেশে বহু সম্পন্ন গৃহস্থকে দেশ ত্যাগ করিয়া গঙ্গার অপর পারে আসিয়া বাস করিতে হইয়াছিল।" (ঐ গ্রন্থ ৭৩৫ পৃঃ)। নবাব আলীবর্দী আক্রান্ত হলে তিনি বাধ্য হন মারাঠা বিদ্রোহীদের সঙ্গে সন্ধি করে তাদের বশ্যতা স্বীকার করতে। "সন্ধি করেন যে তিনি বাৎসরিক ১২ লক্ষ টাকা করিয়া তাহাদের কর দিবেন।" (ঐ গ্রন্থ)। আরো দেখা যায়ঃ "বর্গী সেনাপতি শিবরাও হুগলী লুণ্ঠন করেন। মীর হবিব হুগলী অধিকার করিবার জন্য বর্গীদের সহিত যোগ দেন এবং তিনি মীর আবুল হাসান ও আবুল কাশিম নামক দুইজন বণিকের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া বর্গীদের সাহায্যে হুগলী কিছুদিনের জন্য নিজ অধিকারে রাখেন।" (ঐ গ্রন্থ ৬৪৮ পৃঃ)

আবার পাঞ্জাবে দেখা যায় "The combined forces of the Sikhs and Marathas (invited by Adina Beg) drove Afgans away from Sirhind and Lahore in March April 1758." (A Brief Account of the Shikh People by Ganda Singh, p. 43)

এ কি কোনো বিশেষ ধর্ম রক্ষার লড়াই হতে পারে? এক ইংরেজ কবি লিখেছেন ঃ 'The "Burgees" were like brothers, In the brave days of old.' (হুগলী জেলার ইতিহাস, ২য় খণ্ড, ৭০৪ পৃঃ)। উপরিলিখিত বিবরণগুলি থেকে কি একথা বুঝতে অসুবিধা হয় মহারাষ্ট্রীয় বিদ্রোহীদের ধ্যানধারণা পুরোহিত তন্ত্র বিরোধী, সামন্ত তন্ত্র বিরোধী এক নতুন সভ্যতার অবদান। শিবাজী ছিলেন প্রগতিশীল ভাবধারায় পরিপুষ্ট আন্দোলনের নেতা। তাই সমুদ্র পথে বাণিজ্যের প্রতিও ছিল তাঁর দৃষ্টি। শুধু তাই নয়, অনুমান বিদেশীদের হাত থেকে দেশকে মুক্ত করাও ছিল তাঁর লক্ষ্য। এ-জন্যে একটি নৌবাহিনীও গড়ে তুলেছিলেন। ভারতবর্ষের সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলির শুনতে ভালো লাগবে না যে সেই নৌবাহিনীর সর্ব্বাধিনায়ক ছিলেন একজন মুসলমান। (Administration system of Maratha by S. N. Sen).

আমাদের দেশে মন্দির মসজিদ ভাঙ্গার প্রশ্নটি আমাদের দেশের ইতিহাসের অন্যতম একটি মূল প্রশ্ন করে তুলেছিল ইংরেজরা। ইতিহাসের নামে—হিন্দু

মুসলমানের মধ্যে বিদ্বেষ সৃষ্টির উপাদানে পূর্ণ করা তাদের বিবরণগুলিকে আজো নির্বিচারে ইতিহাসের মর্যাদা দেওয়া হয়ে থাকে। বদ বুদ্ধিজীবিরা কখনই ইতিহাসের মূল প্রশ্নগুলি নিয়ে আলোচনা করতে চায় না। উপস্থিত করতে চায় না সমাজ বিকাশের মূলে যে কারণগুলি সক্রীয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিল সে গুলি। আক্রমণকারী ইংরাজদের দিক থেকে জনগণের দৃষ্টি সাম্প্রদায়িক প্রশ্নের দিকে সরিয়ে দেবার উদ্দেশ্যে ইংরাজ যে ইতিহাস লেখার নামে 'জঘন্য চক্রান্ত' করেছিল, এ-দেশের প্রতিক্রিয়াশীলরা তার বিরুদ্ধে নিন্দা করা দূরের কথা, সে-সম্পর্কে একটি কথাও উচ্চারণ করতে চায় না। শ্রদ্ধেয় এম, মুজিব উল্লেখ করেছেন : "Ibn Battutah found a muslim who was a desciple of the yogis and in a town in the central India he came across Muslims who went arround with yogis hoping to learn things from them. The Futuhat-i-Faruzshahi mentions Sects that had sprung up as the result of Hindu Missionery effort and had gathered Hindus and Muslims, men women within their fold. With the growth of the Bhakti movement, the member of muslims seeking spiritual fulfilment in accordance with the Hindu tradition became very marked. In Sikandar Lodi's reign, while we have an instance of a Brahmin being executed for saying that Islam was a true religion and still refusing to accept it, we have also the instance of a Hindu named Brahmin who offered instruction in their traditional sciences to Muslim students" (Indian Muslim by M. Mujib, P 233-234)

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে উপরে যে যোগীদের কথা বলা হয়েছে তাঁরা আর কেউ নন—তাঁরাই ছিলেন সেদিনের নতুন মানবতাবাদী মতাদর্শের প্রচারক। বহিরাগতদের সকলেরই ধারণা ছিল ভারতবর্ষ শুধু মাত্র হিন্দু আর মুসলমানের দেশ। কিন্তু এদেশে যে নতুন মতাদর্শের ভিত্তিতে নতুন এক মানব সমাজ গড়ে উঠছিল—হয় ইবনে বতুতা অথবা ফিরোজশাহী বুঝতে পারেননি অথবা তারা সে-রকম একটা কান্ড ঘটতে পারে তা বিশ্বাসই করেন নি প্রথম থেকে। শাসক শ্রেণী ভেদ-বিভেদ সৃষ্টি করে সেই ঐক্যবদ্ধ ভারতবর্ষ সৃষ্টির পথে বাধা সৃষ্টি করতে বিরত ছিলেন না। কিন্তু সেদিনের শ্রমজীবি জনতা তাঁদের সে অপচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত করেছে। তারই একটি দৃষ্টান্ত আউরঙ্গজেবের আমলের একটি ঘটনা "In 1665 Aurangzeb introduced religious discremination by charging 5 percent on goods imported and exported by Hindus and $2\frac{1}{2}$ percent on those by the Muslims. Not

content with this he remitted the custom duties on Muslim in 1668 To make good the loss the duties on the Hindus were raised to 5 percent. Some times about 1672 this was found unworkable—Muslim traders imported and exported the goods belonging to Hindu traders free charging a 'consideration' for their services. This probably led to the reduction of the duty on the Hindu at 2½ percent. But in 1680 the duties on the muslims were again imposed an 2½ percent and raised on the goods of the Hindu merchants to 5 perent." (৩২) মনে রাখতে হবে যে শাসক শ্রেণীর স্বার্থেই রাষ্ট্র-নীতি নির্ধারিত হয়। সাম্প্রদায়িক স্বার্থে নয়। তাই হিন্দু মুসলমান উভয় শাসক শ্রমজীবি জনতার এই ঐক্য বা ঐক্যবোধকে সহ্য করতে পারেনি। কেননা তারা উভয়েই জনগণের শত্রু।

ইতিহাসের নামে বহু তথ্য বা বিবরণ পরিবেশন করে গেছে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইংরাজরা অথবা তাদের বেতনভূক দেশীয় কর্মচারীরা বা দালাল বুদ্ধিজীবিরা। এইসব লোকদের তথ্য বা বিবরণের উপর নির্ভর করা বিপজ্জনক। তাহলে আমরা কোনদিনই সত্য উদ্ঘাটন করতে পারবো না। কয়েকটি দৃষ্টান্ত এখানে তুলে ধরবার চেষ্টা করবো। ভারতবর্ষে ইংরাজ বিরোধী সংগ্রামগুলিকে, তার সংগ্রামী জনতাকে এবং নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের বৃটিশ শাসকবর্গ সম্পূর্ণ বিকৃত ভাবে চিহ্নিত করে এসেছে। এই সংগ্রাম গুলিকে চিহ্নিত করেছে "দাঙ্গা হাঙ্গামা" "লুণ্ঠন" "ডাকাতি" "রাহাজানি" "খুন খারাপি" "দস্যুতা" "হত্যা" "ব্যক্তিহত্যা" "গণহত্যা" ইত্যাদি ; সংগ্রামী জনতাকে "দাঙ্গাহাঙ্গামাকারী" "ডাকাত" "দস্যু" "দুর্বৃত্ত" "সমাজবিরোধী" "লুন্ঠন কারী" "বর্গী" "খুনী" "চোর" "ঠগ"; নেতাদের 'দস্যু সর্দার' 'আসামী' ইত্যাদি নামে। ইংরাজ শাসনের বিরুদ্ধে অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগে দেশের স্বাধীন ব্যবসায়ী বুর্জোয়াদের নেতৃত্বে জনগণ যুদ্ধ ঘোষণা করলে ইংরেজ আর তাদের বেতনভুক লেখকরা ব্যবসায়ী বুর্জোয়াদের অভিহিত করলো "সন্ন্যাসী" ও 'ফকির' নামে। বিদ্রোহীদের নাম দিল হিন্দুস্থানের "যাযাবর", 'দস্যু ডাকাত' লুন্ঠনকারী ইত্যাদি। আবার ওয়াহবী মুক্তি যোদ্ধাদের নাম দেওয়া হলো 'ধর্মান্ধ', "ধর্মোন্মাদ" মুসলমান, বিদ্রোহকে বলা হলো "হিন্দু বিদ্বেষী" সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা" "ধর্মোন্মাদ মুসলমানদের কান্ড" "সাম্প্রদায়িক আক্রমণ" "ধর্মযুদ্ধ" ইত্যাদি। ইতিহাসকে বিকৃত করার একটি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত হলো : অন্ধকূপ হত্যার কাহিনী। নবাব সিরাজুদ্দৌলার হত্যাকে দুনিয়ার মানুষের চোখে ন্যায়সঙ্গত করে তোলার জন্য ইংরেজরা রটনা করলো যে নবাব সিরাজুদ্দৌলার নির্দেশে

একটা ক্ষুদ্র গৃহের মধ্যে বন্ধী করে বহু নিরীহ ইংরাজ নরনারীকে বিনা অপরাধে হত্যা করা হয়েছে। স্বর্গীয় অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় মহাশয় অক্লান্ত পরিশ্রম করে বিভিন্ন তথ্য ও প্রামাণ্য দলিল উপস্থিত করে প্রমাণ করলেন— এ কাহিনী ইংরেজদের মস্তিস্ক প্রসূত। আদৌ সত্য নয়। এ-ধরণের ঘটনার সঙ্গে আদৌ সম্পর্ক ছিলনা নবাবের। আর একটি নমুনা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। হুগলী জেলার জাফর খাঁ গাজির মসজিদ সম্পর্কে ব্লকম্যান নামে এক ইংরেজ সাহেব লিখেছেন ঃ

The first which lies near the road leading along the bank of the Hugli, is built of large basalt stones said to have been taken from an old Hindu Temple which Zafar Khan destroyed. It's east wall which faces the river shows clear traces of mutilated Hindu idols and dragons and fixed into it at a height of about six feet from the ground, is a piece of iron said to be the handle of Zafar Khan's battle axe." (Journal of the Asiatic Society of Bengal 1870--quoted from Hugli Zelar Itihas and Banga Samaj p 778 2nd part) শ্রদ্ধেয় সুধীর কুমার মিত্র মহাশয় লিখেছেন ঃ "মসজিদের উপরিভাগে হিন্দু স্থাপত্যের অনেক নিদর্শন দেখা যায়। প্রত্যেক দুয়ারের উপর খিলানে অর্ধচন্দ্রাকারে বহু কারুকার্য্য খোদিত এবং এর মধ্যে অধিকাংশই হিন্দু দেব-দেবীর মূর্ত্তি।....মসজিদে গদাধরী বিষ্ণু মূর্ত্তি ও দেওয়ালে চারটি সাধুর মূর্তিও দেখতে পাওয়া যায়। (হুগলি জেলার দেব দেউল—২০৫ পৃঃ) ঐ গ্রন্থেই ২০৬ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হয়েছে, "ব্রাহ্মণ্য দেবদেবীর মূর্তিছাড়া ঐমসজিদের দেওয়ালে চারটি সাধুর মূর্তি আছে। ঐ মূর্তিগুলির মধ্যে একটি বৌদ্ধমূর্তি ও একটি পার্শ্বনাথের মূর্তি বিদ্যমান।" দেখা যায় কবি কিঙ্কন মুকুন্দ রাম চক্রবর্তী তাঁর 'চণ্ডিকাব্যে' গাজি সাহেবের মহিমা কীর্তন করে বন্দনা করেছেন। তাতে লেখা হয়েছে ঃ "পাজোয়ায় বন্দিয়া যাবো শুভি খাঁ পীরে। দফর খাঁ-গাজিরে বন্দো ত্রিবেণীর ধারে।। গঙ্গা তুলসি বন্দো কলির দেবতা। যাহার গুণ গাহে ভাই ভগবত কথা।। (ঐ গ্রন্থ ১৮৭ পৃঃ) আবার রূপরাম চক্রবর্তী তাঁর ধর্মমঙ্গল কাব্যে একইভাবে গাজিসাহেবের বন্দনা করে লিখেছেন "ত্রিপণীর ঘাটে বন্দো দফর খাঁ গাজি। তাহার মোকামে বন্দো ষোলশত কাজি।। আরো একজন কবি, নাম মহিউদ্দিন ওস্তাগর, তাঁর "পান্ডুয়ার কেচ্ছা" কাব্যে গাজি সাহেবের মহিমা কীর্তন করে লিখেছেন ঃ "জাফর খাঁ গাজি রহিল ত্রিবেনী স্থানে। গঙ্গা যারে দেখা দিল ডাক শুনি কানে।। (ঐ গ্রন্থ ২০৯পৃঃ) শ্রদ্ধেয় মিত্র মহাশয় আরো উল্লেখ করেছেন ঃ "জাফর গাজি....ভিখারি দাশের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং তাঁর কাছে তিনি সংস্কৃত ও হিন্দুশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন।" শ্রদ্ধেয় মিত্র মহাশয় অন্য একস্থানে লিখেছেন যে "দরাফ গাজি....গঙ্গা স্তোত্র লিখিয়া প্রসিদ্ধ হন। দরাফ গাজি ত্রিবেনীর জাফর খাঁ গাজি বলিয়া প্রসিদ্ধ।" (৭১৮পৃঃ

হু. জে. ইতিহাস ২য় খন্ড) আজো জাফর গাজীর প্রতি পরম শ্রদ্ধা অসংখ্য হিন্দু মুসলমানকে তার সমাধিক্ষেত্রে আকর্ষণ করে থাকে। তৎকালীন উভয় সম্প্রদায়ের উচ্চ সংস্কৃতিবান ও সাহিত্য রচয়িতাদের পরম শ্রদ্ধেয় এমন একজন ব্যক্তি কি কারণে একটি মন্দির ভেঙ্গে মসজিদ বানাবেন আর কেনইবা তা করবেন? তা আমাদের বুদ্ধির অগম্য। তাছাড়া মূর্তি খোদিত 'মসজিদে' মুসলিম ধর্ম বিশ্বাসীদের উপাসনা করা নিষেধ! তাঁরা মূর্তি পূজার বিরোধী। তাহলে মসজিদের সীমানায় সে মূর্তি রাখা হবে কেন? তাছাড়া যিনি হিন্দু মন্দির ভাঙতে কুন্ঠিত নন এমন সংকীর্ণ চিত্তের রক্ষণশীল ধর্মবিশ্বাসী "গঙ্গা স্তোত্র" লিখবেন কি কারণে? তিনি আবার ভিখারী দাসের শিষ্য। আগেই ভক্তি-আন্দোলনের কথা বলেছি। দ্বাদশ শতাব্দী থেকে তৎকালীন ভারতে ভক্তি আন্দোলন, সুফী আন্দোলন ও অনুরূপ বিপ্লবী ভাবধারায় পরিপুষ্ট আন্দোলনের ঝড় বয়ে গেছে। এই আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল প্রচলিত ধর্ম বিরোধী। এই সব আন্দোলনের সামনে ছিল নতুন মানবতাবাদী আদর্শ। সেদিন যে-সব মহান ব্যক্তি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষকে নতুন মানবতাবাদী আদর্শে অনুপ্রাণীত করে নতুন মানব সমাজ গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন; গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন সমস্ত মানুষের মিলন ক্ষেত্র—নতুন ভারতবর্ষ; নিঃসন্দেহে, ভিখারি দাস, জাফর গাজী, মুকুন্দ রাম চক্রবর্তী, রূপরাম চক্রবর্তী, মহিউদ্দিন ওস্তাগার এরা সকলেই ভক্তিমতবাদ ও সুফীমতবাদের অনুগামী। এই অঞ্চলে অর্থাৎ হুগলী জেলায় বৈষ্ণব আন্দোলনের ঢেউও চিন্তার জগতে নতুন আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। তাই দেখি গঙ্গা আর জাফর গাজি এক ও অভিন্ন হয়ে গেছে। এঁরা কেউই হিন্দু নন, মুসলমানও নন। এ মসজিদ মুসলমানদের উপাসনার ঘর হতে পারে না। এ ঘর হতে পারে ভক্তি ও সুফীমতবাদিদের উপাসনার মন্দির। তাই বিভিন্ন দেব দেবতার সমাবেশ। এ-মসজিদও নয় মন্দিরও নয়; এ হচ্ছে সমস্ত মানুষের মিলন মন্দির—এ মন্দির যদি কেউ বানিয়ে থাকেন তবে বানিয়েছেন তাঁরাই—যাদের কাছে মন্দির মসজিদের প্রযোজন হয় না ঈশ্বরকে পেতে হলে কিন্তু কোন মন্দির ভেঙ্গে তা বানানো হয় নি। বিভিন্ন দেব দেবির ভক্তদের এ-মিলন মন্দির—তাই বিভিন্ন দেব-দেবীর মিলন ঘটেছে এই মন্দিরে। তাই বিভিন্ন দেব দেবীর মূর্তি; তা না হলে জাফর গাজির মত বিচক্ষণ ব্যক্তিদের পক্ষে না বুঝবার কারণ নেই যে কোন সম্প্রদায়ের মন্দির ভেঙ্গে সেই সম্প্রদায়ের হৃদয় জয় করা যায় না। তাতে আক্রমণ কারীর প্রতি ঘৃণাই সৃষ্টি হয় এবং সেইভাবে কাউকে ধর্মান্তরিত করা যায় না। অন্য সম্প্রদায়ের শ্রদ্ধা অর্জন করা দূরের কথা। তাছাড়া আরো একটি প্রশ্ন ওঠে—হিন্দু মন্দিরে বৌদ্ধ ও পার্শ্বনাথের মূর্তি খোদিত হবে কি কারণে? আবার মন্দির ভাঙ্গার নানা কারণও থাকতে পারে। ধন সম্পদ লুন্ঠনও একটি কারণ। যুদ্ধের সময়ও এমন জঘন্য কান্ড যুদ্ধ পিপাসুরা ঘটাতে পারে। আবার এ সবস্থান শত্রুপক্ষের

চক্রান্তের বা অসৎ কোনো কাজের গোপন ঘাঁটি হয়ে উঠলে এ রকম ঘটনারও সম্ভাবনা থাকতে পারে।

সামন্ত শ্রেণী ও পুরোহিত শ্রেণীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামের সময় নতুন মতাদর্শী "সন্ন্যাসী" নামে অভিহিত তৎকালীন বিদ্রোহীরা যদি কোনো মন্দির লুন্ঠন করে থাকেন বা ভেঙ্গে থাকেন তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। কেননা এমন দৃষ্টান্তের অভাব নেই। বলা হয়েছে ঃ Tradition has it that during Nawab Alivardi Khan's time a body of Sannyasis looted the temple of Bhawani at Bhawanipur in the Bogra Dist. by the side of river Karotoya." (33P-Sannyasi and Fakir Raiders in Bengal.) জানা যায় আরব বণিকরা বহু পূর্বে ভারতবর্ষে এসে শান্তিপূর্ণভাবে ধর্মপ্রচার করে সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিলেন। তবে কেন মন্দির ভেঙ্গে ধর্মান্তরিত করতে হবে? আমরা দেখি যে-সম্রাট আওরঙ্গজেবকে বলা হয় সবচেয়ে হিন্দু বিদ্বেষী এবং ধর্মান্ধ, তিনিই আবার উমানন্দের মন্দিরের জন্য বিরাট জমি দান করছেন। ("ভারতীয় সভ্যতা ও সাম্প্রদায়িক সমস্যা"—দিলীপ বিশ্বাস,৩৯ পৃঃ) শ্রীকৃষ্ণের মন্দির তৈরীর জন্য বারো বিঘে জমি দানের যে ঘটনার কথা দিল্লীর পুরোনো কেল্লায় সংস্কৃত ভাষায় লেখা দলিলে উল্লেখ করা হয়েছে সে তো ধর্মান্ধতার পরিচয় নয়? (Foundation of Muslim Rule in India—A. B. M. Habibullah) আওরঙ্গজেব সতীদাহ প্রথা বন্ধ করেন। তাইবা করা হলো কেন? আরো জানা যায়, ফিরোজ তোগলোকের আমলে একটি শহরে ও তার চারপাশে এবং মালিয়া গ্রামের একটা পুকুর পাড়ে, সালিপুর ও কোহানা গ্রামে নতুন সব মন্দির তৈরী হতে এবং মূর্তিপুজো হতে দেখে ফিরোজশাহ নাকি বিলাপ করেছিলেন। যে আলাউদ্দিন নিজের ধর্মই পুরোপুরি মানতেন না, যা করতেন নিজের বুদ্ধি বিবেচনা অনুযায়ী তাহলে তাঁকেই বা ধর্মবিদ্বেষী বলা যায় কি করে। শ্রদ্ধেয় সুধীর কুমার মিত্র মহাশয় তাঁর "হুগলী জেলার ইতিহাস ও বঙ্গ সমাজ" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন ঃ "বাংলা দেশের যে সমস্ত গ্রামে প্রাচীন শিল্পকীর্তি এখনও অক্ষত অবস্থায় রয়েছে সেগুলির কোনটির ইতিহাস তিন চার শ বছরের বেশী পুরানো হবে না।.........বেশীর ভাগ মন্দিরই সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্ধ বা অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে নির্মিত। আটপুরের শিল্পকীর্তির সূত্রপাত এই সপ্তদশ অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ে।...........এই সমস্ত কীর্তি সৌধের মধ্যে প্রধান হচ্ছে.........ছোট বড় দেব মন্দির গুলি।.........সে সময়কার বাংলার গ্রামের ধর্মগত জীবন ও সংবাৎসরিক উৎসব অনুষ্ঠানের প্রাণকেন্দ্র ছিল এই সুপরিকল্পিত ও সুসজ্জিত দেবস্থানগুলি।" (১০১৮ পৃঃ) "পরম বৈষ্ণব মালাধার বসু "শ্রীকৃষ্ণ বিজয়" গ্রন্থ লিখে রাজা হোসেন শাহের কাছ থেকে "গুনরাজ খাঁ" উপাধি পান।" (ঐ গ্রন্থ ২য় খণ্ড ৭২৫ পৃঃ)।

আবার দেখা যায় খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে রাজা বিষ্ণুদাস হুগলী জেলায় হরিপালের কাছে রামনগরে পাঁচশত সশস্ত্র অনুচর ও একশত ব্রাহ্মণ সহ বসবাস করতে চাইলে নবাব মর্শিদকুলি খাঁ প্রায় দেড়হাজার বিঘা জমি দান করেন। (১১১০ পৃঃ হুগলীজেলার ইতিহাস ৩য় খন্ড) আরো উল্লিখিত হয়েছে ঃ জগন্নাথ মন্দিরের সেবায়েত "মন্দিরে আগত অতিথি হিসাবে নবাব ও তাঁর সঙ্গে আগত লোকজনদের বিশেষভাবে আদর করেন এবং জগন্নাথের ভোগ প্রসাদ দিয়ে তাঁদের তৃপ্তি দেন।....... দেবতাকে তিনি (নবাব—লেঃ) শ্রদ্ধাবশত প্রাত্যহিক সেবার জন্য শেওড়াফুলি রাজকর্তৃক জগন্নাথপুর মহালের রাজস্ব মকুব করার নির্দেশ দেন এবং সেবায়েত রাজীব চক্রবর্ত্তীকে ' অধিকারী ' উপাধিতে ভূষিত করেন।" (৭২ পৃঃ হুগলী জেলার দেব দেউল—সুধীর কুমার মিত্র) রাজা রামেশ্বর রায় মহাশয়ের কাজে সম্রাট আওরঙ্গজেব প্রীত হলে " ১৬৭৩ খৃষ্টাব্দে ' পঞ্চপাচা' খেলাত সহ রাজা-মহাশয় ' উপাধিতে তাঁহাকে ভূষিত করেন। এই সম্মান সূচক রাজোপাধি পুরুষানুক্রমে রক্ষা করিবার জন্য আর একখানি সনদ দ্বারা বংশবাটি গ্রামে ৪০১ বিঘা নিষ্কর ভূমি জায়গীর ও ১২ টি পরগণা তিনি জমিদারী স্বরূপ প্রাপ্ত হন। মিঃ এ, জি, বাওয়ার ' বাঁশবেড়িয়া রাজ ' গ্রন্থে লিখিয়াছেন ঃ

'We know of no family in India enjoying the title of 'Rajah Mahasaya' except Bansbaria Raj (History of Bansbaria' Raj)." (হুগলী জেলার ইতিহাস ৩য় খন্ড) মূল সনদের ইংরাজী অনুবাদ এখানে উল্লেখ করা গেল

" To Raja Rameswar Rai Mahasaya,
Pargana rsha, Sarkar Satgaon
(Govt. of Satgaon).

As you have promoted the great interest of Govt. in getting Possession of Parganas and making assessment thereof; and as you have performed with care whatever services were entrusted to you, you are entitled to reward. The Khelat of Punj Peicha (Five clothes i.e. dresses of honour) and the tittle of ' Raja Mahasaya ' are therefore given to you in recognition thereof, to be inherited by the eldest children of your family generation after generation without being objected to by anyone. 10 Safar 1090 Hijar." (ঐ গ্রন্থ ৭০১ পৃঃ থেকে গৃহীত) "রামেশ্বরের পর মামুদপুরের (যশোহর) সীতারাম রায়ও সাহসিকতার জন্য 'রাজা' উপাধি পাইয়াছিলেন।" " রাজা রামেশ্বর পরম ভাগবত ছিলেন এবং ১৬৭৯ খৃষ্টাব্দে বংশবাটিতে এক বিষ্ণুমন্দির নির্মাণ করেন।"

আবার নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ—বঙ্গের সুবাদার ; বাকী খাজনার দায়ে নদিয়ার ব্রাহ্মণ জমিদারকে অমানুষিক উৎপীড়ন করতে কুণ্ঠিত হননি।

উপরিলিখিত সমস্ত বিবরণ যদি সত্য হয়ে থাকে তাহলে আমরা কি বলতে পারি হিন্দু ধনী অভিজাত শ্রেণীর ধর্মাচরণের বা সম্পত্তি রক্ষার কোনো অধিকার ছিল না? প্রাক্তন শাসন কর্তাদের ভাবমূর্তি নষ্ট করার উদ্দেশ্যেই এঁদের বিরুদ্ধে ইংরেজরা যে কুৎসা রটায়নি কি করে তা অস্বীকার করা যাবে। তারই জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত ইংরাজদের বেতনভুক কর্মচারী বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের একটি উক্তি। "১৭৬৫ খৃষ্টাব্দের ১৪ই জানুয়ারী মিরজাফর দেহত্যাগ করিল……" (হুগলী জেলার ইতিহাস ও বঙ্গসমাজ - ২য় খণ্ড ৬৫১ পৃঃ) "তাহার পর নাজিমদ্দৌল্লা নবাব হন এবং তৎপরে (১৭৬৬-১৭৭০) নবাব মিরজাফরের পুত্রদ্বয় সেফাউদ্দৌলা ও মুবারকউদ্দৌলা ইংরেজ কোম্পানীকে শাসনভার দিয়া পেনশন প্রাপ্ত হন।" (পাদটিকা—ঐ গ্রন্থ ৬৫২ পৃঃ) ১৭৭০ খৃষ্টাব্দের ইংরাজ সৃষ্ট মন্বন্তরে (ছিয়াত্তরের মন্বন্তর) বাঙলার এক তৃতীয়াংশ লোক মারা গেলেও অমানুষিক জুলুম করে ইংরেজরা রাজস্ব আদায় করে। অথচ বঙ্কিম চন্দ্র লিখলেন: "তখন টাকা লইবার ভার ইংরাজের, আর প্রাণ সম্পত্তি রক্ষনাবেক্ষণের ভার পাপিষ্ঠ নরাধম বিশ্বাসহন্তা মনুষ্যকুলকলঙ্ক মিরজাফরের উপর। মীরজাফর আত্মরক্ষায় অক্ষম, বাঙ্গালা রক্ষা করিবে কি প্রকারে? মীরজাফর গুলি খায় ও ঘুমায়। ইংরাজ টাকা আদায় করে ও ডেসপাচ লেখে। বাঙালী কাঁদে আর উৎসন্ন যায়।" (আনন্দমঠ) এটাই বা কি করে ঘটলো?

আবার মোগল শাসন কর্তারা যদি ধর্মবিদ্বেষী হবেন তাহলে মোগল সম্রাট বাহাদুর শাহকে সিংহাসনে বসিয়ে হিন্দু রাজা, জমিদার, সৈন্য, ব্যবসায়ী, সন্ন্যাসী, কৃষক, কারিগর মুসলমান রাজা, জমিদার, সন্ন্যাসী, সৈন্য, ব্যবসায়ী কৃষক, কারিগরদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধভাবে অস্ত্রহাতে ইংরাজদের উপর যে ঝাঁপিয়ে পড়লো—এ অসম্ভব ঘটনাই বা সম্ভব হলো কি করে? স্বভাবতঃ অত্যাচার করার জন্য মন্দির ভাঙ্গার ঘটনা সাধারণ ঘটনা বলে মনে হয় না। প্রাকবৃটিশ ভারতের ইতিহাস তার প্রমাণ। কাজেই সমগ্র ব্যাপারটার বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে অনুসন্ধান করা ও সত্যকে উদ্ঘাটন করা প্রয়োজন। কোনো সিদ্ধান্ত অনুমান ভিত্তিক হওয়া উচিত নয়। প্রতিটি সিদ্ধান্ত যুক্তি গ্রাহ্য হওয়া উচিত। বিশেষ করে এই ধরনের একটি প্রশ্নে যা সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ভেদ বিভেদ সৃষ্টি করে জনগণের সংগ্রামী শক্তিকে ধ্বংস করে ফেলতে পারে এবং এটাই প্রতিক্রিয়াশীলরা চায়। বিশেষ করে এমন একটি দেশে যেখানে 'মার্কসবাদের' নামাবলী গায়ে দেয় অথচ তারাই আবার ইংরাজদের দালাল লেখকদের মুখোস টেনে ছিঁড়ে না ফেলে তাদের রঙীন জামা পরিয়ে রাজপথে টাঙ্গিয়ে রেখে ডুগডুগি বাজিয়ে তাদের লেখাগুলি ফেরী করে বেড়োয়।

আরো একটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ্যনীয়। দেশীয় স্বাধীন রাজা মহারাজারা বিদেশী আক্রমণকারীদের প্রতিরোধ করলেন না; করলেন সেই বিদেশী আক্রমণকারীদের কাছে আত্মসমর্পণ। আত্মসমর্পণ করেই তাঁরা ক্ষান্ত হননি, পরিণত হয়েছেন—তাদের সহযোগী শক্তিরূপে। কেন তাঁরা প্রতিরোধ করলেন না? তাঁদেরতো সামরিক শক্তির কমতি ছিল না। মনে করা দরকার যে বিদেশী আক্রমণকারীদের পক্ষে শুধুমাত্র সামরিক শক্তির জোরে একটি ভিন্ দেশ জয়লাভ করা সম্ভব কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী শাসন কায়েম করা কখনই সম্ভব নয়। এইসব রাজা মহারাজা রাণা বিদেশী আক্রমণকারীদের শাসন না মেনে নিলে, সহযোগী শক্তি হয়ে তাঁদের পক্ষে নিজের দেশের জনগণের বিরুদ্ধাচরণ না করলেন তাহলে তাঁদের প্রতিরোধ করা তুর্কি, আফগান ও মোগলদের পক্ষে মুষ্টিমেয় সৈন্যবাহিনীর সাহায্যে সম্ভব হতো না। তাই দেখা যায়, পূর্বোল্লিখিত 'রামেশ্বর রায়কে' সম্রাট আওরোঙ্গজেব 'রাজামহাশয়' উপাধিতে ভূষিত করলেন এই কারণে যে, তিনি "অন্যান্য জমিদারদিগের বিরুদ্ধে সৈন্য চালনা করিয়া তাহাদের জমিদারী দস্তগত (হস্তগত) করেন এবং যথা সময়ে রাজ সরকারে রাজস্ব প্রেরণ করেণ।" (হু, জে, ইতিহাস ২য় খণ্ড ৭০০ পৃঃ) আরো বিস্ময়ের কথা যে "বঙ্গের প্রাচীন রাজবংশের গৌরব স্তম্ভ স্বরূপ হিসাবে উক্ত সনন্দ ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলের 'ডকুমেন্ট গেলারী' তে ১লা সেপ্টেম্বর ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে সর্বপ্রথম রক্ষিত হইয়াছে।" (ঐ গ্রন্থ ৭০১ পৃঃ) অথচ আওরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে অভিযোগের অন্ত নাই। একজন অত্যাচারী রাজার দেওয়া সনদ কি করে গৌরব বৃদ্ধি করে তা বুদ্ধির অগম্য।

অবশ্য কি কারণে পূর্ব্বতন হিন্দু শাসকবর্গ বিদেশী আক্রমণকারীদের প্রতিরোধে সাহসী হতে পারেন নি তা বুঝতে বিলম্ব হয় না। তাঁরা সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন, সুদীর্ঘকাল সমাজের নব্বুই ভাগ শ্রমজীবি মানুষকে তাঁরা শোষণ লুণ্ঠণ আর উৎপীড়ণ করে এসেছেন, তাদের পশুর অধম করে রেখেছেন। স্বভাবতঃ তারা তাদের শ্রেণী শত্রুদের পেছনে দাঁড়াতো না। বরং তাদের অস্ত্র সজ্জিত করলে তারা সেই অস্ত্রই তুলে ধরতো তাঁদেরও বিরুদ্ধে। তাই বিদেশী শত্রুদের কাছে আত্মসমর্পন করে তাঁদের সহযোগী শক্তির ভূমিকা পালন করতে হয়েছে নিজেদের হীন স্বার্থে।

এই অবস্থায় আমরা নিঃসন্দেহে বলতে পারি কোন শ্রেণীবিভক্ত সমাজে উপরতলার মুষ্টিমেয় ক্ষমতা ভোগী লোকের ধর্মাচরণের বা সম্পত্তি রক্ষার পথে কোন অন্তরায়ই ছিলো না, উপরতলার শাসকবর্গের প্রাপ্য রাজস্ব বা আর্থিক দাবী মিটিয়ে দিলে; কিন্তু কোনদিনই শ্রমজীবি মানুষের ধর্মাচরণের কোন অধিকারই ছিলোনা বা থাকতে পারে না। তাদের যে অধিকার ছিলো সে হচ্ছে ধর্মীয় অনুশাসন পালনের নামে ধনিক শ্রেণীর দাসত্ব করার অধিকার। এই দাসত্বই ছিলো ধর্মীয় অনুশাসনের বাস্তব রূপ কেননা এই দুটি বস্তু ছিল

অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত। তাই দেখা যায় সেই ধর্মাচরণ শ্রমজীবি মানুষের কাছে দাসত্বেরই ধর্মীয়রূপ। আর ধনিক শ্রেণীর কাছে তাদের ধর্মাচরণ বলতে মেহনতী জনগণের উপর নিজেদের চাপিয়ে দেওয়া 'প্রভুত্বের' ধর্মীয় রূপ ছাড়া আর কিছুই নয় তা সহজেই বোঝা যায়। নানা ধর্মীয় বাণীর জালবুনে মেহনতী জনগনের এই অবস্থাকে আড়াল করা যায় না। অপর পক্ষে প্রাক সুলতান যুগই হোক, প্রাক্ বৃটিশ বা বৃটিশ যুগই হোক কোন যুগেই শ্রমজীবি জনগণের সম্পত্তি রক্ষার কোন প্রশ্নই ওঠেনা। কেননা তাদের সব কিছুরই জিম্মাদার ছিলেন তাঁরাই—যাঁদের হাতে ছিল রাষ্ট্রশক্তি। তা তাঁরা কেন্দ্রের বা রাজ্যের শাসন কর্তাই হোন বা গ্রামের প্রধানও পুরোহিতই হোন। আর একথাও সত্য যে পূর্ব্ব শাসকবর্গই হোন আর নতুন শাসকবর্গই হোন-- তাঁরা কখনই জনগণের মিত্র ছিলেন না। তাঁদের সঙ্গে জনগণের প্রতিটি অংশের সম্পর্ক ছিল শত্রুতার। এই জনগণকেই দমন করার জন্য শাসক শ্রেণীর প্রয়োজন হয় রাষ্ট্রযন্ত্রটি দখলে রাখার এবং নানাভাবে শক্তিশালী করে তোলার। একথাও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলা দরকার যে ধর্মীয় প্রশ্ন তুলে এই সত্যকে যেমন আড়াল করা যাবে না ঠিক তেমনি একথাও মনে রাখতে হবে যে—প্রাক বৃটিশ ভারতের শাসক শ্রেণী বলতে শুধুমাত্র তুর্কি, আফগান বা মোঘলদের বোঝাতো না—দেশীয় রাজা, মহারাজা, রাণা, চৌধুরী এঁরাও ছিলেন সেই শাসক শ্রেণীরই একটি অচ্ছেদ্য অংশ। রামমোহন কল্পিত কতকগুলি অভিযোগ তুলে দেশের ঐতিহাসিক সত্যগুলিকে আড়াল করে ইংরেজদের জনপ্রিয় করে তোলার চেষ্টা করেছেন।

ইংরেজরা কি ধর্ম ও সম্পত্তির রক্ষক ?

রামমোহন ধর্ম, সম্পত্তি আর নাগরিক অধিকার রক্ষার প্রশ্নে যে বিদেশী উপনিবেশিক শ্রেণীকে হিন্দু সমাজের অভিভাবক বলে অভিহিত করেছেন—ধর্ম ও সম্পত্তি রক্ষার ব্যাপারে সেই উপনিবেশিক শ্রেণীর 'বুর্জোয়া সভ্যতার' কদর্য্যরূপটি তুলে ধরেছেন মহামতি কার্লমার্কস। তিনি লিখেছিলেন ঃ স্বদেশে যা ভদ্ররূপ নেয় এবং উপনিবেশে গেলেই যা নগ্ন হয়ে আত্মপ্রকাশ করে সেই বুর্জোয়া সভ্যতার কপটতা এবং অঙ্গাঙ্গী বর্বরতা আমাদের সামনে অনাবৃত। ওরা সম্পত্তির সমর্থক কিন্তু বাংলায়, মাদ্রাজে, বোম্বাই-এ যে রকম কৃষি বিপ্লব হলো তেমন 'কৃষিবিপ্লব' কি কোন বৈপ্লবিক দল কখনও সৃষ্টি করেছে ? দস্যুচূড়ামনি স্বয়ং লর্ড ক্লাইভের ভাষায় ভারতবর্ষে যখন সাধারণ দুর্নীতি তাদের লালসার সঙ্গে তাল রাখতে পারছিল না তখন কি ওরা নৃশংস জবরদস্তির পথ নেয়নি ?

জাতীয় ঋনের অলঙ্ঘনীয় পবিত্রতার কথা নিয়ে ওরা যখন য়ুরোপে বাগাড়ম্বর করছে তখন ভারতে কি তারা রাজাদের ডিভিডেণ্ট বাজেয়াপ্ত করেনি—কোম্পানীর নিজস্ব তহবিলে যে রাজারা তাহাদের ব্যাক্তিগত সঞ্চয় ঢেলেছিল ? 'আমাদের পবিত্র ধর্ম'' রক্ষার অছিলায় ওরা যখন য়ুরোপে ফরাসী বিপ্লবের বিরুদ্ধে লড়ছিল তখন সেই সময়ে কি তারা ভারতে খৃষ্টধর্ম প্রচার নিষিদ্ধ করে দেয় নি ? এবং উড়িষ্যা ও বাংলার মন্দিরগুলিতে তীর্থযাত্রীদের কাছ থেকে টাকা তোলার জন্য জগন্নাথের মন্দিরে অনুষ্ঠিত হত্যা ও গণিকা বৃত্তির ব্যবসা চালায়নি ? 'সম্পত্তি' 'শৃঙ্খলা' 'পরিবার' 'ধর্মের' পুরোধা হলো এরাই ?" (ভারতে বৃটিশ শাসনের ফলাফল প্রবন্ধ)

এখানে উল্লেখ যোগ্য : A tax similar to that of formerly imposed by Maratha rulers of the region was levied on Hindu pilgrims by Govt. ('British Baptist Missionaries in India' by I. Daniel Pats-p 62) ঐ গ্রন্থেই উল্লেখ করা হয়েছে :

"After all charges (for police etc.) had been defrayed the Company's Treasury profited to the extent of 99205 Pound =16s from the festivals at Jagannath in 17 years immediately proceeding 1831. From Gaya and Allahabad respectively it had gained in sixteen years 445,941 Pound=15s and 1594,290 Pound = 7s=6d (Ibid 164) ; আরো বলা হয়েছে : Following Wellesly's conquest in late 1803 of that part of Orissa in which temple lay, some of his officials urged that they collect taxes from pilgrims to the Jagannath in order that its priests would be placated by being assured of certain source of revenue."

যারা ইংরেজদের শাসন মেনে নেয়নি তাঁদের ধর্মাচরনেই শুধু আঘাত করা হয়নি—তাঁদের ভিটেমাটি থেকেও উচ্ছেদ করতে কুণ্ঠিত হননি—ওয়ারেন হেষ্টিংস। এ-ঘটনা কি ইংরেজরা অস্বীকার করতে পারবে ? ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে জানুয়ারী—কোলকাতা আর বাঙলা ও বিহারের সমস্ত অঞ্চল থেকে পৈত্রিক বাসভূমি ত্যাগ করে চলে যাবার হুকুম দিয়েছিলেন—সন্নাসী ও বৈরাগীদের। মিঃ হেষ্টিংসের সেই আদেশ পত্রে লেখা হয়েছিল : Notice is hereby given Bairagis and Sannyasis . excepting such castes of Ramananda and Gowria . . to leave the town of Calcutta, its precincts or any other place of residence in it within Seven days from the publication of this advertisement and ... from Subahs of Bengal and Bihar in two months." (Sannyasi

and Fakir Raiders in Bengal by J. M. Ghose). তাতে আরো বলা হয়েছিলো : It is further declared that if any of the above mentioned sects shall be found in Bengal or Bihar at the expiration of two months they are to be seized and put on the roads for life, made to work at public buildings and have their property confiscated to the Govt." (Secret department proceedings, dt. 21. 1. 1773—quoted from Ibid)

এই প্রসঙ্গে আরও আরও একটি মন্তব্য এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। মিঃ হেষ্টিংস ১৭৭৪ ইং ২০ শে মার্চ লরেন্স সুলিভান কে লিখেছিলেন "It is my intention to proceed wore efectually against them (Sannyasi—লেখক) by expelling them from their fixed abode which they have established on the north eastern of the province" (Ibid)

সন্ন্যাসীদের মত ফকিররাও মোগল আমলে ভারতের সর্বত্র তীর্থ ভ্রমন করে বেড়াতেন। তাতে সরকারী কোন বাধা ছিল না। কিন্তু একই কারণে বিনা অপরাধে ফকিরদের শুধু তীর্থ ভ্রমনেই বাধা দেওয়া হলো না, তাঁদের অনেককে অন্যায়ভাবে হত্যাও করা হয়েছিলো। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে তৎকালীন বাঙলা বিহার উড়িষ্যার মহান জননায়ক মজনু শাহ্ ইংরাজদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে রাণী ভবাণীর কাছে একটি চিঠি পাঠিয়েছিলেন। এই চিঠি অন্যতম একটি ঐতিহাসিক চিঠি। তিনি লিখেছিলেন :

" They (English - Writer) obstructed us in visiting the Shrines and other places—this is unreasonable. You are ruler of the country. We are Fakirs who pray always for your welfare. We are full of hopes .. "Nevertheless last year 150 Fakirs were without cause put to death. They had begged in different countries and the clothes and the victuals which they had with them were lost." (Ibid)

প্রাচীন গ্রামীন সমাজ ব্যবস্থায় হিন্দু ধর্মীয় অনুশাসন অনুযায়ী একমাত্র কৃষকদেরই অধিকার ছিল জমি চাষ আবাদ করার। বংশ পরম্পরায় তারা এই জমি চষে খুঁড়ে এসেছে আর এই জমিকে বলতো—" বাপুতে " জমি। মোগল আমলেও এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটেনি। কিন্তু ইংরেজ আমলে কৃষকদের সেই জমি থেকে উচ্ছেদ করে সমস্ত ভূসম্পত্তির মালিক করে দেওয়া হলো মুষ্টিমেয় একদল লোককে যাঁরা মোগল আমলে ছিলেন রাজস্ব আদায়কারী। যা তাঁরা কোন দিন কল্পনা করতে পারেন নি তাই তাঁরা পেয়ে গেলেন ইংরেজ আমলে। আর কৃষকদের পরিণত করা হলো এক ধরনের সার্ফে। এই ব্যবস্থা কি হিন্দু ধর্মে প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ হলো না ? ইংরেজরা

প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল—সম্পত্তির ব্যাপারে ধর্মীয় বিধান মেনে চলবে। কিন্তু নিজেদের স্বার্থে তা নিজেরাই ভেঙে ফেলতে বিলম্ব করলো না। ইংরেজরা কি বলপ্রয়োগ করে ধর্মান্তরিত করার চেষ্টা করে নি? এ-ব্যাপারে রামমোহনেরই ভালো জানার কথা। আমরা দেখি ধর্মান্তর করার জন্য সমস্ত রকমের উপায় গ্রহণ করেছিল তারা। তাই বেনারসে একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে "... the defence of religion against the christian Governor was the war cry of the mob." (XXII—Civil Disturbances in India by S. B. Chowdhury). ইংরেজদের দুর্ব্যবহারে গণপ্রতিরোধ সৃষ্টি হলে তাদের রক্ষা করার প্রয়োজনে একমাত্র রামমোহনই এগিয়ে এসেছিলেন এবং দেশবাসীর উদ্দেশ্যে একটি পত্র প্রকাশ করিয়েছিলেন। এই পত্রটিই তাঁর 'প্রার্থনা পত্র'। ঐ পত্রের মর্ম থেকেই তৎকালীন পরিস্থিতি সম্পর্কে কিছু ধারনা হতে পারে। বহুকাল বলার পর তিনি ঐ পত্রে লিখেছিলেন : বিদেশীয়দের আন্তঃপাতি ইউরোপীয়, তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা পরমেশ্বরকে সর্ব্বথা এক জানেন ও মনের শুদ্ধভাবে কেবল তাঁহারি উপাসনা করেন .... তাঁহাদিগোও উপাস্যের ঐক্যানুরোধে অতিশয় প্রিয়পাত্র জ্ঞান করা কর্ত্তব্য হয়। ....কিন্তু ঐ দ্বিতীয় তৃতীয় প্রকার ইউরোপীয়েরা যখন আপন মতে লইতে ও অদ্বৈতবাদ হইতে বিমুখ করিতে আমাদের প্রতি যত্ন করেন তখনও তাঁহাদিগ্যে দ্বেষভাব না করিয়া বরঞ্চ তাঁহাদের স্বীয় দোষ জানিবার অজ্ঞানতা নিমিত্ত কেবল করুণা করা উচিত হয়; যেহেতু ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ হয় যে ধন ও অধিকার হইলে আপনাতে অন্য কোন ত্রুটি আছে এমত অনুভব মনুষ্যের প্রায় হয় না।" এই চিঠির অর্থ কি খুব দুর্বোধ্য? এই ইংরেজরাই নিজেদের মধ্যে প্রকাশ্যে বলাবলি করতো-ভারতবর্ষ হলো : "Kingdom of Satan"

তাদের স্থির বিশ্বাস ছিল, রামমোহনই এই Kingdom of Satan-কে 'Kingdom of God'-এ পরিণত করবেন। এই প্রসঙ্গে নিচের উদ্ধৃতিটি বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়।

" 'Who knows' wrote the monthly repository of Theology and Literature for 1816, 'but this man may be one of the many instruments by which God in his mysterious providence, may accomplish the overthrow of idolatry? What may be the effect of this man's labours time will show. Probably they may bring the craft of Brahminism and caste in danger; and God may be in this manner shaking the Kingdom of Satan ..' " (Rammohan Roy p 161 by I. Singh)

অধিক উদ্ধৃতি দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। এই সব বিবরণ থেকে আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে রামমোহম ইংরেজদের সম্পর্কে আকাশ কুসুম স্বপ্ন দেখেছিলেন,

কিন্তু তা নয়। তাঁর প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল— হিন্দু ধনী অভিজাত শ্রেণীর মধ্যে ইংরেজদের সম্পর্কে উচ্চ ধারণা সৃষ্টি করা এবং প্রাক্তন শাসন কর্তাদের ঘৃণ্য পন্থায় উচ্ছেদকে ন্যায়সঙ্গত করে তোলা।

প্রাক্-বৃটিশ-ভারতের নব-জাগরণ

এবার প্রাক্ বৃটিশ ভারতের একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র আমরা তুলে ধরতে পারি। তাতে সহজেই বোঝা যাবে—রামমোহনের বক্তব্য হ'তে প্রাক বৃটিশ ভারতের যে চিত্রটি ভেসে ওঠে তার সঙ্গে ইতিহাসের মিল নাই, তা আদৌ ইতিহাস নয়। সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ সৃষ্টির হাতিয়ার মাত্র। প্রথমেই বলে রাখি অনেকের ধারণা, এবং অনেক দিন থেকে এ ধারণা পোষণ করা হচ্ছে, যে—তুর্কি, আফগান ও মোগল আমলের পূর্বে যে-গ্রামীন সমাজ-ব্যবস্থা ছিল— তা বৃটিশ শাসন সুরু না হওয়া পর্যান্ত পূর্বে যেমন ছিল তেমনি অটুট থেকে গেছে। এই ধারণা, দেখা যায় একেবারে ভুল। সম্রাট আলাউদ্দিন খিলজির আমল থেকেই ভাঙ্গতে সুরু করে। গ্রামীন সমাজ বলতে বোঝাতো মোটামুটি এই রকম: সমাজের নিচু তলায় থেকে কৃষকরা মিলিত ভাবে চাষ আবাদ করতো, তাদেরই একটি অংশ ছিল কারিগর যারা পণ্য উৎপাদনে অংশ গ্রহণ করতো, যেমন তাঁতি, কুমোর, কামার ইত্যাদি, তা ছাড়াও ছিল মেথর এবং ধোপা ও কিছু সর্ব্বহারা। "এইভাবে জনসাধারণ যখন সকলে মিলিয়া একই কাজ করিত, তখন দেখিতে পাই, সমাজের 'প্রধান ব্যক্তি ছিল একাধারে বিচারক, পুলিশ ও কর আদায়কারী।..." এই প্রধান ব্যক্তির পরেই যাঁর স্থান তিনি ছিলেন পুরোহিত। তাঁর হাতেই ছিল শিক্ষার ভার, ধর্মরক্ষার দায়িত্ব। গ্রামের চাহিদা মেটাবার জন্যেই পণ্য বা খাদ্য শস্য উৎপাদন করা হতো। শ্রম বিভাগ ছিল অপরিবর্ত্তনীয়। এবং গ্রাম সমাজ ছিল স্বয়ং সম্পূর্ণ। স্বয়ং সম্পূর্ণ গ্রাম-সমাজ ছিল প্রাচীন ভারতের সমাজ-ব্যবস্থার মূলভিত্তি। বছরের পর বছর এই অপরিবর্ত্তনীয় নিয়মই বহাল রাখা হতো। সমাজ বিকাশের পথ ছিল রুদ্ধ। ফলে ভারতীয় সমাজের অগ্রগতির পথে একটা অলঙ্ঘনীয় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল এই অচল ও অপরিবর্ত্তনশীল সমাজ ব্যবস্থা। কিন্তু দেখা যায়—সম্রাট আলাউদ্দিনের আমল থেকে সামন্ততন্ত্রের অভ্যন্তরে প্রাচীন সামন্ততন্ত্র ভাঙ্গতে সুরু করে। গ্রামীন সমাজ ব্যবস্থারও উল্লেখ-যোগ্য পরিবর্ত্তন ঘটতে আরম্ভ করে এই সময় থেকেই।

শ্রদ্ধেয় রামকৃষ্ণ মুখার্জি বলেছেন "In the later phase of Muslem Rule in India, while in general the village communities continued to exist and the cast system prevailed, there are

reasons to believe that, because of forces attacking the institution from outside and within, feudalism in India had begun to weaken from the fourteenth century onwards. The external forces working against the essential characteristics of the system came from the ruling powers. As has been reported :

'A number of measures adopted by the Delhi Kings, before Shershah, contributed to a certain extent to the weakening of feudalism. Allauddin Khilji confiscated religious endowments and all grants of rent—free land. The powers of the hereditary assessors and collectors of revenue were sharply curtailed in his reign'. Under the Tughlaks, the land tax was assessed by the collectors in person (cambridge. H. I. vol. III p-128). Mubarak Shah introduced the custom of transferring nobles from one fief to another (Ibid p.210), (quoted from R & F of East India Comp. p-97-98)

শের শাহের আমলে গ্রামের প্রধানদের ও অন্যান্য ধনী অভিজাত শ্রেণীর অবস্থা আরো খারাপ হয়ে পড়ে।

"Sher Shah threw upon the village headman the responsibility of collecting the land revenue. He was expected to execute a bond and furnish securities for the due discharge of his duties. The muqaddam gave a receipt to the cultivator. The revenue demand was to be rigorously enforced. If a cultivator failed to pay, probably the usual methods of extorting the money from him were resorted to. He was imprisoned and tortured till he managed to pay the requisite amount in kind or cash." (The Moghul Govt. administration referred to in Rise and Fall of E. I. Company, p-99)

সম্রাট আকবর মোটামুটিভাবে শেরশাহের ব্যবস্থাগুলি গ্রহণ করলেন। তবে আরো কয়েকটি নতুন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলো। শ্রদ্ধেয় ইতিহাসবিদ ডঃ ইরফান হাবিবের মতে ঃ Payment in cash had become quite widely prevalent by the 14th Century ." শ্রদ্ধেয় হাবিব গ্রামীন অর্থনীতিতে মুদ্রাব ভূমিকাটি তুলে ধরেছেন। তাতে আমরা দেখতে পাবো গ্রামীন অর্থ- নীতিতে মুদ্রার ব্যাপক অনুপ্রবেশ কিভাবে সাহায্য করেছিলো কুটির শিল্পের

পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থায় উত্তরণের প্রাথমিক পদক্ষেপকে এবং সমাজে একটি নতুন শক্তি—ব্যবসায়ী বুর্জোয়া শ্রেণীর জন্মদিতে) তিনি লিখেছেন :

Even under Alauddin Khalji when they (iqta holders—লেখক) were asked to collect land revenue in kind, it was laid down that the grain should be sold to merchants at fixed prices 'by the side of the field.' Since the land revenue constituted the bulk of the peasant's surplus large scale trade between town and country must have resulted. This in turn promoted the cultivation of superior, or cash crops. For the first time in the 14th century, we find the substitution of high priced crops for the low grade crops meant for local consumption, being regarded as an object of state policy. (Barani 498 C. F. Moreland).

The large export of grain and other produce from the country caused by the enaction of the revenue, maintained a class of specialised grain merchants (Karvomis—the later Banjaras) which appears for the first time now in our historical records (Barani p 304 p 306). On the other hand it is said that Multanis (Hindu merchants) and Sahas (Money lenders) of Delhi became enormously rich by advancing very large loans to the Turkish nobles against drafts on the revenues of their iqtas. The iqta system may thus be said to have forced in some ways the pace of medieval commercial development.

The immense drain of a substantial part of rural produce to the Towns in the form of revenues of the iqta holders helped to create large town population. Town crafts also grew etc. (২৮) শেরশাহের আমলেই সম্ভবত প্রতিটি কৃষকের সঙ্গে রাষ্ট্রের সরাসরি সম্পর্ক স্থাপিত হলো এবং "the peasants were now required to pay in cash". (quoted from p 99 of R & F of E. I. Comp.) আকবরের রাজত্ব কালেও " 'From the outset the demand was made in cash, the produce due under the schedule being valued at prices fixed by order of the emperor'. Henceforth money rent became a fairly established feature in the Mughal administration and it was generally followed by Akbar's succes-

sors." (২৯) ভারতের জনজীবনে এই নতুন ব্যবস্থা একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। গ্রামীন সমাজ-ব্যবস্থায় এক উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘট্‌লো।

This measure appears to have reflected the penetration of commodity circulation in the villages, a feature, if true, indicated how the subsistence character of the village communities was undergoing changes in this period.

In any case, it meant the rise of new forces in the society, namely, that of money-changers and usurers ; in which connection it should be borne in mind that 'money forces the commodity form even on the objects which have hitherto been produced for the producer's own use ; it drags them into exchange', and that even though 'under the Asiatic forms usury may last for a long time,' it 'works revolutionary effects in all precapitalist modes of production' and that it could not but produce 'economic disintegration and political rottenness." (৩০)

বলা হয়েছে ঃ "Sher Shah assured a prosperous trade in the country by the measures he took for the purpose of maintaining law and order in the country. . To help trade and industry and encourage sales he reformed the coinage. A standard weight and uniform fineness were adopted for all coins issued so that these could be easily accepted without any fear of any discount being charged later on. Gold, Silver and Copper coins were issued from various mint towns." (Mughal Govt. and Admn p 268 by Ram Sharma—quoted from R & F of E. I. C,)

"Akbar, 'like shershah, tried to regulate the currency of the state', and 'mercantile affairs of the Empire during the reigns of Akbar and his successors were transacted in round gold mohars, rupees and dams,'' (p 574—575 An Adv. History of India) (৩১)

The growth of new towns at this time can not be ascribed solely to the magnanimity of a monarch. They are an indication of new forces within the womb of the feudal system', (quoted from Rise and Fall of E. I. comp. p 104)

শ্রদ্ধেয় রামকৃষ্ণ মুখার্জি'র মতে ঃ "The developments in India in this period were in many ways similar to those in Europe."

"There were 120 big cities and 320 townships in Akbar's empire with multitudes of artisans, servants and peons. Agra, the Capital, had a population of 6,60,000 when the court was there and 5,00 000 when it was not. Foreign travellers have stated that Delhi was as large as Paris and Ahmedabad in the early seventeenth century as large as London and its suburbs. Patna had a population of 2,00,000 (p 369-370—Indian muslim by M. Mujib.)

"According to V. A. Smith, Patna had extensive trade in raw cotton, cotton cloths, sugar, opium and other commodities. Ralph Fitch found Patna a flourishing trade centre in 1586." (quoted from Rise and fall of E. I. Comp. p 105)

"Writing in A. D. 1585, Fitch observed : 'Agra and Fatehpore are two very great cities, either of them much greater than London and very populous." Beteween Agra and Fatehpore are twelve miles, and all the way is a market of victual and other things, as full as though a man were still in a town, and so many people, as if a man were in a market.' Terry refers to the Punjab as 'a large province, and most fruitful. Lahore is the chief city thereof, built very large, and abounds both in people and riches, one of the principal cities for trade in all India.' Monserrate asserted that in 1581 Lahore was 'not second to any cities in Europe or Asia'. Burhanpur in Khandesh was 'very great, rich, and full of people'. Ahmadabad in Gujarat has been described by Abul Fazl as 'a noble city in a high state prosperity,, 'which for the pleasantness of its climate and display of the choicest productions of the whole globe is almost unrivalled.' In Eastern India there was much opulence in cities like Benares, Patna, Rajmahal, Burdwan, Hugli, Dacca and Chittagong (quoted from Rise and Fall of E. I. Comp. at P. 106-107। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে ক্লাইভ মুর্শিদাবাদ দেখে বলেছিলেন ঃ This city is as extensive, populous and rich as the city of London." (Riazu-S-Salātin by Gulam Hossain

Salim).

"The export and import trade of Hindustan was no longer confined to luxury goods nor was it dependent on the surplus products of the village Communties." (quoted from Rise and Fall of E I. Company)

দেশের ব্যবসা বাণিজ্য বিশেষ উন্নত স্তরে এসে পেঁছালো। আগে গ্রামীন সমাজ ছিল স্বয়ংশাসিত-সে আর সেই অবস্থায় থাকতে পারলো না। বলা হয়েছে ঃ ". the village economy which had until now maintained an independent existence of its own, irrespective of how the urban economy went its way, and this dualism gave a peculiar imprint on the characteristics of Indian feudalism, was now being gradually drawn into the needs of manufacture and commerce" (P 101 of Rise and Fall of E. I. Comp. by R. K. Mukherjee)

এই যে গ্রামীন সমাজ ব্যবস্থায় বাইরের হস্তক্ষেপ, নতুন বুর্জোয়াশ্রেণীর জন্ম, ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য নতুন চাহিদা, শহরের উপর নির্ভরশীলতা, মুদ্রা-অর্থনীতির প্রচলন, মুদ্রায় রাজস্ব আদায়—এসব' could not but have weakened the institution itself, and thus affected one of the basic props of Indian feudalism."

"The Indian Bourgeoisie were growing stronger everyday ......"

শ্রদ্ধেয় বি, বি মিশ্র উল্লেখ করেছেন ঃ "there existed in addition a seperate class of merchants ....They were organised in guilds designed to regulate prices and to protect trading rights against the interference of royal officials and landed magnates. These were comparable to medieval European traders associations which exercised a greater measure of autonomy in the regulation of commerce." (The Indian Middle Class).

এই বিবরণ থেকে এটাও স্পষ্ট যে ব্যবসায়ী বুর্জোয়ারা একটি পর্যায়ে সামন্ত প্রভুদের প্রভাব প্রতিপত্তি থেকে নিজেদের মুক্ত করার চেষ্টা করেছিলেন। নিজেদের স্বার্থ, অধিকার সম্পর্কে তাঁরা সচেতন হয়ে উঠেছিলেন।

শ্রদ্ধেয় মিশ্র আরো উল্লেখ করেছেন যে, " India's western seaboards, however, presented a pattern of economic development which was relatively free from Mughal influence.

....The Indian trading community there could thus operate with freedom and security of private property. Duarte Barbosa, for instance, affirams that even the Muhammadan merchants of the Malabar coast lived with the Hindus in a single community, followed their law of property, spoke their language and traded with them without fear of Govt. Before the advent of the Portuguese these Muhammedans controlled all the trade and navigation and Barbosa cites instances to show that their spirit of independence led them even to take up arms in the preservation of their rights." (Ibid p 29)

"Gujarat was yet another province where the business community exercised a certain amount of independence." (Ibid)

আরো বলা হয়েছেঃ"... They had secured from the Mughal Govt. an order which prohibited cow slaughter and left them in the full exercise of their religious rights. They used their freedom to expand commerce as well as in support of charitable institution, including hospitals for men and animals." (Ibid) ব্যবসায়ী বুর্জোয়ারা যে সমাজ জীবনে পরিবর্তনের ক্ষেত্রে এবং নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন—তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই।

"They constituted a potential opposition to feudalism to the extent to which their situation enabled them to carry on their urban trade without much let or hindrence."

সমাজ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে মধ্যশ্রেণীকে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতে দেখা যায়। প্রাক-বৃটিশ ভারতেও অনুরূপ একটি মধ্যশ্রেণীর উপস্থিতি চোখে পড়ে। শ্রদ্ধেয় এম, মুজিব তাঁর বিখ্যাত "The Indian Muslim গ্রন্থে লিখেছেন ঃ It is believed that, until the nineteenth century, India had no middle class. There were rich who tended to acquire more and more of riches and power and the poor who, because of continuous exploitation, became poorer. But there has been, all along, a bourgeoisie, a class of people who carried on banking and money lending, who were distributors of goods and who provided artisans, particularly jewellers and weavers, with the raw materials to produce goods and paid the

wages on which they subsisted There were also merchants dealing in goods wholesale or retail. They belonged definitely to what should be called middle class,

Some members of the bourgeoisie, assured of their position and secure in their wealth, lived openly in a lordly style."

ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থা এমন একটি পর্যায়ে উন্নীত হলো যখন ব্যবসায়ী বুর্জোয়াশ্রেণী শুধু কেনা বেচার মধ্যে, ব্যাঙ্ক ব্যবসায়, কর্জ দেওয়ার মধ্যে আবদ্ধ থাকলো না।

শ্রদ্ধেয় রামকৃষ্ণ মুখার্জির মতে ঃ "In conditions of such rapid progress, the merchant-bourgeoisie of India went a step forward. Manufacture had by then begun to develop, leading to the eventual alienation of the product from the producer by the merchant-capitalists. Shifting from their previous position of only being interested in buying goods cheap from the artisans and peasants and selling them dear to the European merchants, the indian merchants were also encouraging production in a similar way as the "putting out" system current in England in 'the later half of the sixteenth and the early seventeenth century' as well as in other parts of Europe" (পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃঃ ১২৫) তিনি আরো বলেছেন ঃ "The merchant capitalist advanced funds to the weavers with which they bought the necessary material and supported themselves while at work. Thus, when they handed over their products to the merchant-capitalists, they were no longer owners of their own produce. The product was alienated from the producer. The merchant-capitalist derived not the usual profit out of buying cheap and selling dear, he was already exploiting the labour-power of the producer. " (p 126—Ibid)

প্রধান কারিগররাও কেউ কেউ মজুর নিয়োগ করে তার শ্রমজাত পণ্য থেকে অতিরিক্ত মূল্য সৃষ্টির উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলো। ফলে একজন পুরনো উৎপাদকের সঙ্গে নতুন উৎপাদকের (মজুরের) পুরনো সম্পর্ক আর থাকলো না। নতুন সম্পর্ক সৃষ্টি হলো এবং সে সম্পর্ক হলো মালিক ও শ্রমিকের সম্পর্ক। উৎপাদকের সঙ্গে উৎপাদকের সম্পর্ক নয়। শ্রদ্ধেয় হরিরঞ্জন ঘোষাল মহাশয় লিখেছেন ঃ A master weaver possessing two or more looms sometimes employed hired labour for his purpose and

journeymen workers seeking tempyorary employment were a regular feature of the time." (p 4, Economic Transition in the Bengal Presidency).

অবশ্যই এইসব উদীয়মান জাতীয় পুঁজিবাদী বুর্জোয়ারা ছিল বিকাশের প্রাথমিক স্তরে। কিন্তু এটা বেশ বোঝা যায় যে ভারতবর্ষ মোগল আমলে অর্থনীতির ক্ষেত্রে সমাজ বিকাশের সম্পূর্ণ নতুন একটি স্তরে উত্তীর্ণ হচ্ছিল; অন্ততঃ তার উত্তীর্ণ হবার পথ প্রশস্ত হবার উজ্জ্বল সম্ভাবনা সৃষ্টি হচ্ছিল। উৎপাদন পদ্ধতির যে উন্নতি ঘটছিল তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই।

শ্রদ্ধেয় শিবচন্দ্র ঝাঁ মহাশয়ও এই সিদ্ধান্তে এসে পেঁৗছেছেন যে "Before the establishment of the British Rule in India in the 18th century, the situation that was unfolding in the Indian society was for the emergence of capitalism in the 'really revolutionery way' i, e way no. 1. But that situation was nipped in the bud by the coming of the British in India" (The Indian Trade Union Movement). অষ্টাদশ শতাব্দীতেই পুঁজিবাদী সংগঠন যে গড়ে উঠেছিলো, তা বিশ্বাস করবার মত যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। অর্থাৎ সামন্ততন্ত্রের অভ্যন্তরেই পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থা গড়ে উঠে এবং গুরুত্ব লাভ করে। সোভিয়েত রাশিয়া থেকে প্রকাশিত একটি গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে যে "প্রাক ব্রিটিশ আমলে উৎপাদন-বল আর শ্রমবিভাগের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে দেখা দিয়েছিল এক ধাঁচের পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন, যাতে উৎপাদক হয়ে ওঠে বেনিয়া আর পুঁজিপতি"। (ভারতের সামাজিক অর্থনীতিক বিকাশ ৫৬ পৃঃ)

পুঁজিতান্ত্রিক সংগঠন বলতে জাহাজ শিল্প, কাগজ শিল্প, বস্ত্র শিল্প, স্বর্ণ শিল্প, নীলের কারখানা ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য।

রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপে দেশের গ্রামীন সমাজের অর্থনীতি ভেঙ্গে পড়তে সুরু করায় পাশাপাশি সামন্ততন্ত্রের মতাদর্শ 'পুরোহিত তন্ত্রের' বিরুদ্ধেও গণ আন্দোলন চলতে দেখা যায়। কেননা নতুন বুর্জোয়া শ্রেণীরই শুধু নয়, সমাজের কারিগর সহ অন্যান্য নির্যাতীত শ্রেণীর প্রয়োজন হয়ে উঠেছিল পুরোহিত তন্ত্রের বাধা অপসারণ করার। ফলে চিন্তার জগতে নতুন ঢেউ এসে সৃষ্টি করেছিল এক বৈপ্লবিক আলোড়ন। নতুন এক মতাদর্শ প্রচারিত হতে দেখা গেল সমাজে। সম্পূর্ণ নতুন মতাদর্শ। সেই নতুন ভাবধারার প্রচারকরা প্রায় সকলেই এসেছিলেন সমাজের নিচের তলা থেকে, যাঁরা ছিলেন কারিগর অথবা ব্যবসায়ী। এঁরাই ছিলেন সমাজের নির্যাতিত অংশের মানুষ। আন্দোলনের পুরোভাগে যাঁরা ছিলেন তাঁদের কয়েকজনের নাম উল্লেখযোগ্য। চৌদ্দ শতাব্দীতে উত্তর ভারতে শ্রদ্ধেয় রামানন্দ, পঞ্চদশ শতকে দক্ষিণ ভারতে বল্লভাচার্য, পনেরো ষোল শতকে বাংলায় উড়িষ্যায় উত্তর ভারত

পূর্ব ভারত ও দাক্ষিণাত্যে শ্রী চৈতন্য, পনেরো শতকের প্রথমার্ধে—মহারাষ্ট্রে নামদেব—একজন দর্জি আর ক্যালিকো প্রিন্টার, পনেরো শতকে উত্তর ও মধ্য ভারতে কবির সাহেব—একজন তন্তুবায়, পনেরো শতকের শেষার্ধে পাঞ্জাবে শিখ ধর্মের প্রচারক গুরু নানক—একজন ব্যবসায়ী, সপ্তদশ শতকে মহারাষ্ট্রে একনাথ, সতেরো শতকে শিবাজির সমসাময়িক তুকারাম—শূদ্র ও দরিদ্র ব্যবসায়ী, কবিরের উত্তরাধিকারী। ষোল শতকে উত্তর ভারতে বিখ্যাত কবি দাদু—একজন মুচি, ষোল শতকে কাশ্মীরে স্ত্রী কবি লীলা। প্রচারকদের মধ্যে রামদাস ছিলেন মুচি, ঋষি সাপোচা ছিলেন জাতিতে চর্মশিল্পী (tanner), ধর্মদাস ছিলেন ব্যবসায়ী, সুন্দর দাস—ব্যবসায়ী, মুলুক দাস—ব্যবসায়ী। বেমানা ছিলেন চাষী। (শ্রদ্ধেয় রামকৃষ্ণ মুখার্জির গ্রন্থ থেকে গৃহীত।) এই আন্দোলন ভারতে 'ভক্তি আন্দোলন' নামে পরিচিত। "They (Reformers—লেখক) violated their caste-regulations and took up other professions."

এই নতুন মতাদর্শে 'মানুষকে' তুলে ধরা হলো সকলের ঊর্দ্ধে। ঘোষণা করা হলো—মানুষের মধ্যে ভেদবিভেদের অবসান। বলা হয়েছে: The preachings of these leaders of the Bhakti movement and their disciples against the caste system—the basic social organisation of India in that epoch—could not but have had an adverse effect on the fundamental basis of Indian feudalism." (Rise and Fall of E I Comp., p 102). "They held that the dignity of man depended on his actions and not on his birth, protested against excessive ritualism and formalities of religion and domination of the priests and emphasised simple devotion and faith as the means of salvation for one and all."

শ্রদ্ধেয় রামকৃষ্ণ মুখার্জী উল্লেখ করেছেন: Along with the attack on the economic basis of the village communities, movements had developed against its ideological basis of the caste system" আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে এই আন্দোলন ছিল ধর্মীয় আন্দোলন। তৎকালীন অবস্থায় অর্থাৎ সমগ্র মধ্যযুগ জুড়ে প্রকৃত পক্ষে এই আন্দোলনই ছিল সমাজের নিপীড়িত জনগণের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আন্দোলন। সেদিন আন্দোলনকারীদের প্রয়োজন ছিল ধর্মীয় মুখোস পরার। কেননা সমাজের বিভিন্ন দিক যথা ধর্ম, সামাজিক আচরণ, শিক্ষা, আইন কানুন, বিচারালয়, বিষয় সম্পত্তির ভাগবন্টন ব্যবস্থা সবই ছিল পুরোহিত শ্রেণীর দখলে। আর এই পুরোহিত শ্রেণীই ছিল সামন্ত প্রভুদের রাজনৈতিক বাহন এবং পুরোহিত তন্ত্র ছিল সামন্ততন্ত্রের প্রধান আশ্রয়। ধর্মীয় রূপ গ্রহণ করলেও এই আন্দোলন গুলি ছিল বস্তুত সেদিনকার শ্রেণী সংগ্রাম। তাই, "At its heads were

saints and prophets, Poets and philoscphers, who sprang chiefly from the lower orders of society, —tailors, carpenters, potters, gardeners, shopkeepeis, barbars and even mahars (Scavengers) more often than Brahmins," (Shivaji and his time by Jadunath Sarkar. "The feudal state and the feudal nobility greatly exploited the craftsmen and traders ; this led to frequent actions against the Rajas and Brahmins." (A. M. Dyakov. The National Problem in India Today p 21)

যদিও এই আন্দোলন গুলি গড়ে উঠে পুরোহিত তন্ত্রের বিরুদ্ধে কিন্তু স্বাভাবিক কারণেই আক্রমণের লক্ষ্যমুখ ছিল সামন্ততন্ত্র। পুরোহিততন্ত্রকে অ ঘাত হানলেও—নতুন মতাদর্শের অনিবার্য আঘাত যথাস্থানে গর্জে উঠতে দেরী হয়নি। এই আন্দোলনের মধ্যে মুক্তি লাভের উপায় দেখেছিল সমাজের নির্যাতিত, নিগৃহীত শ্রেণীগুলি। তাই হাজার হাজার কৃষক কারিগর, ব্যবসায়ী বুর্জোয়ারা এসে যোগ দান করে এই আন্দোলনে ; সামন্ততন্ত্র ও পুরোহিত তন্ত্রের নাগপাশ থেকে মুক্তি পাবার আশায়।

বলা হয়েছে ঃ "... the Bhakti movement among all the larger peoples of India started everywhere as a movememt of artisans and traders in towns and later, in the XVII century, in certain regions it was joined by the peasants. . The dissatisfaction of oppressed artisans and traders with the feudal system turned into an armed struggle against the rule of the great feudal lords." (quoted from Rise and Fall of East India Company by R. K. Mukherjee—p 103).

শ্রদ্ধেয় এ, এম, ডিয়াকভের মতে ঃ As the contradictions between the feudal lords, the oppressors, and the oppressed peasants, craftsmen and traders intensified, the Sectarian movements spread." "The popular movements, including that of the Bhakti, therefore, continued to grow, they became stronger and better organised." আরো বলা হয়েছে ঃ According to the evidence available they originated in the Indian towns and began to spread to the peasants during the Mogul Rule." (A. M. Dyakov. —N. P. in India Today.)

সমাজের নির্যাতিত জনগণের এই সংগ্রামগুলি ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে বিভিন্ন ব্যক্তির নেতৃত্বে ভারতের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। কাশ্মীর থেকে দাক্ষিণাত্য অবধি। এই সংগ্রামগুলিরই অন্যতম একটি হল ভক্তি আন্দোলন। তারই

পাশাপাশি নতুন চিন্তাধারার জোয়ার এনেছিল সুফী মতবাদ। শিখ, মারাঠা, জাঠদের আন্দোলনও ছিল ভক্তি আন্দোলনেরই অংশ। তাই দেখা যায় "The sect of the Sikhs, formed at the beginning of the 16th Century, created at first the opposition of the merchants, and partly of the usurers in the north Indian towns against the feudal order." ('Rise and Fall of East Indian Company,' p 132). শিখরাও "...not only condemned the caste system and proclaimed the equality of all sikhs in the sight of God, but also preached the rejection of force and the oppression by the Padishahs." ."The ruined peasants and craftsmen became the main force of this movement.'

বলা হয়েছেঃ " a complete break was made with orthodox Hinduism" (Ibid). উল্লেখ্য যে এই আন্দোলন ছিল সমস্ত সম্প্রদায়ের সামন্ত প্রভুদের বিরুদ্ধে। তাই শিখদের আন্দোলন দমন করার জন্য হিন্দু রাজারাও এগিয়ে এসেছিলো মোগল শাসকদের সাহায্য ও সহযোগীতা করতে উভয়ে মিলিতভাবে লড়াই করেছে শিখদের বিরুদ্ধে। মারাঠা ও শিখ আন্দোলন যে সামন্ততন্ত্র বিরোধী ছিল তার একটি প্রমাণ এই যে "মোগল সাম্রাজ্যের ধ্বংসস্তুপ থেকে উদ্ভূত শিখ রাজ্য এবং মারাঠা রাজ্য স্থানীয় বেনিয়া আর কারিগরদের সম্ভাব্য সর্বতোভাবে উৎসাহ দিতে চেষ্টা করেছিল ...." (ভারতের সামাজিক অর্থনীতিক বিকাশ—মস্কো প্রকাশনী।)

আগেই বলা হয়েছেঃ in the first half of the seventeenth century, the Marathas rose against the Mogul empire. The Maratha movement, which was strongly influenced by Bhakti views, was directed against the big Mogul feudal lords, who oppressed the Marathas. The struggle they were waging helped to form the Maratha Nationality and was conductive to the development of their language and literature" (The National Problem in India Today by A. M. Dyakov p 25-26)

সামন্ত শাসকশ্রেণীর বিরুদ্ধে একাধিক রাজ্য যে মিলিতভাবে লড়াই করেছিল তারও প্রমাণ পাওয়া যায়। মারাঠারা শুধু মহারাষ্ট্রের মধ্যেই তাঁদের আন্দোলন সীমাবদ্ধ রাখেন নি, এ আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছিল সারা ভারতবর্ষে। এমনকি বৃটিশ আমলেও তাঁরা লড়াই করতে এসেছেন বাংলাদেশে ইংরাজদের বিরুদ্ধে। সামন্ত প্রভুদের বিরুদ্ধে যৌথ আন্দোলন গড়ে তোলার জন্যও তাঁরা চেষ্টা করেছিলেন।

সমগ্র ভারত বর্ষ জুড়ে যদি আন্দোলন ছড়িয়ে দেওয়ার সচেতন প্রচেষ্টা না

থাকবে তাহলে সর্বজন শ্রদ্ধেয় জন-নায়ক—শ্রীচৈতন্যের নেতৃত্বে বাঙলার বৈষ্ণব আন্দোলন বাংলার মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকে যেতো। কিন্তু বাংলার সীমানা ছাড়িয়ে ছড়িয়ে পড়েছিল উড়িষ্যায়, উত্তর ভারত, পূর্ব ভারত, দাক্ষিণাত্যেও। এই বিরাট অঞ্চল জুড়ে তিনি ও তাঁর অনুগামীরা সৃষ্টি করেছিলেন নতুন জাগরণ। মানুষকে তুলে ধরেছিলেন সকলের উর্দ্ধে। ঘৃণা প্রকাশ করেছিলেন সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে। তাঁর আন্দোলনকেও স্তব্ধ করার চেষ্টা করেছিলো ব্রাহ্মণদের সঙ্গে যুক্তভাবে তৎকালীন শাসক শ্রেণীর আমলারা। মহামতি কবির সাহেবের আন্দোলনও ছড়িয়ে পড়ে সমগ্র উত্তর ও মধ্য ভারতে। কবির " denounced both Islam and Hinduism his philosophy shows traces both of the Sufi concept of immanence and the Vedantist concept of oneness" (quoted from The Indian Muslim by M. Mujib p 320) এর উপদেশ গুলি "... derive their appeal, which are indefensible from the rational and purely human point of view." (Ibid)

"....he preached a religion of love, which would promote unity amongst all classes and creeds. To him 'Hindu and Turk were pots of same clay : Allah & Ram were but different names'. (An Advanced History of India p-405)

বদিউদ্দিন মাদার শাহ ছিলেন এই রকম একজন দার্শনিক এবং সামন্ততন্ত্র বিরোধী উভয় সম্প্রদায়ের অসংখ্য ব্যবসায়ী বুর্জোয়া, কারিগর, কৃষক ছিলেন তাঁর শিষ্য। "They worshipped Hindu gods as well as Muslim Saints' (The Indian Muslims, p 16 by M. Mujib) তাঁরও অনুগামীরা মতাদর্শ প্রচার করে ক্ষান্ত ছিলেন না, তাঁরা নানা ভাবে ইংরাজদের বিরুদ্ধে সুদীর্ঘ কাল লড়াই চালিয়ে গেছেন। প্রাক্ বৃটিশ ভারতে এমন অনেক সম্প্রদায় বা ধর্মাবলম্বী ছিলেন যাঁরা সম্পূর্ণ ভাবে নতুন মতাদর্শের অনুগামী। আবার একই সম্প্রদায়ের মধ্যে হিন্দু ও মুসলমান একত্রে বসবাস করছে এবং নিজেদের মধ্যে বিবাহ প্রথা চালু রেখেছে।

"... ...গাজী পীর ফকিরেরা হিন্দু মুসলমান উভয়েরই বরেণ্য হয়েছিলেন ....এইভাবে এক ধর্মের যে অন্য ধর্মের সঙ্গে সমন্বয় হয়েছিল অসংখ্য গাজী পীরের মেলা হচ্ছে তার বিস্ময়কর নিদর্শন।" (হুগলী জেলার দেব দেউল'; ১৮৬ পৃঃ শ্রী সুধীর কুমার মিত্র)

বলা হয়েছে ঃ "The Futuhat-i-Firuzshahi mentions sects that had sprung up as the result of Hindu missionary effort, and had gathered Hindus aud Muslim men and women within

their fold. With the growth of the bhakti movement, the number of Muslims seeking spiritual fulfilment in accordance with the Hindu tradition became very marked. . we have also the instance of a Hindu named Brahman who offered instruction in their traditional sciences to Muslim students." (The Indian Muslims p—234.) মৃত্যুর পর তিনশো বছর অতিবাহিত হলেও এখনো হুগলীর দামোদর পুরে অগণিত হিন্দু শিষ্যারা দার্শনিক চাঁদ শাহের মহিমা কীর্তন করেন প্রতিবছর তিন দিন ধরে এবং মেলাও অনুষ্ঠিত হয়। এমনকি আউরঙ্গজেবের আমলেও হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের ব্যবসায়ী বুর্জোয়ারা মিলিতভাবে সম্রাটের ভেদ বিভেদ নীতিকে পরাস্ত করেছিলেন। শাসক শ্রেণীর স্বার্থেই রাষ্ট্রনীতি নির্ধারিত হয়—এই রাজনৈতিক চেতনা ছাড়া তাঁদের মিলিত প্রতিরোধ সম্ভব হত না। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ ছিলেন শিখ গুরুদের শিষ্য অথবা সমর্থক। এমনকি "Pir Budhu Shah sacrificed four of his sons and a number of his disciples in the battle of Bhangani fighting on his (Guru Govind Singh—writer) side. The Muslim ruler of Malerkotla, Nawab Sher Md. Khan, raised a strong protest against the execution of Guru Govind Singh's two minor sons at Sirhind" (p 176-177 of Guru Govind Singh by Harbans Singh).

বলা হয়েছে যে " the lower strata of Moslem society also took part in the movement" (Bhakti – writer)

শ্রদ্ধেয় রামকৃষ্ণ মুখার্জি উল্লেখ করেছেন ঃ This is evidenced by the fact that there were Moslems among its leaders (Malik Md. Baba Farid.) (R & F of E. I. Comp. p 103.)

এরকম অসংখ্য দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়—তাতে দেখা যাবে, সারা ভারতবর্ষ জুড়ে সমাজের প্রতিটি সম্প্রদায়ের নির্যাতিত নিগৃহীত জনগণ বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে শুধু পুরোহিত শ্রেণীর বিরুদ্ধেই নয়—সামন্ত শ্রেণীর বিরুদ্ধেও। এমনকি বিভিন্ন রাজ্যের আন্দোলনের নেতৃত্ব একটি পর্যায়ে শাসকশ্রেণী ও তাদের পুরোহিত শ্রেণীর বিরুদ্ধে যৌথ আন্দোলনও গড়ে তুলতে সচেষ্ট ছিলেন দেখা যায়। খ্যাতনামা মারাঠা তাত্বিক সমার্থ রামদাস ১৬৩৪ খৃষ্টাব্দে পাঞ্জাবের শিখগুরু হরগোবিন্দ সিংহের সঙ্গে মিলিত হন। এই দুই রাজ্যে দুই নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির এই সাক্ষাৎকার সম্পর্কে মন্তব্য প্রসঙ্গে শ্রদ্ধেয় গান্দা সিংহ লিখেছেন ঃ He (রামদাস—লেখক) seems to have realized that the Marathas, who had much in common with the people of the Punjab in their physical and spiritual make-up, could well imbibe the

spirit of the Guru and collaborate with the Sikhs in resisting and vanquishing the intolerant Mughals.

The vision of Guru Hargovind and Samarth Ramdas was fulfilled in the eighteenth century, when the disciples of these great teachers, the Sikhs in the north and the Marathas in the south, smashed to pieces the tyrannous empire of the Great Mughals (A Brief Account of the Sikh People, p 19.) শ্রদ্ধেয় সিংহ খুব সঠিক ভাবেই উল্লেখ করেছেন "···· he (গুরু—লেখক) would not let his struggle assume the shape of a communal strife. His was a political struggle for the emancipation of his country from the tyranny of the Mughals, who happened to be Muslim by faith." (Ibid, p 32) কিন্তু রামমোহন রায় এই লড়াইগুলিকে ধর্ম রক্ষার লড়াই বলে ভুল ধারণা সৃষ্টি করেছেন। বহু মুসলমান ও হিন্দু শিখদের সঙ্গে মিলিতভাবে লড়াই করেছে সামন্ত শোষকশ্রেণীর বিরুদ্ধে। "The Bhakti movement grew and developed throughout the Middle Ages," (A. M. Dyakov—N. P. in India Today p 22)

এই আন্দোলন ছিলো বস্তুতঃ জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর নেতৃত্বে কারিগর, কৃষক ও অন্যান্য সর্ব্বহারা জনগণের। স্বভাবতই এই আন্দোলনগুলির প্রথম লক্ষ্য ছিল ব্যবসা বাণিজ্য ও পণ্য উৎপাদনের যাবতীয় অন্তরায় অপসারণ করা ও নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা আর উৎপন্ন পণ্য কেনা বেচার বাজার গড়ে তোলা। "তরুণ বুর্জোয়া শ্রেণীর কাছে প্রধান সমস্যা হলো বাজার"। (ষ্টালিন)

পণ্য বেচা কেনার বাজার গড়ে ওঠার অন্যতম একটি পূর্ব শর্ত হলো একটি সাধারণ ভাষার প্রচলন। এই সাধারণ ভাষা ছাড়া ক্রেতা বিক্রেতার পক্ষে ভাবের আদান প্রদান করা সম্ভব নয়। লেনিন বলেছেন : "Unity of language and its unimpeded development are most important conditions for genuinely free and extensive commercial intercourse on a scale commensurate with modern capitalism, for a free and broad grouping of the population in all its separate classes and lastly, for the establishment of close connection between the market and each and every proprietor, big or little, seller and buyer." (p 553, Selected Works, Vol—I).

ভক্তি আন্দোলন এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে ভাষা ও জাতীয় সাহিত্য সৃষ্টির কাজে।

"Everywhere the Bhakti movement went hand in hand

with the development of national literature in the vernaculars and it became an important stimulus in the development of national culture of India's peoples. The literature, mostly poetry, which wascalled to life by this movement was more or less of an anti-feudal character. It expressed a protest against the caste system, against the rites of official Hinduism and Islam." (quoted in Rise and Fall of E-I comp.—p-103)

বলা হয়েছে : "This movement, gave rise to a vast literature, which consisted of religious and popular writings composed mainly in verse."

"The development of the literature of most of the Indian languages is connected with this particulars movement. The Bhakts, i.e. the Bhakti preachers, were the founders of the following national literatures : Kashmiri, Assamese, Birj bhasha, Awadhi, Bengali, Oriya, Maithili, Marwari, Gujarati, Telugu etc. (A. M. Dyakov N. P. I. Today p 23)

বলা যেতে পারে দুটি সর্বভারতীয় ভাষারও জন্ম হয়, ভাষা দুটি সমৃদ্ধি লাভও করে। তারও মূলে ছিলো উভয় সম্প্রদায়ের জনগণেরই অবদান। ব্যবসা বাণিজ্যের ভাষা হিসেবে হিন্দি ভাষা ব্যবহৃত হয়ে এসেছে দীর্ঘদিন। হাজার হাজার মানুষ কথা বলেছে এই ভাষায়। তাছাড়া, তারই পাশাপাশি সৃষ্টি হয়েছে উর্দু ভাষার। অনেকেই মনে করে থাকেন যে উর্দু ভাষা বিদেশী অথবা একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের ভাষা। এই ধারণা ভুল। ভাষাটির জন্ম দিয়েছে উভয় সম্প্রদায়ের ভাষাবিদরা মিলিত ভাবে এবং ব্যবসা বাণিজ্যে, সাহিত্যে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান গ্রহণ করেছিল এই ভাষা। উর্দু ভাষার জন্ম সম্পর্কে একটি বিবরণ এখানে লিপিবদ্ধ করা হলো :

"The association of Hindus and Muslims in the administration and in civil life resulted in the formation of a common language, Urdu, which was Hindi in grammar but used the Persian alphabet The Hindus were the cheif contributors to this literature until the middle of the seventeenth century and.... . it was they who were responsible for an increasingly strong infusion of the Persian element.,, (Modern India and the west edited by L. S. S. O'Malley ; 1941)

শ্রদ্ধেয় দেয়াকভের মতে : Hindi evolved from Khari Boli, a dialect which as early as the fourteenth century formed the

basis of Urdu. (p-91) অবশ্য এই দুটি ভাষাই পুষ্ট হয়েছে নানা বিদেশী শব্দ নিয়ে। During the last period of the Mogul empire Urdu penetrated to all parts of the country. It became the language of commerce and of considerable strata of the urban population in Northern India. (N. P. I. T. p 90) উর্দু ও হিন্দি ভাষা পাশাপাশি সারা ভারতবর্ষের জনগণের [illegible] যোগাযোগের [illegible] ভাষা সাধারণ ভাষা। দাক্ষিণাত্যে উর্দু ভাষায় [illegible] ।

সাধারণ ভাষা ছাড়াও স্থানীয় ভাষা গুলির উন্নতির দরুণ স্থানীয় বাজারেও গড়ে ওঠে। "The strong growth of genuinely national literature, which left an indelible trace in the literature of nearly all the peoples of India, testifies to the fact that beginning from the XV century, in certain regions of India inhabited by its most numerous peoples, local markets were emerging and the role of the town handicrafts and trade was increasing in economic life. This process was bound to create the need in literatures in various national languages for these languages alone could serve as a means of intercourse between sellers and buyers." (quoted from R K Mukeerj's book p-103

ভারতীয় মুদ্রণ যন্ত্রেরও ব্যবহার হতে দেখা যায়। অবশ্য উল্লেখ্য, যে মুদ্রণযন্ত্র আগ্রায় পাওয়া গেছে তার অক্ষরগুলি যতদূর সম্ভব আরবী। যদি হিন্দি বা উর্দু বা আঞ্চলিক ভাষাগুলির জন্য তখনো অক্ষর তৈরী না হয়ে থাকে তবে তৈরী করা এমন কোনো কঠিন কাজ ছিল না আমাদের দেশের কর্মকারদের পক্ষে। খৃষ্টান মিশনারীরা আমাদের দেশের কর্মকারদের সাহায্যেই তাম্র বা সীসার অক্ষর নির্মাণ করান।

Modern India and the West গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে যে ঃ outside the European settlements the only purely Indian Press of which there appears to be a trace was one which was found at Agra in 1803, when that city was surrendered to Lord Lake, with type set ready for printing. When a proof was taken it was found to be part of the Koran. The type was said to have been of excellent quality, as good as anything to be found in Europe..." (p 221-222 ; edited by L. S. S. O'Malley)

ঐ গ্রন্থে আরো উল্লেখ করা হয়েছে ঃ "Typography had been in use for the production."

আরো একটি সূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে ঃ "বহুকাল পূর্বেও যে ভারতবর্ষে মুদ্রাযন্ত্র ছিল তাহার একটি প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। ওয়ারেণ হেস্টিংসের শাসনকালীন তিনি দেখিতে পান যে বারাণসী জেলার একস্থলে মৃত্তিকার কিছু নিচে পশমের ন্যায় আশালএকরূপ পদার্থের একটি স্তর রহিয়াছে। মেজর রবেক ইহার সংবাদ পাইয়া তথায় উপস্থিত হন এবং সে স্থান খনন করিয়া একটি খিলান দেখিতে পান। পরিশেষে অভ্যন্তর দেশে প্রবেশ করিয়া দর্শন করেন যে তথায় একটি মুদ্রাযন্ত্র ও স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র অক্ষর মুদ্রাঙ্কণের নিমিত্ত সাজান রহিয়াছে, মুদ্রাযন্ত্র ও অক্ষর পরীক্ষা করিয়া সিদ্ধান্ত হয়, সে-সকল একালের নয়, অন্যূন এক সহস্র বৎসর এই অবস্থায় রহিয়াছে।" (হুগলী জেলার ইতিহাস ও বঙ্গ সমাজ, ৪৭৩ পৃঃ থেকে উদ্ধৃত --বিদ্যাসাগর চরিত—সাধনা, ভাদ্র, ১৩০২ উল্লেখ্য) এ বিবরণ এক ইংরেজের বিশেষ করে ওয়ারেণ হেষ্টিংসের অনুসন্ধান-ভিত্তিক। বলা হয়েছে সহস্র বৎসর পূর্বেকার। তা যদি হয় তাহলে তার কি কোনো উন্নতি ঘটেনি? এ-সবের পূর্ণাঙ্গ অনুসন্ধান প্রয়োজন। "প্রাচীনকালে বাঙ্গলা মুদ্রাক্ষর বঙ্গ-বিহার উড়িষ্যা তথা সমগ্র ভারতবর্ষে ব্যবহৃত হইত বলিয়া ডেভিড মিল লিখিয়াছেন" বলে জানা যায়। উল্লেখ করা হয়েছে ঃ "১৬৯২ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত একটি পুস্তক সর্বপ্রথম বাঙ্গলা অক্ষরের প্রতিলিপি মুদ্রিত হয় এবং ফাদার হষ্টেন ইহার প্রথম উল্লেখ করেন। 2 Maps and 1 plate containing the characters of the people of Bengala and Baramas. শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস লিখিয়াছেন বাঙ্গলা অক্ষরের দ্বিতীয় নমুনা পাওয়া যায় ১৭২৫ খৃষ্টাব্দে লাটিন ভাষায় 'Aurenk Szeb' নামক পুস্তকে; এই পুস্তকের ৪৮ পৃষ্ঠাতে ১ হইতে ১১ পর্যন্ত বাঙ্গলা সংখ্যা এবং ৫১ পৃষ্ঠায় বাঙ্গলা ব্যঞ্জন বর্ণ ও একটি জার্ম্মান নাম "শ্রী সরজন্ত বলপকাং মাএর' (Sergeant Wolffgang Meryer) বাঙ্গলা অক্ষরে ছাপা আছে। ১৭২৫ খৃষ্টাব্দের পরে ১৭৪৩ খৃষ্টাব্দে হলাণ্ডের লাইডেন নগর হইতে ডেভিড মিল লাটিন ভাষায় একখানি পুস্তক প্রকাশ করেন উক্ত পুস্তকের শেষে হিন্দুস্থানী ভাষায় একটি ব্যাকরণ আছে, এই ব্যাকরণ অংশে বাঙ্গলা ও দেবনাগরী বর্ণমালার প্রতিলিপি মুদ্রিত আছে। সজনীবাবু তাঁহার বাংলা গদ্যের ইতিহাস নামক গ্রন্থে উক্ত প্লেটগুলি পুনঃমুদ্রিত করিয়াছেন।

ডেভিড্ মিল পূর্বোক্ত গ্রন্থের ভূমিকায় লিখিয়াছেন--'আমি আরও দুইটি বর্ণমালা তাম্রফলকে খোদাই করিয়াছি-- ব্রাহ্মণদিগের বর্ণমালার পরিচয় হিসাবে এখানি মূল্যবান বিবেচিত হইবে টেবল III B তে যে ব্রাহ্মণ বর্ণমালা (Alphabetum Brahm III B) অর্থাৎ বাঙ্গলা প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা সমগ্র ভারতবর্ষের বিশেষ করিয়া বাঙ্গলা, বিহার, ও উড়িষ্যায় ব্যবহৃত হয়।" (হুগলী জেলার ইতিহাস ও বঙ্গ সমাজ ৪২১—২২ পৃঃ)

এই সব বিবরণ থেকে একথা মনে করা ভুল হবে না যে শ্রীরামপুরের

খৃষ্টান পাদ্রীরা প্রথম বাংলা মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করেছে বা অক্ষর নির্মাণ করেছে বলে যা বলা হয় তা ইংরেজদের প্রচারও হতে পারে। তারা ভারতের অতীতকে খুব সুকৌশলে লুকিয়ে রেখেছিল বা ধ্বংস করে ফেলেছে শুধু এই কারণে যে তারা প্রমাণ করতে চেয়েছিল যে ভারতীয়রা সব বিষয়েই 'নাবালক' ছিলো—তারাই ভারতীয়দের 'সাবালক' করেছে।

সুতরাং সঠিক ইতিহাস রচিত না হওয়া পর্যন্ত আমাদের দেশের অতীতের প্রকৃত অবস্থা আমরা কোনদিনই জানতে পারবো না এবং সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়ে ওঠার পূর্ব পর্যন্ত কোনোদিনই প্রকৃত ইতিহাসও রচিত হতে পারে না—শ্রেণীবিভক্ত সমাজে সুবিধাভাগী শ্রেণীগুলির স্বার্থেই রচিত হবে ইতিহাস—তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

এখানে প্রাক বৃটিশ ভারতের যে ক্ষুদ্র চিত্রটি উপস্থিত করা হলো তা থেকে একথা অস্বীকার করা যাবে না যে রামমোহন যে-চিত্র উপস্থিত করেছিলেন—এই ভারতবর্ষ সেই ভারতবর্ষ নয়। রামমোহন যে ভারতবর্ষকে তুলে ধরেছিলেন—তা হলো শুধুমাত্র সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামার ভারতবর্ষ, মুসলমানদের দ্বারা অবিরত হিন্দু ব্রাহ্মণ হত্যার ভারতবর্ষ। শুধু বলপূর্বক ধর্মান্তরিত করার ভারতবর্ষ—যার মূলে ঐ। কিন্তু আমরা দেখি অন্য এক ভারতবর্ষ—যেখানে জন্ম হচ্ছিল নতুন সভ্যতার, গড়ে উঠছিল নতুন প্রগতিশীল সামন্ততন্ত্র বিরোধী সাহিত্য, সংস্কৃতি। আমরা দেখেছি সামন্ততন্ত্রের অভ্যন্তরে ধনতন্ত্রের উত্তরণের পথ উন্মুক্ত হতে। আর দেখেছি সেই সামন্ততন্ত্র পতনের সম্ভাবনা।

আমরা দেখেছি, যে-ব্রাহ্মণ সভ্যতা ও আরব সভ্যতা মানব সমাজকে নানা ভাগে বিভক্ত করে রেখেছিল ধর্মীয় অনুশাসনের নামে তারই বিরুদ্ধে হাজার হাজার মানুষকে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে, উচ্চে তুলে ধরতে মানবতাবাদী আদর্শকে। মসজিদ আর মন্দির তন্ত্রকে অগ্রাহ্য করে মানুষ এসে দাঁড়িয়েছে মানুষের পাশে সমস্ত ভেদাবিভেদের দেয়াল ভেঙ্গে ফেলে। সমাজের লক্ষ লক্ষ শ্রমজীবি মানুষ গর্জে উঠেছে উভয় সম্প্রদায়ের সামন্ত শাসক শ্রেণীর বিরুদ্ধে। তাই মারাঠা বাহিনী লুন্ঠন করেছে বাঙলাদেশে হিন্দু রাজা জমিদারদের আবার আলীবর্দী খাঁকে বাধ্য করেছে বার্ষিক রাজস্ব ১২ লক্ষ টাকা আদায় দিতে।

এমনি ভাবে জন্ম হচ্ছিল মোঘল শাসনমুক্ত, সামন্ত শ্রেণীর শাসনমুক্ত ভারতবর্ষ। সেই ভারতবর্ষ হয়তো পুঁজিবাদী ভারতবর্ষ ছিল না কিন্তু সেই ভারতবর্ষ ছিল পুঁজিবাদী উৎপাদনের অনুকুল সামন্ততন্ত্র বিরোধী আর নতুন মানবতাবাদী আদর্শে অনুপ্রাণীত নতুন মানব-সমাজ অধ্যুষিত ভারতবর্ষ। শ্রেণী সংগ্রামের প্রচন্ড আঘাতে সামন্ততন্ত্র হয়ে উঠেছিল পতনোন্মুখ। সামন্ত প্রভুদের অবস্থা হয়ে উঠেছিল এমন শোচনীয় যে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে তারা অগ্রাহ্য করতে চাইছিল কেন্দ্রীয় শাসনকে, যাতে তারা কেন্দ্রের প্রাপ্য রাজস্ববাবদ বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় থেকে মুক্তি লাভ করতে পারে। স্বভাবতই একে

অন্যের বিরুদ্ধে হানাহানিই ছিলো অনিবার্য। এবং একদিন দেখা গেল ইতিহাসের স্বাভাবিক নিয়মেই কেন্দ্রীয় শাসকবর্গ তাদের পূর্ব ক্ষমতা আর গৌরব হারিয়ে ফেলেছে। বলা হয়েছে ঃ

"Asaf Jah in the Deccan, Burhanul Mulk in Oudh and Ali Wardi Khan in Bangal became virtually independent, and the emperor's authority over the rest of his dominions was also purely nominal The Emperor was not only a puppet but was treated like one : the members of his family regarded the pallace as the 'sultan's prison', from which there was no escape" (The Indian Muslims p-384)

এই অবস্থায় উদীয়মান জাতীয় বুর্জোয়াদের পক্ষে কালক্রমে কেন্দ্রীয় ক্ষমতা দখল করা অসম্ভব ছিলো বলে মনে হয় না। ভারতের মত বিরাট ভূখণ্ডে প্রাকৃতিক অথবা মানবিক উভয় সম্পদেরও অভাব ছিলো না। সমুদ্র পথও ছিল উন্মুক্ত, বিস্তীর্ণ সমুদ্র উপকূল, দৈহিক গঠনে ভারতীয়রা ছিল উন্নত। বুদ্ধি, পাণ্ডিত্য, দক্ষতা ও উদ্ভাবনী শক্তিরও পরিচয় দিয়েছে তারা প্রাচীনকাল থেকে। বস্ত্রশিল্পে, জাহাজ শিল্পে, কাগজ শিল্পে, ভেষজ বিজ্ঞানে, শস্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে ভারতবর্ষ ছিল উন্নত একটি দেশ। পুঁজিবাদী উৎপাদনের জন্য যে দক্ষ শ্রমিকের প্রয়োজন ছিল বস্ত্রশিল্পে তার কোন অভাবই ছিলো না। শ্রদ্ধেয় এম, মুজিব উল্লেখ করেছেন ঃ "But the number of skilled workers was large enough to provide ample opportunity for capitalists also to employ them and porduce goods for sale" (p 375) জাতিভেদ প্রথার বিরুদ্ধে ব্যাপক আন্দোলনের ফলে এবং রাজ্য ও গ্রামস্তরে সামন্ত প্রভুদের ক্ষমতা হ্রাস লাভ করায় কলকারখানার জন্য শ্রমিকেরও অভাব ঘটতোনা। শ্রদ্ধেয় বি, বি, মিশ্র লিখেছেন ঃ "Institutions conducive to capitalist growth were not lacking in India before British rule. Indian artisan industry and occupational specialization were very highly developed.' (The Indian middle classes p-7)

এই অবস্থায় সামন্ততন্ত্রের ধ্বংসস্তূপের উপর ধনতন্ত্রে উত্তরণের সম্ভাবনা যে উজ্বল থেকে উজ্বলতর হচ্ছিল - তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। এখন একটা প্রশ্ন উঠতে পারে—কি ভাবে উন্নত মানের উৎপাদন যন্ত্রের অভাব মেটানো যেতো। মনে রাখা দরকার যে তখনো অবধি বস্ত্র ও অন্যান্য পণ্য সরবরাহের ব্যাপারে ইংলণ্ড ছিলো ভারতের উপর নির্ভরশীল। মূল্যাবাদ মূল্যবান ধাতু ছাড়া ভারতকে দেবার মত বিশেষ কিছু ছিল না। সুতরাং ইংলণ্ড থেকে উন্নত-মানের উৎপাদন যন্ত্র প্রয়োজন মত আমদানী করা যেতে পারতো। এমনকি অন্যদেশ থেকেও কেনা যেতো। তাছাড়া, ভারতে কোন দক্ষ কারিগর উন্নতমানের

উৎপাদন যন্ত্র গড়তে পারতো না—তা কখনই ভাবা যায় না। আর ভারতবর্ষে যদি কলকারখানা গড়ে উঠ্‌তো—ইংলণ্ডকে হয়তো সুদীর্ঘকাল ভারতের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হতো। কিন্তু এমনি এক যুগ সন্ধিক্ষণে বাঙলা দখল করলো তারা আর ভারতের সামাজিক অর্থনৈতিক বিকাশের পথ রোধ করে তার ঘাড়ে চাপিয়ে দিলো উপনিবেশিক শাসন, তাকে পরিণত করলো একটি কৃষি নির্ভরশীল দেশে। এইজন্য দস্যু চূড়ামণি ক্লাইভ ইংলণ্ডের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করলো আর এদেশের জগত শেঠ, মীরজাফর, হুগলীর বণিক সমাজের কতিপয় কুখ্যাত ব্যক্তি রচনা করলো ভারতের ইতিহাসে কলঙ্কিত অধ্যায় সেই ক্লাইভকে সাহায্য করে। এর চেয়ে ইংরেজরা ভারতের আর কি সর্বনাশ ঘটাতে পারে। তাই আজও সামন্ততন্ত্রের গণ্ডী ছাড়িয়ে ভারতবর্ষ এগিয়ে যেতে পারলো না, আজও ধনতন্ত্রের পূর্ণ বিকাশ ঘটলো না—আজও তার বুকের উপর বিদেশী পুঁজির প্রভুত্বের অবসান ঘটলো না। শুধু তাই নয় আজও প্রাচীন সামন্ততন্ত্রের অভিশাপে জর্জরিত হাজার হাজার মানুষ 'হরিজন' আর 'অচ্ছুৎ' হয়ে পড়ে আছে সমাজের সবচেয়ে নিচের তলায়, আজও এই বিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ঘরে ঘরে সামন্ততান্ত্রিক সংস্কৃতির প্রভুত্ব। এর চেয়ে ভারতীয়দের জীবনে মর্মান্তিক ঘটনা আর কি থাক্‌তে পারে যখন সমস্ত বিশ্বে বিজ্ঞানের জয় জয়কার।

মনে থাকতে পারে যে প্রাচীন গ্রামীণ সমাজ ব্যবস্থায় যেমন একদিকে মুষ্টিমেয় কতিপয় সুবিধাভোগী পরিবার উৎপাদনে অংশ গ্রহণ না করে উৎপাদনের অধিকাংশ আত্মসাৎ করে বিলাস বহুল জীবন যাপন করতো অন্যদিকে তেমনি উৎপাদনে কঠিন পরিশ্রম করা সত্বেও প্রতারিত ও লাঞ্ছিত হতো শ্রমজীবি জনগণ। পুরোহিত শ্রেণীর অনুশাসন ছিল উল্লিখিত সমাজ ব্যবস্থার অনুকূলে। অর্থাৎ সমাজ ব্যবস্থার সঙ্গে ধর্মীয় অনুশাসন ছিল অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। ফলে সেই সমাজ ব্যবস্থায় পরিবর্তন হয়ে উঠলো ধর্মাচরণে হস্তক্ষেপের সামিল। স্বাভাবিকভাবে বিশেষ ক্ষুন্ন হলেন উচ্চবর্ণের হিন্দুরা। কেননা এঁরাই ছিলেন সমাজের উপর তলায়। এই ক্ষুন্ন হওয়ার একটি বিশেষ কারণ হলো এই যে রাষ্ট্রের কাছে 'শূদ্র' ও ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয়—তাঁরা সকলেই একই সমাজের মানুষ বলে গণ্য হলেন। তাঁরা ভিন্ন ধর্মী শাসকবর্গকে মেনে নিলেও শূদ্রদের কিছুতেই সহ্য করতে পারলেন না। শূদ্রের অধিকার স্বীকার করে নেওয়াকে তাঁরা অপমানজনক বলে মনে করলেন। তার একটি দৃষ্টান্ত এখানে দেওয়া গেল। "কায়স্থকুলসম্ভূত তোডরমল্ল সম্রাট আকবরের অর্থসচিব ছিলেন। তাঁহার অধীনে অনেক বিচক্ষণ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত কর্ম করিতেন। ইঁহাদের মধ্যে অনেকেই তোডরমল্লের অধীনতা পছন্দ করিতেন না। তাঁহারা বলাবলি করিতেন যে 'কর্মস্থানে আসিয়া প্রথমেই একজন শূদ্রের মুখ দর্শন করিতে হয়—ইহা অপেক্ষা বিড়ম্বনা আর কি আছে? বাদশাহ ম্লেচ্ছ হইলেও রাজা বলিয়া তাঁহাকে বিষ্ণুর

অংশস্বরূপ জ্ঞান করিতে শাস্ত্রের আদেশ আছে। কিন্তু শূদ্রের নিকট মস্তক অবনত করিবার কথা শাস্ত্রে কোথাও নাই' ইত্যাদি। ব্রাহ্মণগণের উদ্দেশ্য তোডরমল্ল ইহা শুনিয়া যদি বিরক্ত হইয়া কর্মান্তর গ্রহণ করেন তবে তাঁহারা নিশ্চিন্ত হইতে পারেন, ····" (হুগলী জেলার ইতিহাস ও বঙ্গ সমাজ-১৬৫ পৃঃ—শ্রী সুধীর কুমার মিত্র)

দেখা যায় বংশপরম্পরায় ধর্মাচরণের নামে তাঁদের প্রভুত্ব চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল সমাজের নব্বই ভাগ মানুষের উপর যারা ছিলেন শ্রমজীবি জনতা। সেই শ্রমজীবি জনতাকে বস্তুতঃ ফেলে রাখা হয়েছিলো তাঁদের ক্রীতদাসের পর্যায়ে। এই প্রসঙ্গে মহামতি মার্কসের একটি ঐতিহাসিক উক্তি স্মরণ যোগ্য।

"এই সব শান্ত সরল (idyllic) গ্রাম গোষ্ঠীগুলি যতই নিরীহ মনে হোক প্রাচ্য স্বৈরাচারের তারাই ভিত্তি হয়ে এসেছে চিরকাল, মনুষ্য মানসকে তারাই যথাসম্ভব ক্ষুদ্রতম পরিধির মধ্যে সীমাবদ্ধ করে রেখেছে, তাকে বানিয়েছে কুসংস্কারের অবাধ ক্রীড়নক, তাকে করেছে চিরাচরিত নিয়মের ক্রীতদাস, হরণ করেছে তার সমস্ত কিছু মহিমা ও ঐতিহাসিক কর্মদ্যোতনা। যে বর্বর আত্মপরতা এক একটা হতভাগ্য ভূমি খণ্ডের উপর পুঞ্জীভূত শান্তভাবে প্রত্যক্ষ করে গেছে সাম্রাজ্যের পতন, অবর্ণনীয় নিষ্ঠুরতার অনুষ্ঠান, বড়শহরের অধিবাসীগণের হত্যাকাণ্ড, প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর চাইতে একতিল বেশী বিবেচনা এদের সম্পর্কে করেনি, এবং দৈবাৎ আক্রমণকারীর লক্ষ্যপথে পড়লে যা নিজেও হয়ে উঠেছে আক্রমণকারীর এক অসহায় শিকার·······এই হীন, অনড়, ও উদ্ভিদসুলভ জীবন, এই নিষ্ক্রিয় ধরনের অস্তিত্ব থেকে অন্যদিকে, তার পাল্টা হিসাবে সৃষ্টি হয়েছে বন্য লক্ষহীন এক অপরিসীম ধ্বংশ শক্তি এবং হত্যা ব্যাপারটিকেই হিন্দুস্থানে পরিণত করেছে এক ধর্মীয় প্রথায়।·······ছোট ছোট এই সব গোষ্ঠী ছিল জাতিভেদ প্রথা ও ক্রীতদাসত্ব দ্বারা কলুষিত, অবস্থার প্রভুরূপে মানুষকে উন্নত না করে তাকে করেছে বাহিরের অবস্থার অধীন, স্বয়ং বিকশিত একটি সমাজ ব্যবস্থাকে তারা পরিণত করেছে অপরিবর্ত্তমান প্রাকৃতিক নিয়তিরূপে এবং এইভাবে আমদানী করেছে প্রকৃতির পশুবৎ পূজা, প্রকৃতির প্রভু যে মানুষ তাকে হনুমান-দেব রূপী বানর এবং শবলা দেবীরূপী গরুর অর্চনায় ভূলুণ্ঠিত করে অধঃ-পতনের প্রমাণ দিয়েছে।"

গ্রামীণ সমাজ ব্যবস্থা পরিবর্ত্তনের ফলে—ধনী অভিজাত শ্রেণীগুলি নানা-ভাবে যে-সুযোগ সুবিধা ভোগ করতেন সেগুলি থেকে বঞ্চিত হওয়ায় এবং তাঁদের ক্ষমতা হ্রাস পাওয়ায় উল্লিখিত পরিবর্তন তাঁরা কিছুতেই মেনে নিতে পারেন নি। এই পরিবর্ত্তনকে যে তারা ধর্মে হস্তক্ষেপ বলে প্রচার করবেন তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। প্রাচীন গ্রামীন সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন না ঘটায় সুদীর্ঘকাল সমাজের অগ্রগতির যে-পথ রুদ্ধ ছিল তা উন্মুক্ত করার বিশেষ প্রয়োজন ছিল কোটি কোটি মানুষের স্বার্থে। কিন্তু শাসকশ্রেণী সেই প্রয়োজন সাধনের জন্য

সচেতনভাবে এই পরিবর্তন করেনি, করেছিল তাদের নিজেদের স্বার্থেই। তবু এই পরিবর্ত্তন পুরোহিত তন্ত্রের অত্যাচার থেকে সমস্ত শ্রমজীবি মানুষকে শুধু মুক্ত করেনি, বিভিন্ন দিক থেকে সমাজের অগ্রগতি ঘটেছে। বলাই বাহুল্য শুধু শাসক শ্রেণীর নতুন নিয়ম কানুন জারির ফলেই যে এই পরিবর্ত্তন ঘটেছে তা ঘটেনি; জনগণের সংগ্রামের প্রচন্ড আঘাতও ছিল সেই পরিবর্তনের মূলে। সমাজের মুষ্টিমেয় কতিপয় পরিবার এই পরিবর্তনকে ধর্মাচরণে বা সম্পত্তি রক্ষার অধিকারে হস্তক্ষেপ বলে মনে করেছে ঠিক কিন্তু নব্বুই ভাগ মানুষ—সমগ্র শ্রমজীবি জনতা—এই পরিবর্ত্তনকে ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ বলে যে মনে করেছিল তাতে সন্দেহ করার কিছু নেই।

প্রাক বৃটিশ ভারতের এই নব-জাগরণ সম্পর্কে রামমোহন সম্পূর্ণ নীরব।

ইংরাজ শাসনের তৃতীয় স্তম্ভ

ইংরাজ সৃষ্ট জমিদার ও ব্যবসায়ী বুর্জোয়া—এই দুটি শ্রেণী ছাড়াও আর একটি নতুন শ্রেণীর জন্ম দেওয়া হলো—যা ঐ দুটি শ্রেণীর মতই বৃটিশ শাসনকে এ-দেশে কায়েম রাখতে তৎপর থেকেছে। বলাই বাহুল্য, এই নতুন শ্রেণীটি হলো—ভারতের ইংরাজী শিক্ষিত সম্প্রদায়। উল্লিখিত জমিদার ও ব্যবসায়ী বুর্জোয়াদেরই সন্তান সন্ততি—এই ইংরাজী শিক্ষিত সম্প্রদায়।

রামমোহন বিলেতে পার্লামেন্টের সিলেকট কমিটিতে সুপারিশ করেছিলেন—এই নতুন ইংরাজী শিক্ষিত সম্প্রদায়ের লোকদের শাসন ব্যবস্থার বিভিন্ন বিভাগে যোগ্যতা অনুযায়ী নিযুক্ত করে শাসন ব্যবস্থার অভ্যন্তরে একটি নতুন দেশীয় স্তম্ভ গড়ে তুলতে—যাতে এই তৃতীয় স্তম্ভটি বৃটিশ শাসন রক্ষার কাজে যোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে। তিনি বলেছিলেন যে—এই নতুন শ্রেণীর লোকদের সুযোগ সুবিধা দান করলে তারা চিরকাল ইংরাজ শাসনের প্রতি অনুরক্ত থাকবে।

শ্রদ্ধেয় বিমান বিহারী মজুমদার লিখেছেন: " Rammohun suggested various means by which the union between India and Great Britain might become permanent." (History of Political thought ; 1934, p-77) তাঁর মতে ভারতে বৃটিশ শাসনকে সুদৃঢ় করা এবং কায়েম রাখা সম্ভব—"........by the influence of the intelligent and

respectable classes of the inhabitants, and by the general goodwill of the people, ". তাতে শুধু মাত্র সামরিক শক্তি প্রয়োগ করে শাসন ক্ষমতা বজায় রাখতে ও জনসাধারণের মধ্যে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকতে হবে না।

শ্রদ্ধেয় মজুমদার উল্লেখ করেছেন: "The peasantry and the villagers in the interior are quite ignorant, and indifferent about either the former or present govt,' wrote the Raja in 1831, 'and attributed the protection they might enjoy or oppression they might suffer to the conduct of the public officers immediately presiding over them' 'But men of aspiring character and members of such ancient families as are very much reduced by the present system, consider it derogatory to accept the trifling public situations which natives are allowed to hold under the British Govt., and are decidedly disaffected to it. Many of those, however, who engage prosperously in commerce, and of those who are secured in the peaceful possession of their estates by the permanent settlements, and such as have sufficient intelligence to foresee the probability of future improvement which presents Itself under the British rulers, are not only reconciled to it, but really view it as a blessing to the country. But I have no hesitation in stating, with reference to the general feeling of the more intelligent part of the Native community that the only course of the policy which can ensure their attachment to any form of Govt, would be that of making them eligible to gradual promotion, according to their respective abilities and merits, to situations of trust and respectability in the State." (History of political thought p-14-15)

দেশী-বিদেশী উভয় পক্ষের গরজেই জমিদার ও ব্যবসায়ী বুর্জোয়া শ্রেণীর মত এই নতুন ইংরাজী শিক্ষিত শ্রেণীটিরও সৌভাগ্যের দ্বার উন্মুক্ত হয়ে গেল ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের সনদে। এই নতুন সনদে বলা হলো: 'no native of the said territories, nor any natural-born subject to His Majesty resident therein, shall, by reason only of his religion, place of birth, descent, colour or any of them, be disabled from holding any place or employment under the said Com-

pany.' (যুগন্ধর মধুসূধন ; শ্রী শীতাংশু মৈত্র, ১৩৬৫, ১৬ পৃঃ) এই শ্রেণীটিই হলো তৃতীয় স্তম্ভ এবং তাকে স্থায়ীভাবে গড়ে তোলার ব্যবস্থা করা হলো। বস্তুতঃ এই ইংরাজী শিক্ষিত শ্রেণীটিই ইংরাজ আর দেশবাসীর মাঝখানে দাড়িয়ে থেকে জনগণকে শাসন করে এসেছেন এবং ইংরাজ অফিসারদের অধীন থেকে তাঁদের নির্দ্দেশমত দেশী বিদেশী স্বার্থে শোষণ, লুণ্ঠনে সাহায্য করে এসেছে, উৎপীড়ন চালিয়ে এসেছে। শুধু যে এ'রা প্রশাসন যন্ত্রেই অংশ গ্রহণ করেছিলেন তা নয়; বিচার বিভাগ, সৈন্য বিভাগেও দেশীয় স্তম্ভ গড়ে তোলা হয় এ'দেরই সাহায্যে। দেশীয় অফিসাররাই ইউরোপিয়ান অফিসারদের অধীনে থেকে দেশীয় সাধারণ সৈনাদের দমন করে রাখতেন এবং দেশের জনগণের পক্ষ থেকে বিদ্রোহ দেখা দিলে দেশীয় সৈনাদের বাধ্য করতেন বিদ্রোহীদের দমন করতে।

আমরা যে বলে থাকি বৃটেন এদেশকে শাসন করতো—তা অংশত সত্য। বস্তুতঃ এই দেশীয় অফিসাররাই ইংরেজ অফিসারদের অধীনে থেকে এদেশের শাসনকার্য চালাতো। এ-সম্পর্কে কার্লমার্কসের একটি উক্তি স্মরণ করা যেতে পারে। "ভারতের সৈনাবাহিনীতে বিদ্রোহ" প্রসঙ্গে তিনি লিখেছিলেন ঃ "২০ কোটি দেশীয়রা দমিত হচ্ছে ২ লাখ লোকের এক দেশীয় সৈন্যবাহিনী দ্বারা যাদের অফিসাররা সব ইংরাজ ; আর এই দেশীয় সৈন্য বাহিনীকে আবার সংযত করে রাখছে মাত্র ৪০,০০০ লোকের এক ইংরাজ সৈন্যবাহিনী।" রাষ্ট্র-যন্ত্রের মূল অংশই হলো এই সৈন্য বাহিনী। শাসক শ্রেণীর ক্ষমতার মূল উৎস হলো—এই সশস্ত্র শক্তি। এই সশস্ত্র শক্তি হাতছাড়া হয়ে গেলে বর্ত্তমান শাসকশ্রেণীর অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে ওঠে। মনে রাখতে হবে যে ক্ষুদ্র বৃটেনের পক্ষে শুধুমাত্র বৃটিশ সামরিক শক্তির সাহায্যে এদেশ যেমন দখল করা সম্ভব হয়নি তাদের শাসনও কায়েম রাখা তেমনি সম্ভব ছিল না, যদি দেশীয় জমিদার ও ব্যবসায়ী বুর্জোয়ারা সহযোগী শক্তিরূপে তাদের সাহায্য না করতো। বস্তুতঃ এই দুটি শ্রেণীই ইংরাজদের সহযোগী শক্তিরূপে ভারতের কোটি কোটি মানুষকে—কৃষক, কারিগর, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী বুর্জোয়া ও অন্যান্য পেশার মানুষকে শোষণ ও শাসন করে এসেছে এবং এই ভাবে বৃটিশ স্বার্থ রক্ষা করেছে। তৃতীয় শ্রেণীটি অর্থাৎ প্রশাসন যন্ত্রের ও সৈন্যবাহিনীর আমলা শ্রেণীটি বা ইংরাজী-শিক্ষিত শ্রেণীটি মূলতঃ উল্লিখিত দুটি শ্রেণীরই লোকজন। সত্য কথা বলতে ঐ তিনটি শক্তি সৃষ্টি করে বুদ্ধিমত্তারই পরিচয় দিয়েছিল ইংরাজরা। ইংরাজদের ওই তিনটি শ্রেণী—জমিদার, বুর্জোয়া ও বিরাট আমলা বাহিনী জাতীয় শত্রুর সহায়তায় জাতীয় শত্রুর ভূমিকা গ্রহণ করায় শ্রেণীগুলি জনগণের চোখে জাতীয় শত্রুরূপে চিহ্নত হয়ে এসেছে। রাজনীতি সচেতন লোক মাত্রই স্বীকার করবেন যে এই তিনটি শ্রেণী ভারতের সমস্ত অভ্যুত্থান ইংরেজদের পাশে থেকে দমন করেছিল সর্ব্বশক্তি নিয়োগ করে।

রামমোহন ছিলেন বস্তুতঃ এই তিনটি শ্রেণীরই মুখপাত্র।

সিলেকট কমিটিতে রামমোহন আর একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এবং তারও মূল উদ্দেশ্য হলো ভারতীয় জনগণকে দমন করে রাখা। এ জন্যে তিনি এক নতুন উপায় উদ্ভাবন করেছিলেন। অর্থাৎ কত কম ব্যয়ে (নিয়মিত সৈন্যবাহিনীর আকার ক্ষুদ্র করে) একটি ঔপনিবেশিক দমন যন্ত্র গড়ে তোলা যায়। শ্রদ্ধেয় বিমান বিহারী মজুমদার মহাশয় উল্লেখ করেছেন: In order to reduce the cost of administration the Raja suggested another refom of far-reaching consequence. This was no less than the substitution of a militia force for the standing army. He maintained that permanent settlement with the cultivators, would make them so much attached to the British Govt. that it would be unnecessary to maintain a standing army.

"This consideration is of great importance," observed the Raja, 'in respect to the natives of the upper and western provinces, who are distinguished by their superior bravery, and form the greater part of the British Indian army. If this race of men, who are by no means deficient in feelings of personal honour and regard for family respectability, were assured that their rights in the soil were indefeasible so long as the British power should endure, they would from gratitude and self-interest at all times be ready to spend their lives and property in its defence. The saving that might be effected by this liberal and generons policy, through the substituting of a militia force for a great part of the present standing army, would be much greater than any gain that could be realised by any system of increasing land revenue that human ingenuity could devise." (History of political thought 1934, p-70)

রামমোহন ও ভূমিরাজস্ব হ্রাসের প্রস্তাব

রামমোহন বিলেতে সিলেকট কমিটির কাছে ভারতীয় প্রজাদের ভূমি রাজস্বের হার হ্রাস করার জন্য আবেদন করেন। "In order to make good the loss the Raja suggested three methods. ..The second (method) was the reduction of expenses of the revenue establishment. He suggested that Indians of respectability might be appointed collectors on a salary of about three or four hundred rupees p.m, in place of European collectors drawing a salary of a thousand or fifteen hundred rupees p m. He quoted the authority of men like to show the expediency and advantage of appointing Indian revenue officers to the higher situations in the revenue department. Rammohan held that the suggested reform, if carried out, ... make the higher class of Indians contented and therefore efficient." (History of Political Thought, p-69-70) বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবিরা রামমোহনের এই প্রস্তাবটি তুলে ধরে এমন তুলকালাম কাণ্ড সৃষ্টি করে থাকেন তাতে মনে হবে রামমোহন যেন কৃষকের অকৃত্রিম বন্ধু ছিলেন। এ'রা সকলেই কৃষকদের মূল সমস্যাগুলির কথা আড়াল করার চেষ্টা করে থাকেন। প্রথমতঃ রাজস্ব ছাড়াও জমিদাররা আইনি ও বে-আইনি ভাবে যে-পরিমাণ অর্থ তাদের কাছ থেকে আদায় করা হতো তার পরিমাণ ছিল রাজস্বের বহুগুণ বেশী। ফলে রাজস্ব হ্রাস করা, না করা—উভয়ই ছিল একই সমান। বরং রাজস্ব হ্রাসের ফলে জমিদারদের দেয় রাজস্বের পরিমাণ কমে যেতো অথচ প্রজাদের নিয়মিতভাবে আদায় দিতে বাধ্য করতো জমিদাররা। দ্বিতীয়তঃ মোগল আমলে জমি ছিল চাষীর। বংশ পরম্পরায় সে-জমি তারা চাষ করে এসেছে কিন্তু বৃটিশ আমলে কৃষকের জমি থেকে উচ্ছেদ করে সেই জমির মালিক করে দেওয়া হলো মোগল আমলে রাজস্ব আদায়কারী জমিদারদের আর কতকগুলো শহুরে ফড়ে, মহাজন ইজারাদারদের। স্বভাবত কৃষকদের আর্থিক বোঝা সমান রেখে—প্রথমত জমিদারদের আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে, দ্বিতীয়ত বৃটিশ সরকারের প্রশাসনিক ক্ষেত্রে আর্থিক ব্যয় হ্রাস করে বুর্জোয়া ও জমিদার শ্রেণীর সন্তান সন্ততিদের চাকুরীর ক্ষেত্র প্রশস্ত করতে চেয়েছিলেন রামমোহন এবং সেদিকে লক্ষ রেখেই রাজস্বহ্রাসের প্রস্তাব করা হয় তা তাঁর প্রস্তাবটিই জ্বলন্ত প্রমাণ।

দালাল বুর্জোয়াশ্রেণীর জন্ম

রামমোহন ছিলেন একজন ব্যবসায়ী বুর্জোয়া। আবার জমিদারও। এই বুর্জোয়া শ্রেণীটি মোগল আমলের স্বাধীন বুর্জোয়া শ্রেণী নয়। দেখা যায়, এই শ্রেণীটির সৃষ্টি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর স্বার্থে। তা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। সমাজে এই নতুন শ্রেণীটির জন্ম, বিকাশ ও ধনসম্পত্তির উপার্জনের মূল উৎস সম্বন্ধে অনেকের কৌতুহল হতে পারে। এই শ্রেণীটি হলো ইতিহাসের দালাল (compiador) ব্যবসায়ী বুর্জোয়া শ্রেণী।

একথা সর্বজনবিদিত যে ক্ষমতা দখলের প্রথম দিন থেকেই দেশীয় লোক-জনদের সাহায্য বিশেষ প্রয়োজন হয়ে পড়লো ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর। প্রথমতঃ ভাষার অসুবিধে। দেশীয় জনসাধারণের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের জন্য দ্বিভাষী প্রয়োজন সবচেয়ে বেশী। দ্বিভাষীর কাজ করার উদ্দেশ্যে ইংরেজী ভাষা শিখবার জন্য সর্ব প্রথম এগিয়ে আসে ইতিহাস কুখ্যাত উমিচাঁদ। নানা রকম পেশার মানুষের প্রয়োজন হলো সে সময়। এরা অনেকেই ছিলো কোম্পানীর দেশীয় কর্ম-চারী, ফড়ে, মহাজন, গোমস্তা, নায়েব, কেরানী, ব্যবসায়ী, বেনিয়ান, দ্বিভাষী, দালাল ইত্যাদি। অর্থবান বাঙ্গালীরা সে সময় বিদেশী Firm, ইংরেজ অফিসার ও বণিককে চড়া সুদে টাকা কর্জ দিতেন। "এই সব ফার্মের দেওয়ান, বেনিয়ান, সদরমেট, মুৎসুদ্দি, প্রভৃতি হলেই তাঁরা সৌভাগ্য বলে মনে করতেন।" "বেনি-য়ানরা ছিলেন ফার্মের ইন্টার প্রেটার, প্রধান হিসাব রক্ষক, প্রধান সম্পাদক, প্রধান দালাল, মহাজন, অর্থরক্ষক এবং বেশীরভাগ ক্ষেত্রে বিশ্বাসভাজন কর্মচারী। .... ইংরেজ প্রভুত্ব এদেশে কায়েম হওয়ার পর থেকে প্রধান প্রধান হিন্দু পরিবারের লোকেরা এই চাকরি পাবার জন্যে বেশ উৎসুক থাকেতেন।" (Calcutta in olden time"—Calcutta Review ; 1860—"স্বাধীনতার সংগ্রামে বাঙলা" থেকে উদ্ধৃত p-34)

তখন এই শ্রেণীর লোকদেরই ইংরাজী শেখাবার বিশেষ প্রয়োজন হয়ে পড়ে। যাতে তাঁরা ইংরাজ বণিক এবং দেশীয় উৎপাদক শ্রেণীর মধ্যে যোগাযোগ রক্ষার কাজ করতে পারেন।

এই সব ভাগ্যান্বেষী কোম্পানী অথবা তার কর্মচারীদের শোষণ-লুন্ঠনের কাজে সাহায্য করে বিপুল পরিমাণ অর্থ উপার্জন করে ধনকুবের হয়ে ওঠে। কোম্পানীর অনুগ্রহ লাভ করে এরাই কোলকাতার ধনী অভিজাত শ্রেণীর সমাজে গণ্যমান্য ব্যক্তি হয়ে ওঠে। অনেক ভাগ্যান্বেষী কোম্পানী অথবা তার কোনো কর্মচারীর অধীনে কোনোমতে একটা কাজ যোগাড় করে নিয়ে চাকরী করার পাশাপাশি ব্যবসা বাণিজ্যও চালাতো। মহাজনী সুদী কারবার, বন্ধকীর ব্যবসা,

কোম্পানীর অফিসারদের টাকা কর্জ দেবার কারবার ছিলো বহু লোকের। সুদ বাবদ প্রচুর অর্থ উপার্জন করতো মহাজনরা। কেননা বিলেত থেকে টাকা আনানোর বিশেষ অসুবিধা থাকায় ব্যবসা বাণিজ্য ঠিকমত চালাবার জন্য চড়াসুদে হামেশাই টাকা কর্জ করতো ইংরেজরা। ইংরেজ মনিবের শক্তিতে শক্তিমান হয়ে দেশীয় কর্মচারীরা নিজের দেশের মানুষের উপর অমানুষিক উৎপীড়ন, শোষণ, লুণ্ঠন চালাতে কুণ্ঠিত হতো না।

লর্ড মেকলে এদের সম্পর্কে যে বিবরণ দিয়েছেন তা ভয়াবহ। বলেছিলেন "কোম্পানির কর্মচারীরা তাহাদের আশ্রয়ে একদল দেশীয় কর্মচারী নিয়োগ করিত। এই দেশীয় কর্মচারীরা যে অঞ্চলেই উপস্থিত হইত সে অঞ্চলই ছারখার করিয়া দিত, সেইখানেই সন্ত্রাসের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করিত। বৃটিশ কোম্পানির প্রত্যেকটি কর্মচারী ছিল তাহার প্রভুর (উচ্চপদস্থ কর্মচারীর) শক্তিতে শক্তিমান, আর প্রত্যেকটি প্রভুর শক্তির উৎস ছিল স্বয়ং ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। শীঘ্রই কলিকাতায় বিপুল ধনসম্পদ সঞ্চিত হইয়া উঠিল, তাহার সঙ্গে সঙ্গে তিন কোটি মানুষ দুর্দশার শেষ স্তরে আসিয়া দাঁড়াইল। ইহা সত্য যে, বাংলার মানুষ শোষণ ও উৎপীড়ন সহ্য করিতে অভ্যস্ত, কিন্তু এই প্রকারের শোষণ ও উৎপীড়ন তাহারাও কোন দিন দেখে নাই।" (ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম থেকে উদ্ধৃত p-9)। মেকলের বিবরণ যদিও একপেশে, তবু ইংরেজ কর্মচারী এবং তার দেশীয় কর্মচারীর আক্রমণাত্মক ভূমিকা বুঝতে অসুবিধা হয় না। ক্লাইভেরও একই বক্তব্য। তিনিও বলেছিলেন : I can only say that such a scene of anarchy, corruption and extortion was never seen or heard of in any country but Bengal. ... Under the obsolete management of the company's servants."

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর এবং মধ্যস্বত্বাধিকার ব্যবস্থা চালু হওয়ায় কোলকাতার এইসব লোকদের সামনে বাড়তি সুযোগ এসে গেলো শহরে বসবাস করে জমিদারিতে টাকা খাটাবার। এই সব সুবিধা দেখে তারা জমিদারি কিনতে লাগলো। স্বর্গীয় রমেশ চন্দ্র বলেছেন : "পুরাতন জমিদারগণ অধিকাংশই স্থান চ্যুত হইলেন।" "জমিদারগণের চক্ষের উপর তাহাদের পৈতৃক সম্পত্তি কলিকাতার তেজারতগণের হস্তগত হইয়া যাইতে লাগিল।" (রমেশ চন্দ্র দত্ত-প্রবন্ধ সংকলন-নিখিল সেন সম্পাদিত) মার্কস বলেছেন : "কয়েকটি ক্ষেত্রে জমিদাররা বিতাড়িত হয়, তাদের জায়গা জুড়ে বসে ইঃ ইঃ কোম্পানী মালিক হিসাবে ; অন্যান্য ক্ষেত্রে জমিদাররা গরীব হয়ে পড়ে, বকেয়া খাজনা এবং ব্যক্তিগত ঋণ শোধ করার জন্য জমি (জমিদারী-লেখক) বেচে দেয় স্বেচ্ছায় অথবা বাধ্য হয়ে। এর ফলে প্রদেশের বেশীর ভাগ জমি (জমিদারী-লেখক) দ্রুতগতিতে

কয়েম হল কয়েকটি শহুরে পুঁজিপতির যাদের অতিরিক্ত টাকা ছিল এবং তা তারা সাগ্রহে খাটাতে লাগলো।"

মার্কসের আর একটি উক্তিও স্মরণীয়ঃ "...মূল জমিদার শ্রেণী (প্রথম যুগের, অর্থাৎ যাহাদের সহিত প্রথম চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হইয়াছিল—সু. রায়) কোম্পানির চাপে নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল এবং ইহাদের স্থান গ্রহণ করিল শহুরে, চতুর ফড়িয়া ব্যবসায়িগণ। ....বঙ্গদেশের প্রায় সমস্ত ভূসম্পত্তি এখন এই ফড়িয়া ব্যবসায়িগণের কবলে পতিত হইয়াছে। এই ফড়িয়া ব্যবসায়িগণ আবার 'পত্তনি' নামে এক প্রকারের নূতন ভূমিস্বত্ব সৃষ্টি করিয়াছে।" (ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম ১৬৯ পৃঃ থেকে) এরা ব্যবসায়ী বুর্জোয়া শ্রেণীতে পরিণত হলো আর এই ভাবেই ইংরেজদের স্বার্থ রক্ষার জন্য দেশীয় সহযোগী শক্তি হিসাবে সমাজে জমিদার শ্রেণীর পাশাপাশি আর একটি নতুন শ্রেণীর জন্ম হলো। দালাল ব্যবসায়ী বুর্জোয়া শ্রেণী। এরাই হলো বৃটিশ শাসন কায়েম রাখার দ্বিতীয় স্তম্ভ। মনে রাখতে হবে বিদেশী উপনিবেশিক শক্তির গর্ভেই এদের জন্ম। আগেই বলেছি এরাই ছিল প্রথমদিকে ইংরেজদের বেনিয়ান বা গোমস্তা। শ্রদ্ধেয় রাঃ কৃঃ মুঃ লিখেছেন ঃ 'Now, a colonial mercantile bourgeoisie, in the form of banyans and gomastahs of the English, took birth in the womb of English merchant capital in India. But from the time they came into the world they had a stunted and abnormal growth". তিনি আরো লিখেছেন ঃ "Subservient to the needs of the English, as against those of the Indians (the two could not be reconciled), they could only develop through roguery and anti-popular activities", (R & F of E. I. Comp. p-181) ফলে, একই ব্যক্তি একই সঙ্গে হলো সামন্ত শোষক ও ব্যবসায়ী বুর্জোয়া আর সামন্ত স্বার্থের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত হলো বাণিজ্য পুঁজির স্বার্থ। বৃটিশ পুঁজির স্বার্থ দেশীয় জমিদার ও ব্যবসায়ী শ্রেণীর স্বার্থ প্রায় এক ও অভিন্ন হয়ে দাঁড়ালো। এই গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের ফলে বৃটিশ পুঁজির স্বার্থ রক্ষার দায়িত্ব শুধু বৃটেনের হাতে ন্যস্ত থাকেনি; দেশীয় জমিদার ও ব্যবসায়ী শ্রেণীর উপর ন্যস্ত হলো।

যাই হোক, মধ্যস্বত্ব চালু হওয়ায় "Many of them became absentee land lords who preferred to live in luxury in their Calcutta mansions rather than share with the villagers their joys and sorrows. They engaged in trade ".

রামমোহন ছিলেন এই ব্যবসায়ী বুর্জোয়া শ্রেণীরই একজন। দ্বারকানাথ ঠাকুরও ছিলেন একই শ্রেণীর। উভয়েরই ধন সম্পদের মূলে বৃটিশ শাসকবর্গের অনুগ্রহ। রামমোহনের জীবনী লেখক শ্রদ্ধেয় ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন ঃ

তিনি (রামমোহন-লেখক) কোম্পানীর কাগজ কিনিতেন ও উহার ব্যবসা করিতেন। ১৮০২ খৃষ্টাব্দে তিনি কলিকাতায় টমাস উডফোর্ড নামে কোম্পানীর আর এক জন সিবিলিয়ানকে পাঁচ হাজার টাকা কর্জ দেন। ……ইহার কয়েকমাস পরেই রামমোহন ঢাকা-জামালপুরে (বর্ত্তমানে ফরিদপুরে) যথারীতি জামিন দিয়া উডফোর্ডের দেওয়ান নিযুক্ত হইয়াছেন (৭ই মার্চ ১৮০৩) দেখিতে পাই। উডফোর্ড ঢাকা জামালপুরের কালেকটার ছিলেন। "……আমরা তাঁহাকে ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে লাঙুল পাড়ায় একটি তালুক কিনিতে দেখি।" ১৮০৫ খৃষ্টাব্দের পর "রামমোহন ডিগবীর অধিনে কর্ম গ্রহণ করেন।" রামগড়ে তিনি ডিগবীর অধিনে সেরেস্তাদার ছিলেন। ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে মাত্র কয়েক মাসের অস্থায়ী দেওয়ান ছিলেন কোম্পানীর অধীনে। শ্রদ্ধেয় বন্দ্যোপাধ্যায় উল্লেখ করেছেন : দুইবার অল্পকালের জন্য ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর চাকুরী করেন। বাকী সময় তিনি ডিগবীর খাস কর্ম্মচারী ছিলেন। ডিগবী যে-সময়ে যশোহরে ছিলেন (ডিসেম্বর ১৮০৭—জুন ১৮০৮), তখন রামমোহন যে তাঁহার খাস ফার্সী মুন্সি ছিলেন, একথার উল্লেখ ডিগবীর একটি চিঠিতে আছে।" (রামমোহন ৩০-৩১ পৃঃ) এই বিবরণ থেকে স্পষ্ট যে যখন তিনি ফার্সী মুন্সি ছিলেন তখন নিঃসন্দেহে দ্বিভাষীর কাজই করতেন। শ্রদ্ধেয় বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন : দেশীয় লোকের সহিত কাজ-কর্ম্মের সুবিধার জন্য সেকালের অনেক সাহেব বাঙ্গালী "বাবু" রাখিতেন। ইঁহাদিগকে দেওয়ান বলা হইত। রামমোহনও ডিগবীর সহিত এইরূপেই সম্পৃক্ত ছিলেন। তিনি সাধারণ লোকের নিকট "ডিগবীর দেওয়ান" বলিয়া পরিচিত ছিলেন।" (ঐ)

"এই সময়ে রংপুর ও কলিকাতা দুই জায়গাতেই তাঁহার হিসাবনবীশ ও তহবিলদার ছিল।" শ্রদ্ধেয় বন্দ্যোপাধ্যায় উল্লেখ করেছেন : রংপুর ছাড়িয়া কলিকাতার স্থায়ী বাসিন্দা হইবার পর রামমোহন 'বেনিয়ানের' কাজ করিতেন, ইহার উল্লেখ সে-কালের সুপ্রিম কোর্টের জুরির তালিকায় পাওয়া গিয়াছে। এই কয় বৎসরের মধ্যে রামমোহন তিনটি তালুক কেনেন।" (ঐ ৩২ পৃঃ) "……রামমোহন মাত্র এক বৎসর নয় মাস বিভিন্ন স্থানে সরকারী চাকুরী করিয়াছিলেন। ….তিনি দীর্ঘকাল ডিগবীর খাস মুনশীর কাজ করিয়াছেন,"। ঐ)

শ্রদ্ধেয় ইকবাল সিংহ বলেছেন : "It was sometime between 1792-94 that he began to visit Calcutta, ...on the sterner business of exploring the prospects of money-making and building up business connections. For Calcutta was the magnet which attracted wealth as well those seeking wealth." (Rammohan Roy p-46-48). দেখা যায় এই সময় তার বয়স ছিল কুড়ি কি একুশ বছর। রামমোহনের জীবনী রচয়িতা শ্রদ্ধেয় আর, এন, সমাদ্দার লিখেছেন : "The British rule was then on its trial ; our British

masters were mostly ignorant of the ways and habits of those they had to deal with, and of the secret resources of the country; consequently they were groping in the dark as regards the work of administration, and had to rely almost wholly upon their Indian assistants. This state of chaos and ignorance gave a good opportunity to the ambitions few among the higher class Indians to aggrandise themselves by robbing both their English masters on the one hand and their countrymen on the other. Those were days of constant surprises in the shape of sudden fortunes. Many of Rammohun Roy's contemporaries rose from the humblest paths of life to colossal wealth. (p-64) শ্রদ্ধেয় ইকবাল সিংহের মতে: He appears to have shared an attitude, common enough among the middle classes in India to this day, which places a very high valuation on bureaucratic benefices .. " (Rammohun Roy p-88)

"He must have felt, understandably enough, that... a Govt. post was a better bargain in the long run." (ibid) " the posts to which Indians could aspire in the administrative hierarchy were confined to the very lowest rungs of the official ladder ; and the salaries attached to these posts were almost derisory. But salary was not, any more than in our own times, the chief attraction of Govt. service at the beginning of the 19th century." (p-66 ibid)

শ্রদ্ধেয় ইকবাল সিংহ বলেছেন: "Rammohan possessed a sharp wit; he was intelligent far beyond the average man of his class and age ; . He was not likely, therefore, to miss any chances that came his way. " (p 48 of R. Ray) "he had struck a rewarding line of business by advancing loan to the needy civil servants who were often in the habit of applying for loans to local money lenders in order to finance their speculation and commercial deals on side lines." "Besides this orthodox mode of money-making, Rammohun appears to have tried his hand at a more speculative line of business. He dealt in the Company's papar, the forerunner of the

Indian giltedged securities .." (Rammohun Roy p-48)

রামমোহনের জীবনী রচয়িতা মিস এস, ডি, কোলেট তাঁর "The life and letters of Rammohun Roy (p-14) গ্রন্থেও উল্লেখ করেছেন : That he lent money to distinguished officers of the East India Comp., during this period of his life....Rammohun advanced a loan of Rs. 7500 to the Hon'ble Andrew Ramsay, a civil servant of the E. I. Comp. ...lent Rs. 5000 to Thomas Woodforde... "

"he was carrying on fairly extensive monetary transactions of one kind or another and bit by bit adding to his substantial stake in landed property." (৩৩) যখন ব্যবসা বাণিজ্যে যথেষ্ট আয় হচ্ছিল এবং চাকরীতে মাইনে কম পাচ্ছিলেন তখন তিনি যে কোম্পানীর বা তার অফিসারের অধীনে চাকরীর প্রত্যাশা করেছিলেন তার কারণ কি। শ্রদ্ধেয় সিংহ অবশ্য বলেছেন : The real attraction was the influence and prestige derived from holding an office of authority and inevitably, the scope for gain on the sidelines which even the most petty official has always enjoyed under a system representing the apotheosis of bureaucracy" (ibid p—66) "with Digby's help and encouragement he naturally entertained his high hopes of realizing his ambition" "an ambition which he had long entertained ; he found temporary employment with Company's administration." কিন্তু মাত্র কয়েকমাস অস্থায়ী ভাবে কোম্পানীর অধীনে কাজ করেছিলেন। সরকারের কাছে ডিগবী অনুরোধ করা সত্ত্বেও সরকার রাজী নাহওয়ায়—তাঁর চাকরী চলে যায়। তাঁর দশ বৎসর চাকুরী কালের মধ্যে তিনি অগাধ ধন সম্পত্তির মালিক হয়ে বসেন। শ্রদ্ধেয় ইকবাল সিংহ বলেছেন: "Within a three or four years he was able to start buying landed property ..." আগেই বলা হয়েছে ১৮০৩ খৃস্টাব্দে উডফোর্ডে'র দেওয়ান ছিলেন এবং ঐ বছরেই তিনি লাঙ্গুল পাড়ায় তালুক কিনে ফেলেন। পরের সাত বছরের মধ্যে অর্থাৎ ১৮০৩ থেকে ১৮১০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে আরো তিনটে তালুক বীরলুক, শ্রীরামপুরে, কৃষ্ণনগর কিনে ফেলেন। পরে বা ঐ ক'বছরের মধ্যে আরো দুটো তালুক কিনে ফেলেন— গোবিন্দপুর আর রামেশ্বর। কোলকাতায় বহুমূল্য টাকার দুটো বাড়ীও কিনেছিলেন। মিস কোলেট লিখেছেন : It is always stated by Ram mohun's biographers that in his ten years, Govt. Service he saved enough money to enable him to become a zeminder or land owner, with an annual income of Rs. 10,000 (about

1,000 pound). (The Life and Letters of Raja Rammohun Roy p-31)

জানা যায় একসময় তিনি জরিপের কাজে জন ডিগবীর অধীনে দেওয়ানের কাজ করতেন। স্বাভাবিক ভাবেই দেওয়ানের কথামত ইংরেজ অফিসারদের চলতে হতো। (p 41-42, Life and Letters of Raja R. Roy by S. D. Collet) দেওয়ান পদে মাইনে ছিল ১৫০ টাকা (সিক্কা টাকা)। অল্প সময়ের মধ্যে এত ধন সম্পত্তির মালিক হওয়ায় "Calcutta Review" এর ডিসেম্বর সংখ্যায় (১৮৪৫ খৃঃ) একটি বক্রোক্তি করা হয় ".. such gains raise the suspicion that he 'sold justice'" শ্রদ্ধেয় ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ও উল্লেখ করেছেন ঃ "রামমোহনের এই আর্থিক উন্নতির মূলে কিশোরী চাঁদ মিত্র ঘুষের ইঙ্গিত করিয়াছেন। লিয়োনার্ড আবার ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে ইহার প্রতিবাদ করিয়া লিখিয়াছেন যে, রামমোহন যাহ লইতেন, তাহা ঘুষ নহে—সেকালের দেওয়ানের 'legal perquisites'" perquisite হলেও তা ঘুষ আর perquisite-এর মধ্যে এই টুকুই তফাৎ যে আইনের দোহাই দিয়ে কৃষকদের কাছ থেকে এই ধরনের প্রাপ্য আদায় করা হতো জোর জবরদস্তি মূলক ভাবে তা নাহলে দরিদ্র কৃষকের পক্ষে এই বাড়তি ব্যয় বহন করা সম্ভব হতো না।

আর একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রশ্ন ওঠে—তাহলে কি এমন কারণ থাকতে পারে যার দরুন Bd. of Revenue রামমোহনকে দেওয়ান পদের অনুপযুক্ত বলে মনে করলো। দেখা যায় রঙপুরে মাত্র কয়েক মাসের জন্য জন ডিগবীর অধীনে দেওয়ান পদে কাজ করেন (১৮০৯ ডিসেম্বর হইতে)। ভেবেছিলেন উপরতলায় তদ্বির তদারক করলে রামমোহনকে ঐ পদে বহাল রাখা যাবে। "সেজন্য তিনি (ডিগবী) রামমোহনকে স্থায়ী দেওয়ান করিবার জন্য অনেক চেষ্টা করেন। কিন্তু কলিকাতার বোর্ড অব রেভিনিউ কিছুতেই তাহাতে সম্মত হইলেন না। এমনকি, ডিগবীর পীড়াপীড়ির উত্তরে তাঁহাকে লিখিলেন, 'ভবিষ্যতে ডিগবী যদি বোর্ডের প্রতি এইরূপ অসম্মানসূচক ব্যবহার করেন, তাহা হইলে তাঁহারা উহার সমুচিত উত্তর দিতে বাধ্য হইবেন।' (৩০ পৃঃ রামমোহন রায়, শ্রী সঃ বঃ)

"১৮১১ খৃষ্টাব্দে মার্চ মাসে অন্য লোক রঙপুরের দেওয়ান নিযুক্ত হইল' (৩০ পৃঃ রামমোহন রায়—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়)। প্রকাশ্য আপত্তির ক উল্লেখ করে শ্রদ্ধেয় ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় লিখেছেন ঃ "এই তো গেল প্রকা আপত্তির কথা। ইহা ছাড়া, বোর্ড অব রেভিনিউ-এর কাগজপত্রের এ বিষয়ে উহার প্রেসিডেন্ট বুরিশ ক্রীম্প সাহেবের স্বহস্তলিখিত একটি আমি দেখিয়াছি। .... অন্য কথার পর বুরিশ লিখিতেছেন, 'রামগড়ে

... [illegible] কথা ('unfavourab

mention of his conduct') আমার কানে আসিয়াছে।" (৩০-৩১ পৃঃ ঐ) ১৮০৫ থেকে ১৮১৪ খৃঃ মধ্যভাগ পর্যন্ত সময়ে রামমোহন "ডিগবীর সহিত প্রথমে রামগড় .... যান"। আগেই বলা হয়েছে যে, কোম্পানীর সিবিলিয়ানরা রামমোহনের কাছে কর্জ করতেন। জন ডিগবীও একজন। এ'রা ব্যবসা করতেন। তাঁর কার্যকলাপ সম্পর্কে "অপ্রশংসাসূচক কথা" কি হতে পারে সে সম্পর্কে অনেকের কৌতূহল হতে পারে। শ্রী বন্দোপাধ্যায় লিখেছেন যে, "সেই আপত্তিই প্রকৃত আপত্তি বলা চলে"। যার ফলে Board of Revenue তাঁর স্থানে নিয়োগ করলেন অন্য ব্যক্তিকে কিন্তু তাঁর ক্ষেত্রে তোলা হলো প্রবল আপত্তি। কলেকটর ডিগবীর মত প্রভাবশালী একজন সিবিলিয়ানের "পীড়াপীড়ি" সত্বেও।

রামমোহনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও অনুগামী দ্বারকানাথ ঠাকুরও একই ভাবে অগাধ ধনসম্পত্তির মালিক হয়ে ওঠেন। রামমোহন "secured a high post for Dwarkanath Tagore which made the latter a Prince amongst his countrymen" (Rammohun Roy, p 65 by R. N. Samadder) "১৮২৩ খৃষ্টাব্দে দ্বারকানাথ ঠাকুর চব্বিশ পরগণার কলেক্টর ও নিমকমহলের অধ্যক্ষ (Salt Agent) Mr. Plowdon এর দেওয়ান ছিলেন।" "১৮২৯ খৃষ্টাব্দে দ্বারকানাথের সরকারী চাকুরীতে আরো পদোন্নতি হইল। তিনি Custom Salt এবং Opium Board এর দেওয়ান নিযুক্ত হইলেন।" বলা হয়েছে: "যেই কোনো জমিদারী সুবিধামত উঠিল অমনি তাহা কিনিয়া লইলেন। ... এইরূপে চাকুরী করিবার মধ্যেই অনেক জমিদারী কিনিয়া এক ভূম্যধীকারী হইয়া বসিলেন।" এইরকম অনেকেরই ধনসম্পদ সঞ্চিত হয় কোম্পানীর অধীনে চাকুরী করে, মহাজনী ব্যবসা করে। '...these miscellaneous social groups were all growing under the shadow of the British power,' (৩৩)

"The Indian bourgeoisie that we have today in India, therefore, developed out of the "go-between dalals" whose primary job was to supply raw materials to the ports from the interiors of India and bring back the British manufactured goods from the ports to the interiors of India" (I. T. U. M. by S. C. Jha, p.60)

এই দালাল ব্যবসায়ী বুর্জোয়া শ্রেণীর সাহায্য ও সহযোগিতা ব্যতীত বৃটিশ পুঁজিপতিদের পক্ষে সম্ভব হত না ভারতের মত বিরাট একটি দেশে স্থায়ী উপনিবেশ গড়ে তোলা। এ'দের সাহায্যেই তারা গড়তে পেরেছিল বৃটিশ পণ্য বিক্রয়ের বাজার গুলো আর কাঁচামাল সরবরাহের ব্যবস্থা। বৃটিশ কলকারখানার স্বার্থেই "তাঁর নিজস্ব পত্রিকায় দ্ব্যর্থহীন ভাষায় রামমোহন লিখেছিলেন: যাহারা এদেশে....ইউরোপীয়গণের বসবাস তথা কৃষি বাণিজ্যে অংশ গ্রহণে বিরোধী,

তাহারা এই দেশের অধিবাসীদের তথা ভবিষ্যত বংশধরদের শত্রু।"

অনুরূপভাবে, জমিদার শ্রেণীর সক্রীয় সাহায্য ও সহযোগীতা ব্যতিরকে ক্ষুদ্র বৃটেনের পক্ষে কখনই সম্ভব হত না এতবড় দেশে তাদের শাসন কায়েম রাখা। অনুগ্রহ পুষ্ট জমিদার শ্রেণী যে বরাবর ইংরেজদের এ ব্যাপারে সাহায্য করে এসেছে—তা তাদের বক্তব্য থেকেই স্পষ্ট। এটা কোন গোপন ব্যাপার নয়।

১৯২৫ খৃষ্টাব্দে বাঙলার জমিদার সঙ্ঘের সভাপতি বলেছিলেনঃ "মহামান্য বড়লাট বাহাদুর! আপনি জমিদারগণের পূর্ণ সমর্থন ও বিশ্বস্ত সাহায্যের উপর নির্ভর করিতে পারেন।" (ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণঃসংগ্রাম পৃঃ ১৩৫) ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দেও জমিদার সঙ্ঘের সভাপতি ঘোষণা করেছিলেনঃ শ্রেণী হিসাবে আমাদের (ভূস্বামীশ্রেণীর) অস্তিত্ব বজায় রাখিতে হইলে ইংরেজ শাসনকে সর্বতোভাবে শক্তিশালী করিয়া তোলা আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য (ঐ গ্রন্থ থেকে)

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে ১৮২৯ খৃষ্টাব্দের একটি আইনে শাসকবর্গ জমিদারদের লাখরাজ সম্পত্তির উপর রাজস্ব আদায়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলে রামমোহন অবিলম্বে জমিদারদের মুখপাত্র হয়ে সরকারের কাছে একটি আবেদন পত্র পাঠান। এই Petition টি ১৮৩০ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল সংখ্যা 'এশিয়াটিক জার্নালে' (Asiatic Intelligence, Calcutta,) মুদ্রিত হইয়াছে। ২৯ সেপ্টেম্বর ১৮২৯, তারিখে গভঃ অব্ ইন্ডিয়া এই আরজি নামঞ্জুর করেন।

এই আরজীখানি রামমোহনের রচনা বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন। উইলিয়ম অ্যাডাম তাঁহার A Lecture on the Life and Labours of Ramamohun Roy পুস্তিকায় এই আইন প্রসঙ্গে লিখিয়াছেনঃ

"Rammohun Roy instantly placed himself at the head of the native land-holders of Bengal, Behar and Orissa and in a petition of remonstrance to Lord William Bentick, Governor General, protested against such arbitrary and despotic proceedings. The appeal was unsuccessful in India, was carried to England and was there also made in vain ;....Rammohun Roy, both in India and England, raised his powerful and warning voice on behalf of his country men whom he loved, and on behalf of the British Govt. to which he was in heart attached ' (রামমোহন রায়, ৯৯ পৃঃ শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, থেকে গৃহীত) বিবরণে উল্লিখিত "his country men" বলতে জমিদার শ্রেণী বোঝায়।

দেশীয় দালাল বুর্জোয়া শ্রেণীর অন্যতম একজন মুখপাত্র জামশেদজী টাটার বক্তব্য থেকে শুধু পার্শী শেঠদের নয় শ্রেণী হিসাবে বৃটিশ শাসন কায়েম রাখার কাজে দালাল বুর্জোয়া শ্রেণীর ভূমিকাটি পরিস্কার ভাবে উপলব্ধি করা যায়।

তিনি বলেছিলেনঃ Our Small Community is, to my thinking,

peculiarly suited as interpreters and intermediaries between the rulers and the ruled in this country. Through their peculiar position they have benefited more than any other class by English rule and I am sure their gratitude to that rule is, as it ought to be, in due proportion to the advantage derived from it Pure natives of this country, whenever they venture to criticise the actions of individuals in authority, are liable to have their motives questioned; but in the case of Parsees such doubtful motives must be regarded as non existent." ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে 'এপ্রিল সংখ্যা) Times of India পত্রিকায় এই বক্তব্য প্রকাশিত হয়। লক্ষণীয়, দালাল ব্যবসায়ী বুর্জোয়ারা ভারতকে নিজের দেশ বলে বা এ-দেশের অধিবাসীদেরও স্বদেশবাসী বলে মনে করেন না।

রামমোহন ছিলেন প্রথম যুগের ইংরাজ অনুগ্রহপুষ্ট জমিদার ও ব্যবসায়ী বুর্জোয়া শ্রেণীরই মুখপাত্র—যাদের জন্ম উপনিবেশিক শক্তির গর্ভে। যাদের বলা হয়ে থাকে: 'Colonial Mercantile Bourgeoisie of India' born and grown up under the foreign Bourgeoisie.

এই শ্রেণীর স্বার্থ ছিল বৃটিশ স্বার্থের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। তাই বৃটিশ উপনিবেশিক শ্রেণীর অর্থাৎ বৃটিশ শাসক বর্গের অস্তিত্বের উপরই নির্ভর করতো দেশীয় জমিদার ও ব্যবসায়ী বুর্জোয়া শ্রেণীর অস্তিত্ব। স্বভাবতঃ দেখা যায় বৃটিশ শাসন সুদৃঢ় করে তোলাই ছিল রামমোহনের একমাত্র লক্ষ্য। বৃটিশ স্বার্থ সুরক্ষিত করার জন্য তিনি এক ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছিলেন বললে আদৌ ভুল বলা হবে না।

ভারতে ইংরাজদের বসতি স্থাপন প্রসঙ্গে

ভারতে ধনী ইংরেজদের স্থায়ী বসতি স্থাপনের ব্যাপারেও রামমোহন, দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রমুখ এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন—যা প্রতিটি দেশপ্রেমিক ভারতবাসীর কাছে এক ন্যক্কারজনক ঘটনা বলে বিবেচিত হবে। কারণ এ ব্যাপারেও তাঁরা জাতীয় স্বার্থকে বিসর্জন দিতে আদৌ কুণ্ঠিত হননি বৃটিশ স্বার্থ কায়েম করার জন্য। ১৮২৯ ১৫ই ডিসেম্বর কোলকাতায় টাউন হলে একটি জনসভা আহবান করা হয় এবং এই সভার উদ্দেশ্য ছিল ভারতে ইউরোপিয়ানদের স্থায়ী বসতি স্থাপনের বিরুদ্ধে যে বিধি নিষেধ ছিল সেই বিধি নিষেধ

গুলো অপসারণ করার জন্য পার্লামেন্টে আবেদন পত্র পেশ করা। (পাদটীকা: রামমোহন রচনাবলী ; হরফ প্রকাশনী ৫২৯ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। এই সভার প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন রামমোহন, দ্বারকানাথ ঠাকুর এবং তাঁদের অনুগামীরা। সভায় যোগ দিয়েছিলেন কোলকাতার ইংরাজর জমিদার, আর ব্যাবসায়ী বুর্জোয়ারা। প্রস্তাব উথাপন করেন দ্বারকানাথ থাকুর। এই প্রস্তাব সমর্থন করে দীর্ঘ বক্তৃতো দেন রামমোহন রায়। তাঁর বক্তৃতার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ এখানে লিপিবদ্ধ করা হলো।

"From personal experience, I am impressed with the conviction that the greater our intercourse with European gentlemen (English-লেখক), the greater will be our improvement in literay, social and political affairs ; a fact which can be easily proved by comparing the condition of those . ....who have enjoyed this advantage with that of those who unfortunately have not had that opportunity ; and a fact which I could, to the best of my belief, declare on solomn oath before any assembly.

As to the indigo planters, I beg to observe that I have travelled through several districts in Bengal and Behar, and I found the natives residing in the neighbourhood of indigo plantations evidently better clothed and better conditioned than those who lived at a distance from such stations. There may be some partial injury done by the indigo planters ; but, on the whole, they have performed more good to the generality of the natives of this country than any other class of Europeans, whether in or out of the service.

Much has been said and written by persons in the employ of the Hon. East India Company and others on the subject of the settlement of Europeans in India, and many various opinions have been expressed as to the advantages and disadvantages which might attend such a political measure. I shall here briefly and candidly state the principal effects which, in my humble opinion, may be expected to result from this measure" (৫২৯-৫৩০ পৃঃ রামমোহন রচনাবলী)। এরপর তিনি অনেকগুলি সুবিধা অসুবিধার কথা বলেছেন। তবে অসুবিধার কথা বললেও সেই অসুবিধা দূরীকরণেরও উপায় নির্ণয় করে দিয়েছেন। উপসংহারে সুপারিশ

করেছেন : "On mature consideration, therefore, I thiak I may safely recommend that educated persons of character and capital should now be permitted and encouraged to settle in India, without any restriction of locality or any liability to banishment, at the discretion of the Govt. ; and the result of this experiment may serve as a guide in any future legislation on this subject" (ঐ গ্রন্থ-৫৩৪-৪৫ পৃঃ)

ভারতে বসবাসকারী ইংরাজ বণিকদের বা নীলকর শ্রেণীর ব্যবসায়ীদের অত্যাচারের কাহিনী সর্বজনবিদিত। রামমোহন যে সুবিধা গুলির কথা উত্থাপন করেছেন সেগুলি বিচার বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে রামমোহন ভারতে বৃটিশ শাসনকে সুদৃঢ় করতেই চেয়েছেন।

ভারতে ইংরেজদের বসতি স্থাপন প্রসঙ্গে রামমোহনের জীবনী লেখিকা মিস্ কোলেট্ লিখেছেন, He (Rammohun-লেখক) shows here with ample clearness the kind of India he desired and to some extent at least expected to arise. It is an English-speaking India. He anticipates that the settlers and their descendants will 'speak the English language in common with the bulk of the people.' It is moreover, and this is a matter of yet greater surprise -a Christian India. He looks to it being raised to a level with 'other large christian empires' and speaks of England and India as prospectively 'two free and christian countries, united by resemblance of religion'. 'It is, in a word, generally Anglocised India, possessing the opulence, intelligence and public spirit, and also the language, religion and manners of English race'. (p-338 of Life and Letters of Rammohun Roy).

ইতিহাস লেখক শ্রদ্ধেয় শশীভূষণ চৌধুরী মহাশয়ের নিচের মন্তব্য থেকে ভারতে ইংরাজদের বসতি স্থাপনের মূলে তাদের মতলবটি সহজে বোঝা যায়। শ্রদ্ধেয় চৌধুরী লিখেছেন : ... Great Britain during this period lie in the Industrial Revolution in the later part of the 18th century which revolutionised the social, economic, and political structure of Europe. ....The technical apparatus of material and social progress perfected by England, and the tremendous industrial potential that was thereby generated rendered the projection of Great Britain into India a serious threat to the economy of Indian societies. This was further rein-

forced by the utilitarian philosophy of the period which preached the doctrine that individual wellbeing was a step necessary for the material advancement and comfort of human societies, and so as a corollary to it, brought in its train a belief in the superiority of England over the backward regions of the earth, and the desirability of subjecting the peoples of these countries on the influence of the commercial economy of the west and all that it implied." (Civil Disturbances during British Rule in India p-XV)

শ্রদ্ধেয় চৌধুরী আরো উল্লেখ করেছেন : Here was a 'civilisation on the march' ; a 'new confrontation', from which important results flowed—the establishment of British empire in India, and its extension into other areas of Asia to meet the needs of British capitalists who could not get fat interest on investments at home, and needed foreign markets whether in manufacture or trade." (Ibid-p-XVI)

উল্লেখ্য যে বৃটেনে পূর্ব্ব থেকেই শাসকবর্গ ভারতে ইংরাজদের স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপনের কথা চিন্তা ভাবনা করছিল। গরজটা ছিলো শাসকবর্গেরই! কিন্তু টাউনহলের সভায় এমন ভাবে প্রস্তাব গ্রহণ করা হলো যেন গরজটা পুরোপুরি ভারতবর্ষের। 'ভারতে ইংরাজদের স্থায়ী বসতি স্থাপন' যেন ভারতীয়দের নিজেদের দাবী হয়ে উঠলো ; বিশেষ করে যে সময় ইংরাজদের শাসন উচ্ছেদ করাই ছিলো ভারতীয়দের প্রধান কর্তব্য।

১৮২৪ খৃষ্টাব্দেই লর্ড মেটকাফ্ বলেছিলেন : ভারতে আমাদের কোনো শিকড় নেই।" ১৮২৯ খৃষ্টাব্দেই নতুন গভর্ণর-জেনারেল লর্ড বেন্টিংক বিলেতে কোম্পানীর 'বোর্ড অব ডাইরেকটরস' এর কাছে লিখেছিলেন : প্রয়োজনের সময় আমরা কি সেই সহযোগীতা পাচ্ছি, যা শাসকদের বিরোধী নয় এমন সম্প্রদায়ের কাছে, শাসকদের পাওয়া উচিত ? এ কি সত্য নয়, আমরা সেসব শ্রেণীর বেশীর ভাগ লোকদের বিরাগভাজন, যাঁরা প্রভাব প্রতিপত্তিশালী এবং দৃঢ় চরিত্রের এবং যাঁরা আমাদের সাহায্য করতে পারতেন ?" ....প্রয়োজনীয় উন্নতি সম্ভবপর শুধু যদি আরো ব্যাপকভাবে ইউরোপীয় বৃটিশ প্রজারা এদেশে বাস করতে পারে এবং ভূসম্পত্তি পেতে তাদের বাধা না থাকে।" (শিল্প বিপ্লব ও রামমোহন—সৌমেন্দ্র নাথ ঠাকুর-৬০/৬৭ পৃঃ)

শুধু নীলের জন্য নয়, অন্যান্য কাঁচামাল সরবরাহের ক্ষেত্ররূপ ভারতবর্ষ অসাধারণ গুরুত্বলাভ করে। কাজেই ভারতে ইউরোপীয়দের স্থায়ীভাবে বসবাস স্থাপনের প্রশ্নে ইংলণ্ডে তুমুল আন্দোলন হয়। এই আন্দোলনের দাবী ছিল :

"বৃটিশ প্রজাদের ভারতবর্ষে আসার ও বসবাস করার বিষয়ে যে সব আইনগত বাধা আছে সে গুলি দূর করা হোক।" ভারতের গভর্ণর জেনারেল চার্লস মেডকাফ ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে February মাসে ইংলণ্ডে কোম্পানীর বোর্ড অফ্ ডাইরেকটরের কাছে লিখে পাঠিয়েছিলেন, "আমার বিশ্বাস আরো দৃঢ় হইয়াছে যে, আমাদের একান্ত অনুগত একটি প্রভাবশালী শ্রেণী যদি ভারতীয় জনসাধারণের মধ্যে শিকড় বিস্তার করিতে না পারে তবে আমাদের ভারত-সাম্রাজ্য সকল সময়েই বিপজ্জনক অবস্থায় থাকিবে।" "সুতরাং আমি মনে করি যে, আমাদের দেশবাসীদের ভারতে বসবাসে সাহায্য করিতে পারে এইরূপ প্রত্যেকটি পন্থা আমাদের সাম্রাজ্যের বনিয়াদ দৃঢ় করিবে।" (ভাঃ কৃঃ বিঃ ও গঃ সং, ২৪৩ পৃঃ থেকে উদ্ধৃত) "বিশপ হেবার ভারতবর্ষে এসে যা দেখেছিলেন সে সব লিপিবদ্ধ করেছিলেন তাঁর প্রসিদ্ধ "Journal" এ। সেই জার্নালে বিশপ হেবার ভারতে ইংরেজদের বসবাস সমর্থন করে লিখেছিলেন যে, "জমি কিনতে ইংরেজদের বাধা না দিয়ে তাদের উৎসাহ দেওয়া উচিত। তাঁর জার্নালে বিশপ মহোদয় নীলকুঠীর সাহেবদের খুব তারিফও করেছিলেন।" (শিল্পবিপ্লব ও রামমোহন, সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর—৪২ পৃঃ)

"লির্ডসের ব্যাংকার, ব্যবসায়ী ও কারখানার মালিকেরা ১৮২৯ খৃঃ ৮ই মে তারিখে পার্লামেন্টকে আবেদন জানালো যে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর চার্টার পুনর্বার বহাল করবার সময়ে যে তদন্ত করার দরকার সে তদন্ত হওয়া উচিত-ভারত ও চীনের সঙ্গে অবাধ বাণিজ্যের বিষয়ই তদন্ত হবে তা নয়, ভারত উপদ্বীপে ইংরেজের বসবাসের ব্যবস্থার জন্য উন্মুক্ত রাখার কথাও বিবেচ্য" (ঐ গ্রন্থ ৫১-৫২ পৃঃ) আবার "১৮২৯ খৃষ্টাব্দে A view of Present State and Future Prospcets of the Free Trade and Colonization of India নামে একটি পুস্তিকা লন্ডনে প্রকাশিত হয়। অবাধ বাণিজ্য নীতির সমর্থকদের কাছে এই পুস্তিকাটির কদর বাইবেলের চেয়ে কম ছিল না। এই পুস্তিকাটিতে বলা হলো—যে বৃটিশ শাসিত ভারতবর্ষের উন্নতির জন্য প্রয়োজন হচ্ছে—ইংলণ্ডের রাজার ভারতীয় ও ইউরোপীয় সাম্রাজ্য দুটির মধ্যে বাণিজ্যের লেনদেনের অবাধ স্বাধীনতা এবং ভারতে ইংরেজদের অবাধ বসতি স্থাপন।" (ঐ গ্রন্থ-৩৮ পৃঃ) ঐ বছরেই অক্টোবর মাসের সংখ্যাতে, "Asiatic Journal" এ উপরিউক্ত পুস্তিকাটির সমালোচনা করে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ বের হয়। সেই প্রবন্ধেই ইংরেজদের প্রস্তাবের বিরোধীতা করা হয়। হিন্দু কলেজের বহু ছাত্র এই উপনিবেশ স্থাপনের বিরোধীতা করেছিলেন। ঐ কলেজের একটি ছাত্র ঐ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে একটি প্রবন্ধও লিখেছিলেন। প্রবন্ধটি গেজেটে প্রকাশিত হয়। "History of Political Thought" গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে।

The writer of this paper entitled "On the Colonization of India," begins with the colonization of Asia Minor by the

Greeks. Then he describes the character of the Roman colonies, which were established to keep the conquered people under political subjection. He observes,—'Of three different sorts of colonies., ' (p-94)

So far as the colonization of North America and New South wales is concerned, the writer describes its adverse effect on the native population by quoting an observation of 'an eminent writer' who wrote, "No sooer did the benevolent inhabitants of Europe behold their sad condition, than they immediately go to woık to ameliorate and improve it. They introduced among them rum, gin, brandy and the other comforts of life and it is aatonishing to read how soon the poor savages learnt to estimate these blessings." Then he describes the colonial policy of the Dutch and the Spaniards. Of the Spanish colonies, he remarks that they "afford a far greater example of oppression and cruelty." Raja Rammohun Roy must have been embarrased by the brilliant array of so many historical precedents of the oppression of the native population by the colonists." (ibid, p-94) "A reader of the 'Darpan' wrote, 'It is not the wish of the great Body of the Hindus that the English should come and cultivatet he grond and become landlords.' He concluded his article by saying that Rammohun ' can by no means be cosidered as a promoter of the general welfare of India'... .... He did not want European labour, but welcomed only European skill and Capital." (ibid p-74).

দেখা যাচ্ছে যে বেশীর ভাগ লোক ছিলেন "বসতি স্থাপনের" বিরুদ্ধে। কিন্তু যেহেতু শাসক শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষার জন্য বসতি স্থাপন প্রয়োজন সেহেতু জোরপূর্ব্বক অনুগত জমিদার এবং ব্যবসায়ী বুর্জোয়াদের সহায়তায় একটি নিষ্ঠুর ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করা হলো।

১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে ইংলান্ডের উপনিবেশকারীগণ বিশেষত পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের বাগিচা-শিল্পের দাস পরিচালকগণ ভারতে জমিদারী ক্রয় করিয়া বসবাসের অনুমতি লাভ করে। "নীল চাষের জন্য সাহেবগণ বহু যৌথ কোম্পানী স্থাপন করিয়াছিলেন। এই সকল কারবারকে বলা হত 'কনসার্ন''। এক একটি কনসার্নের মধ্যে নানা স্থানে কতকগুলি করিয়া কুঠি (Factory)

থাকিত। 'কনসার্নের' মধ্যে প্রধান কুঠির নাম ছিল 'সদর কুঠি'।... সাহেবদের অশ্লীল গালাগালি এবং সময় সময় বুটের আঘাত উহারা (কর্মচারীরা-লেখক) বেশ হজম করতে জানিতেন এবং কোন প্রকার মিথ্যা প্রবঞ্চনা বা চক্রান্তে পশ্চাদপদ না হইয়া ইহারাই অনেক স্থলে দেশীয় প্রজার সর্বনাশ বা মর্মান্তিক যাতনার হেতু হইয়া দাঁড়াইতেন।" (ভাঃ কৃঃ বিঃ ও গঃ সং, পৃ ২৮৫-২৮৬) "নীলকর জমিদার ও মহাজন সঙ্গে সঙ্গে সে আবার শাসক শ্রেণী ভুক্ত। উপনিবেশিক তন্ত্রের সে হচ্ছে একটি চমৎকার প্রতীক।" (ঐ গ্রন্থ)

অনুমান যে বসতি স্থাপনের ব্যাপারে টাউন হলের সভা ডাকা হয়েছিল বড়লাট লর্ড বেন্টিংকের পরামর্শ অনুসারে। কেননা দেখা যায় অনেক সময় বেন্টিংক রামমোহনের সঙ্গে পরামর্শ করতেন এবং রামমোহনের সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত তিনি গ্রহণ করতেন।. এখানে একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে ৯ই অক্টোবরে লেডি বেন্টিংক দ্বারকানাথ ঠাকুরকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন ঃ

"একটি উপায় উদ্ভাবন করতে যে-অংশ আপনি গ্রহণ করেছেন যার উপর প্রাক্তন গভর্ণর জেনারেলের হৃদয়মন গভীরভাবে নিবিষ্ট ছিল। আমি আনন্দের সহিত বলছি কলকাতার দেশীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে স্বর্গীয় রামমোহন রায় এবং আপনিই এই বিষয়ে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেছেন এবং এ সম্বন্ধে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সরবরাহ করেছেন।" (শিল্পবিপ্লব ও রামমোহন, সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ৬৯ পৃঃ)

উপনিবেশিক স্বার্থে ভারতে ইংরেজদের স্থায়ী বসতি স্থাপনের ব্যাপারে রামমোহন এতদূর অবধি অগ্রসর হয়েছিলেন যে "....তাঁর নিজস্ব পত্রিকায় দ্ব্যর্থহীন ভাষায় রামমোহন লিখেছিলেন ঃ যাহারা এদেশে য়ুরোপীয়গণ কর্তৃক ইংরাজী শিক্ষা বিস্তার বিরোধী এবং য়ুরোপীয়গণের বসবাস তথা কৃষি-বাণিজ্যে অংশ গ্রহণে বিরোধী, তাহারা এই দেশের অধিবাসীদের তথা ভবিষ্যত বংশধরদের শত্রু।" (রামমোহন রচনাবলী হরফ প্রকাশনী পৃঃ-৫৯৭)। এ সম্পর্কে অধিক মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

রামমোহন ও শ্রমজীবি জনতা (লবণ শিল্প)

প্রাক্-বৃটিশ ভারতে এদেশের লোকদের সামান্য লবণের জন্য কারও মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হতো না। এদেশের লোক এদেশেরই লবণ ব্যবহার করত। তার আদৌ অভাব ছিল না আর এই লবণ শিল্পে নিযুক্ত থেকে হাজার হাজার

শ্রমজীবি মানুষ জীবিকা অর্জন করত। কিন্তু হঠাৎ ক্ষমতা দখল করে ইংরেজরা দেখল এই লবণ শিল্প থেকে প্রচুর মুনাফা অর্জন করা যায় এবং দেশীয় দালাল বুর্জোয়ারাও বুঝল এই শিল্পে নিযুক্ত থেকে ব্যবসায়ে অংশ গ্রহণ করে ও ইংরেজ সরকারের দালালির কাজ গ্রহণ করে প্রচুর অর্থ উপার্জনের পথ উন্মুক্ত হবে। অতঃপর উভয় শ্রেণীতে সলা-পরামর্শ করে দেশীয় শিল্পটা ধ্বংস করে ফেলল এবং ইংলন্ড থেকে লবণ আমদানি করতে লাগল। দ্বারকানাথ ঠাকুর ছিলেন এই লবণ শিল্পের একজন এজেন্ট। দেশীয় লবণশিল্প ধ্বংস করার ফলে সে সময় বেকার হয়ে পড়ল ষাট হাজার দেশীয় লবণ-কর্মী। এই সব লবণকারিগরকে বলা হত 'মালঙ্গী'। বেকার হয়ে পড়ার ফলে তাদের দুঃখের অন্ত ছিল না। শ্রদ্ধেয় এন, কে সিনহা লিখেছেন ঃ

"Distress must have been very great in the absence of any alternative employment that could be provided when 'the whole trade in, salt bacame, as free as imagination could fancy. , The sufferings of these people belong to 'the unestimated sum of human pain." (Midnapore Salt Papers, 1781—1807, p. 11)

লবণ শিল্পটি ধ্বংস করার পূর্বে ইংরেজরা রামমোহনের মতামত গ্রহণ করে। বলা হয়েছে ঃ "A Parliamentary Committee (Report of the Select Committee-1832-Appendix-140) asked Rammohan Roy when he was in England Whether much distress would fall upon the Malangis for want of employment if salt from England was imported cheaper than it was manfactured in Bengal (ibid, p-10) এই প্রশ্নের জবাবে রামমোহন রায় যে মতামত প্রকাশ করেছিলেন তা যে কোনো শ্রমজীবি মানুষকে ক্রুদ্ধ ও বিক্ষুব্ধ করে তোলার পক্ষে যথেষ্ট। এই বক্তব্য কোনো ভারতবাসীর পক্ষে উত্থাপন করা অসম্ভব। "He is said to have replied that the Malangis would still be employed to a great extent in the Khalaris owned by Govt. (if it be permitted to carry on the salt monopoly in future) or by those who farmed them from Govt. and the rest could still be employed in agriculture and other occupations as gardeners, domestic servants and daily labourers replacing the Oriyas who were encouraged to come to Bengal in large numbers to fill-up these occupations" (ibid, p-10-11)

দেশীয় লবণশিল্প ধ্বংসের দ্বিধাহীন সুপারিশ করায় এবং বেকার মালঙ্গীদের বিকল্প কর্মনিয়োগ সম্পর্কে ভুল মন্তব্য প্রকাশ করায় এক মহাসর্বনাশ ডেকে

আনা হ'ল দেশীয় মালঙ্গীদের অর্থনৈতিক জীবনে কিন্তু এর ফলে বিরাট সৌভাগ্য উন্মুক্ত হয়ে গেল বিদেশী পুঁজিপতিদের সামনে এবং দেশীয় দালাল ব্যবসায়ী বুর্জোয়াদের সামনেও। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে "replacing the oriyas who were encouraged to come to Bengal in large numbers to fill-up occupations." এই প্রস্তাবটা উত্থাপন করে উড়িষ্যাবাসী ও বাঙ্গালীদের মধ্যে প্রাদেশিক ভেদ-বিভেদ সৃষ্টির পথও উন্মুক্ত হ'ল। এটাই কি জাতীয়তাবাদের পরিচয় ?

রামমোহন ও বঙ্কিম

রামমোহন প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গেলে সাহিত্যিক বঙ্কিমের প্রসঙ্গও এসে পড়ে। কারণ দেখা যায় রামমোহন উপনিবেশিক স্বার্থে যে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির জন্ম দিয়েছিলেন—তার সফল প্রতিফলন ঘটেছে বঙ্কিমের সাহিত্যে বিশেষ করে 'আনন্দমঠে'। একই উদ্দেশ্যে অর্থাৎ উপনিবেশিক স্বার্থে 'দেবী চৌধুরাণী'ও তাঁর একটি সফল সৃষ্টি এবং দেখা যায় "আনন্দমঠের" সঙ্গে 'দেবী চৌধুরাণী'র একটি নিবিড় সম্পর্ক রয়ে গেছে এই কারণে। যে কোন স্বল্প শিক্ষিত ব্যক্তিও উপলব্ধি করতে পারবেন যে রামমোহন ও বঙ্কিম—দুটি ভিন্নধর্মী সৃষ্টির নায়ক হলেও এই দু-জনের লক্ষ ছিল সম্পূর্ণ এক ও অভিন্ন সুতরাং সেজন্য তাঁদের বক্তব্যও এক ও অভিন্ন।

তাঁদের দুজনেরই বক্তব্য হলো যে ভারতের যারা প্রকৃত অধিবাসী সেই হিন্দুরা হিন্দুধর্ম বিদ্বেষী ও অত্যাচারী মুসলমানদের শাসন থেকে মুক্তির জন্য বরাবরই ইংরাজ শাসনই কামনা করেছিল এবং তাদের মুক্তিদাতা রূপে তারা সানন্দে স্বাগত জানাতে কুন্ঠিত হয়নি।

আমাদের দেশের যথার্থ ইতিহাস আজও রচিত না হওয়ায় এই ভুল ধারণা সৃষ্টি করা কোন কঠিন কাজ নয় আমরা তা দেখেছি। সত্য কথা বলতে কি ; ফলে আমাদের দেশের শিক্ষিত সমাজের মধ্যে এমন ধারণা পোষণ করা হয়ে থাকে যে বাংলা দখল করার সময় জনগণের কোন শ্রেণীর পক্ষ থেকে ইংরাজদের বিরুদ্ধে কোনপ্রকার প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে উঠেনি।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে তীব্র শ্রেণী সংগ্রামের অনিবার্য পরিণতি রূপে দেশের উদীয়মান পুঁজিবাদী বুর্জোয়ারা অর্থাৎ ব্যবসায়ী বুর্জোয়া ও কারিগর শ্রেণী যেমন একদিকে শক্তিশালী হয়ে উঠছিল তেমনি অন্য দিকে দেশের শাসক

শ্রেণীর লোকেরাও অর্থাৎ সামন্ত প্রভুরাও দুর্বল হয়ে পড়ছিল। এমনি সময় জগৎশেঠের মতো দেশীয় কতিপয় বিশ্বাসঘাতক পরিবারবর্গের গোপন সহযোগীতায় নেমে এলো ইংরাজ দস্যুদের ষড়যন্ত্রমূলক আক্রমণ। নিম্নলিখিত অবস্থায় ইংরাজদের এই আক্রমণ পর্যুদস্ত করার ক্ষমতা বাংলার শাসন কর্তাদের ছিল না। বলা হয়েছে ঃ "The Emperor of Delhi also now fell into the hands of the English. The feeble descendant of the Great Moghals was now a homeless wanderer, but was still recognised as the titular Sovereign of India. All the kings and chiefs in the vast subcontinent still owed nominal allegiance to him, and all pretended to derive from him their power in the kingdoms and provinces which they conquered by force of arms. The English also imitated their example. In 1765, the Company obtained from the Emperor a Charter, making the Company the Dewan or Administrator of the Subah of Bengal. The English thus obtained a legal status, and also formally took upon themselves the responsibility of administering the province which they had conquered eight years before." [quoted from R & F of E. I. C. page-155]

এখানে উল্লেখ্য যে ঐ রকম আইনসঙ্গত অধিকার তারা না পেলেও তা তারা স্বীকার করতো না। অধিকন্তু তাদের সঙ্গে চক্রান্তে যোগদান করেছিল দেশীয় দেশদ্রোহীরা। স্বভাবতঃ সামরিক শক্তির জোরেও তাদের দেশ থেকে বিতাড়িত করার ক্ষমতা ছিল না স্বাধীন শাসন কর্তাদের। তথাপি স্বাধিন শাসন কর্তা নবাব সিরাজুদ্দৌল্লা চুপ করে বসে ছিলেন না। আলিবর্দ্দি'র আমল থেকেই ইংরাজ বণিকদের সঙ্গে দেশীয় বণিকদের ব্যবসা বাণিজ্য সংক্রান্ত বিরোধ ছিল তীব্র। স্বাভাবিক ভাবেই বাংলার শাসকবর্গের উপর তাদের চাপ ছিল ইংরাজ বণিকদের সংযত করার জন্য। ১৭৩৯ খৃষ্টাব্দের ৯ই জানুয়ারী কলকাতার ইংরাজরা নবাব দরবার থেকে যে চিঠিখানা পেয়েছিলেন তাতে লেখা হয়েছিল ঃ

"হুগলীর সৈয়দ, মোগল, আরমানি প্রভৃতি বণিকগন অভিযোগ করিয়াছেন যে, তোমরা নাকি তাঁহাদের বহু লক্ষ টাকার পণ্যদ্রব্যপূর্ণ কয়েকখানি জাহাজ লুট করিয়া লইয়াছে....... ... আমি তোমাদিগকে বাণিজ্য করিতেই অধিকার দিয়াছি, দস্যুতা করিতে ক্ষমতা প্রদান করি নাই। এই রাজাদেশ পাইবামাত্র তোমরা যদি সহজে এই ক্ষতিপূরণ না কর তবে আমি বিশেষ কঠিন দণ্ডাজ্ঞা প্রদান করিব।" সিরাজদ্দৌলা—অক্ষয় কুমার মৈত্রেয়—স্বাধীনতার সংগ্রামে বাংলা থেকে উদ্ধৃত, পৃঃ-৩৮)

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য ইংরাজ বণিকগন ব্যবসা বাণিজ্য করলেও এক ধরণের

জলদস্যুও ছিল এবং এদের পেছনে ছিল এদের রানী। তারা নবাবের কাছে বার বার মুচলেকা পত্র দিতো আবার সুযোগ পেলেই সেই পত্রের অঙ্গীকার ভঙ্গ করে দেশীয় বণিকদের উপর অত্যাচার চালাতো। তাতে তারা কুণ্ঠিত হতো না। এদের ব্যবহারে বিরক্ত হয়ে সে সময় নবাব দেশ থেকে এদের বিতাড়িত করে এদের অত্যাচার হতে দেশের মানুষকে মুক্ত করার জন্য সচেষ্ট হলে—শিখ নেতাদের যে ভাবে গোপন চক্রান্ত করে নিহত করে ও রাজ্য দখল করে, অনুরূপ ভাবেই সিরাজুদ্দৌল্লাকে গোপন চক্রান্তের দ্বারা হত্যা করা হয় এবং দেশদ্রোহী বেইমান জগৎশেঠ, উমিচাঁদ প্রমুখের সহায়তায় বিশ্বাসঘাতক ও সিংহাসন লোভী—মীরজাফরকে সিংহাসনে বসানো হয়। এবার দেশীয় বণিকদের সঙ্গে ইংরাজদের বিরোধ পূর্বাপেক্ষা তীব্র হয়ে ওঠে এবং এতই তীব্র হয়ে ওঠে যে মীরজাফর, মীরকাশিমও পরবর্তী কালে কোম্পানীর ডিরেকটারদের কাছে নালিশ জানাতে বাধ্য হন। মীর কাশিম ১৭৬২ খৃঃ ২৬শে মার্চ ইংরাজ গভর্নরের কাছে লিখেছিলেন,

"From the factory of Calcutta to Cossim Bazar, Patna, and Dacca, all the English chiefs, with their Gomastahs, officers, and agents, in every District of the Government, act as Collectors, Renters, Zamindars, and Taalookdars [estate-holders] and setting up the Company's colours, allow no power to my officers. And besides this, the Gomastahs and other servants in every district, in every Gunge [a market town], Perganah, [part of a district], and Village. carry on a trade in oil, fish, straw, bamboos, rice, paddy, betel-nut, and other things; and every man with a Company's Dustuck in his hand regards himself as not less than the Company." [quoted in R & F of E. I. C, page 177]

এর পূর্বে তিনি কয়েকবারই লিখেছিলেন। এইরকম একখানি চিঠিতে লিখেছিলেনঃ "They (English—লেখক) forcibly take away the goods and commodities of the Reiats (peasants), merchants, & c., for a fourth part of their value; [quoted in R & F of E. I C., p-174)

মিরজাফরও যে চুপ করে ছিলেন তা ছিলেন না। তিনিও প্রতিবাদ জানাতে বাধ্য হন। তিনিও লিখেছিলেন, "The Poor of this country, who used always to deal in salt, Bettle Nut, and Tobacco, are now deprived of their daily Bread by the Trade of the Europeans." (quoted in p-5 of Civil Disturbances in India by

S. B. Chaudhuri.)

কোম্পানী মীরকাশিমের দাবী অগ্রাহ্য করলে দেশীয় বণিকদের কাছ থেকে সম্ভবতঃ প্রচন্ড চাপ এসে পড়ে ফলে তিনি বাধ্য হন দেশীয় বণিকদের অনুকূলে আদেশ জারি করতে এবং ইংরাজ বণিকদের বিশেষ বাড়তি সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত করতে, যাতে তারা দেশীয় বণিকদের ক্ষতিগ্রস্ত করতে না পারে। এই আদেশ পত্রে তিনি ঘোষণা করেছিলেন: "আমি অবগত হয়েছি যে আমার নিজের দেশের বেশীর ভাগ বণিক দারুণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং ব্যবসা ছেড়ে চুপচাপ বসে থাকতে ও বেকার থাকতে বাধ্য হয়েছে। এই অবস্থায় এই ধরণের লোকদের হিত ও শান্তির জন্যে আমি সমস্ত বাণিজ্যশুল্ক. চৌকিদারী মরগণ, নবনির্মিত নৌকার উপর কর এবং জল ও স্থলের উপর ধার্য ও অন্যান্য ছোটখাট কর দুবছরের জন্যে রহিত করছি।" (স্বাধীনতার সংগ্রামে বাংলা থেকে উদ্ধৃত, পৃঃ-২৪)

যতদূর সম্ভব এতদিন নবাব পরিবর্তনের ব্যাপারটি শাসনকর্তাদের ঘরোয়া ব্যাপার বলে জনগণের মনে হতে পারে। কিন্তু মীরকাশিম সিংহাসনে বসার পর; অন্ততপক্ষে মীরকাশিমের অপসারণের পর এই বিভ্রান্তি কেটে যাবার কথা। মনে হয় প্রথম দিকে 'গদ্দভ' নবাব মীরজাফর আর নবাব মীরকাশিম ইংরাজদের ও তাদের অনুগত দেশদ্রোহীদের গোপন ষড়যন্ত্র সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিল না। তারা ভেবেছিল সুদীর্ঘকাল ইংরাজদের হাতের ক্রীড়নক হয়ে থাকতে হবে না। কিন্তু যখন বুঝলো শুধু এই ষড়যন্ত্রে ইংরাজরাই অংশীদার নয় দেশীয় বেইমান জগৎশেঠ পরিবারসহ, রাজবল্লভ, কৃষ্ণ বল্লভ, সেনাপতি মানিকলাল প্রমুখ জড়িত তখন তাদের উপায় থাকলো না ইংরাজদের চক্ষুশূল হওয়া ছাড়া। সুতরাং মীরকাশিমের যুদ্ধ ঘোষণা ছাড়া পথ থাকলো না। অপরপক্ষে ব্যবসায়ী বুর্জোয়ারাও নিষ্ক্রীয় বসে থাকতে পারলো না। ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে তারাও যুদ্ধ ঘোষণা করলো ইংরাজদের বিরুদ্ধে। দেশীয় ব্যবসায়ী বুর্জোয়াদের অধিকাংশই শাসকবর্গের পক্ষ অবলম্বন করেছিল। বলা হয়েছেঃ " It is probable, however, that some belonging to the class of Indian bourgeoisie took side with the Indian rulers." (R & F of E. I. comp., p-127) এবং স্বাভাবিক কারণেই,"...... The Indian Merchants who preferred to remain independent and not became accomplices of the Company or its officials or other English merchants in their nefarious deeds had to give up their traditional callings" (ibid) এইসব ব্যবসায়ী বুর্জোয়ারাই ছিলেন ইংরাজ শাসন বিরোধী এবং এঁদেরই সংখ্যা ছিল সর্বাধিক। এঁদেরই বলা হতো সন্ন্যাসী, ফকির। যারা আসতেন হিন্দু সম্প্রদায় থেকে তাঁদের বলা হয়েছে সন্ন্যাসী, গোঁসাই ইত্যাদি আর যাঁরা মুসলমান সম্প্রদায় থেকে তাঁদের বলা হয়েছে ফকির, সুফী

ইত্যাদি। এ'দের নেতৃত্বে ইংরাজ বিরোধী জনগণের যে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে ওঠে তাকেই বলা হয়েছে, "বাঙলার সন্ন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহ"।

সেকালে হিন্দু সমাজে ব্যবসা বাণিজ্য করা, নিজের বংশগত পেশা ত্যাগ করা, জাতিভেদ প্রথা অমান্য, পরস্পর মেলামেশা করা ছিল ধর্ম বিরুদ্ধ কাজ। স্বাভাবিক ভাবেই তাঁরা নতুন মতাদর্শ প্রচার করেছিলেন—মানবতাবাদী নতুন মতাদর্শ। মানুষের সমান অধিকারের মতাদর্শ। 'প্রাক-বৃটিশ ভারত প্রসঙ্গে' আলোচনায় এ সম্পর্কে কিছু কথা বলা হয়েছে। তবু শ্রদ্ধেয় হরিরঞ্জণ ঘোষাল মহাশয় এদের সম্পর্কে যে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রকাশ করেছেন এখানে তা উল্লেখ করা হলো ঃ In the accounts of the period we frequently come accross a class of indigenous traders called Sannassi or Gosains. Clad in religious costumes, these trading pilgrims travelled from place to place carrying various articles of commerce. They seem to have had a wide organization or fraternity. In the city of Benaras there were five hundred houses of gosains who carried on 'a very extensive trade.' They numbered about ten thousand persons and on the retuan of their disciples from pilgrimage, their number would swell to nearly thirty five thousand. In other places, too, there were gosains in smaller numbers :and a large portion of internal trade was in their hands. (Economic transition in the Bengal Presidency p-174) লক্ষণীয় যে আভ্যন্তরীণ ব্যবসা বাণিজ্যের অধিকাংশই ছিল এই সব সন্ন্যাসী ও ফকির ব্যবসায়ী শ্রেণীর হাতে।

আর একটি সূত্রের উল্লেখ করে শ্রদ্ধেয় ঘোষাল উল্লিখিত গ্রন্থের ১৮৩ পৃষ্ঠার পাদটীকায় আরো একটি গুরুত্ব পূর্ণ তথ্য লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

"Not that the Sannyasis for the first time took to trade after the quelling of their insurrection in the time of Warren Hastings. They had been engaged in trade for a long time before, apart from carrying on predatory activities in the frontier districts of Bengal. We have, for instance, references to Sannyasi merchants trading to Tibet and Nepal before the Gurkha conquest of Nepal in 1767 (vide Proceedings of Indian History Congress, 1939, p-1606 সুদীর্ঘকাল যাবৎ তাঁরা ব্যবসা বাণিজ্য করে এসেছেন। এ'দের কথা পূর্বে বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এ'রা আলাউদ্দীনের আমল থেকেই নিজেদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বজায় রেখে এসেছেন এবং সামন্ত তন্ত্রের

বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় সাফল্য অর্জন করে চলে-ছিলেন। হেস্টিংস এদের ফকির ও সন্ন্যাসী বলে মিথ্যা পরিচয় দেবার চেষ্টা করলেও দেখা যাচ্ছে তিনি একস্থানে লিখেছেন : '.. some among them carry on trade in Diamonds, Coral and other articles of great price and small Compass and often travel with great wealth. .. ' (quoted in Sannyasi and Fakir Raiders in Bengal, p-18)

মিঃ এলিয়েট ছিলেন তৎকালীন সেটেলমেন্ট বিভাগের কমিশনার। তিনি লিখেছেন ঃ They call themselves Fakeers, merchants, ryots but their real profession is that of usury and having the command of cash, . (ibid, page 156) হেস্টিংসের উল্লিখিত মন্তব্যের পাদ-টীকায় লেখা হয়েছে : "A similar description of the trade carried on by the nomadic Sannyasis is given by Bolge in his Mission to Tibet : Some Sannyasis in Tibet bring from the sea-coasts to the interior port pearls, corals, spices and other precious articles of small bulk which they exchange for musk, gold dusts and other things of small bulk which they can conceal in the clothes.' (ibid p 18) ১৮০০ খৃষ্টাব্দের লেখা 'কাশীবর্ণনা' নামক একটি বাংলা গ্রন্থে বলা হয়েছে ঃ Everyone (Sannyasi) carries on the business of merchants and moneylenders and have houses as high as hills .... Everyone puts on ochre coloured garments and bears arms. Some ride on horses. (ibid)

এই সন্ন্যাসী ও ফকির ব্যবসায়ী বুর্জোয়াদের নেতৃত্বেই জনগণ প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন ইংরাজদের বিরুদ্ধে। অনেকের ধারণা এই—সন্ন্যাসী ও ফকিররা নাকি বাংলার লোক নন। বাইরের লোক। এ ধারণা ঠিক নয়। এসব কথা বিভ্রান্তিই সৃষ্টি করে। বাংলাকেই প্রথম আক্রমণ করে ইংরাজরা। স্বভাবতঃ সারা ভারতের ব্যবসায়ী বুর্জোয়া এসে বাংলাতেই প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলেন। আগেই উল্লেখ করেছি সুরাট থেকেও মুক্তিযোদ্ধারা এসে-ছিলেন, এমনকি নেপাল থেকেও। সংক্ষেপে বলতে গেলে নেপাল, আসাম, সুরাট, বিহার, বাংলা, উড়িষ্যা, উত্তরপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র এসব অঞ্চল থেকে যে মুক্তিযোদ্ধারা এসেছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায়। বাংলায় হাজার হাজার সন্ন্যাসী ব্যবসায়ী বাস করতেন। তাঁদের কথা পূর্বেই এই গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে। ময়মনসিংহ এবং বিভিন্ন জেলায় তাঁরা বসবাস করতেন এবং শান্তিপূর্ণ-ভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য করতেন। মিঃ এ. এন. চন্দ্র লিখেছেন ঃ "The Resident Sannyasis were not an uucommon factor in the provinces of

Bengal and Behar." (page 134, Sannyasi Rebellion)

তিনি আরও লিখেছেন ঃ "They [Sannyasis-writer] lent money to the Zaminders and their peasants and tenants. The were exacting and resorted to usury. The Zaminders, while in need to pay their revenue dues, used to borrow from them but were reluctant to pay back." [Page-135, Sannyasi Rebellion]. "They [Zaminders of Alapsing, Mymensingh, Jaffarshahi and Sherpur in a petition submitted to the Governor Genaral in 1780] stated that 'Mohuntpory Durmicant Geer, Darby Geer, Bhoupal Geer, Lachman Geery, Arun Geery and other Sannyasis . behaved peacably and carried on a little trade without disturbences to the ryots .... Rumnah is the camping ground of the Sannyasis. Thus a huge body of Sannyasis lived as resident monks in the Mymensing district and they at least, some of them, actively participated in the revolt. The above reveals that by 1790, the number of the monks in the Alapsing pargana rose to 2500, but they, at first, lived peacfully." Page-135, ibid) বাংলার তন্তুবাই ও সুতী কারিগরশ্রেণী দেশীয় ব্যবসা বাণিজ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতেন। তাঁদের অধিকাংশই ····Joined 'the Sannyasi rebellion' (Page, 161-ibid)। শ্রদ্ধেই চন্দ্র লিখেছেন "In this way, they (the city workers—লেখক) also formed part of the Sannyasi army which operated in various parts of Bengal. (Page-157, ibid). রেশমী বস্ত্রের কারিগর শ্রেণীও এই যুদ্ধে যোগ দেন। একটি চিঠির জবাবে "The Council, however replied that : 'as it is probable that the Fakirs you have in confinement are those whom Mr. DUCAREL disarmed and to whom he gave public assurance that they should pass unmolested in their reliegious ceremonies and for the purpose of trade, it is highly improper that they should be taken or kept in custody." (ibid, p-43)

উল্লিখিত সন্ন্যাসী ও ফকিররা যে এ দেশের প্রথম স্বাধীন ব্যবসায়ী বুর্জোয়া তাতে সন্দেহ প্রকাশের কোন প্রকার কারণ নেই। এ-সম্পর্কে অসংখ্য তথ্য উপস্থিত করা হয়েছে বিভিন্ন গ্রন্থে। কিন্তু এই ব্যবসায়ী বুর্জোয়ারা হিন্দু বা মুসলমান সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন না অর্থাৎ তাঁরা এই দুটি সম্প্রদায়ের মানুষ হলেও প্রকৃতপক্ষে তাঁরা ছিলেন মানবতাবাদী এক নতুন সমাজের মানুষ। আমরা তাদের

-হিন্দু বা মুসলমান বলে অভিহিত করতে পারি না। "হিন্দু-বৈরাগী" বা "মুসলমান ফকির" কথাগুলি বিভ্রান্তিকর। ব্রাহ্মণশ্রেণীর অনুগামীরাই হিন্দু বলে পরিচিত। বৈষ্ণব মতাবলম্বীরা প্রচলিত হিন্দু ধর্ম বিরোধী জনসমাজ এবং আজও এই বৈষ্ণবদের হিন্দু সমাজে ঠাঁই নেই। আবার ফকিররা ছিলেন প্রচলিত ইসলামধর্মের বিরোধী। ফকির ও বৈরাগীরা একই মানবতাবাদী মতাদর্শের মানুষ। এই মতাদর্শ ছিল ধনতন্ত্র বিকাশের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির জন্য একান্ত প্রয়োজন।

কাজেই তাদের মধ্যে কোন ভেদ বিভেদের প্রাচীর ছিল না। একই সঙ্গে বসবাস করতে দেখেছি। অবশ্য এই জনসমাজ ছিল বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত আর এই সম্প্রদায় (Sect) গড়ে উঠেছিল ভিন্ন ভিন্ন দার্শনিক ও তত্ত্ব-বিদদের অনুগামী হওয়ার ফলে। কেউ ছিলেন গিরি সম্প্রদায়ভুক্ত, কেউ ছিলেন পুরী সম্প্রদায়ভুক্ত, কেউ মাদারী সম্প্রদায়ের, কেউ বুরহান সম্প্রদায়ের, কেউ কবীর পন্থী, কেউ শ্রীচৈতন্যর শিষ্য। কিন্তু প্রত্যেকের মূল আদর্শ ছিলো এক ও অভিন্ন-মানবধর্মী। (এ সম্পর্কে পূর্বে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। এখানে নতুন করে বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজন নেই। তবু দু-একটি তথ্য এখানে উপস্থিত করা হলো।

"The Burhana Fakir of Dinajpur held beliefs and faiths which in many ways were anti-Islamic ....the activities of these Burhana and the Madari Fakirs apparently belonged ro the same or similar group having the same religious faiths. (Sannyasi Rebellion)

ইংরাজ অফিসারা, 'দোবিস্তান' গ্রন্থের লেখক মোহম্মদ মহসীন ফানি, এবং মিঃ রিচার্ডসন তাঁর "আরবী ফার্সি অভিধানে"—সন্ন্যাসী ও ফকিরকে একই বলে ধরে এসেছেন; পৃথকভাবে তাঁদের অস্তিত্ব স্বীকার করেন নি।

শ্রেণীগত ভাবে তাঁরা ছিলেন ব্যবসায়ী বুর্জোয়া, মতাদর্শের দিক থেকে তাঁরা ছিলেন মানবতাবাদী। তাই মহান নায়ক শ্রীচৈতন্যর দৃষ্টিতে "ব্রাহ্মণ" ও "শূদ্র" এক হয়ে গেছে এবং যে-রাজা প্রতাপরুদ্রেরা মানুষকে মানুষ বলে বিবেচনা করতেন না শ্রীচৈনার চোখে সেই রাজারা বিবেচিত হয়েছেন সমাজের নিকৃষ্ট জীব।

শ্রদ্ধেয় এস. বি. চৌধুরী লিখেছেন: "Mir Qasim was seated on the masand on october 20, 1760, but his authority wes challenged by Asad Zaman Khan, the raja of Birbhum, the most powerful of the landholders who seems to have formed a conspiracy with the raja of Burdwan to overthrow the British power, and he went to the extent of threatening an attack on Murshidabad. .. ....though the Zamindars in most cases acted from

motives of self-interest, the Raja of Birbhum seems to have been actuated by ahigher ideal of freeing the country from the Yoke of the Company-Raj, and he sent an invitation to the emperor Yhah Alam to that effect. The situation ... .. is thus described by Vansittart : (the then Governor General—writer); .... two armies were in the field, and waiting only the fair weather to advance ; the Shahzadà towards Patna, and the Beerboom Rajah towards Murshedabad, the Capital. The Rajahs of Bissenpoor, Ramgur, and the other countries had offered considerable supplies to the Beerboom Rajah. The Rajah of Curruckpoor had committed open hostilities In a word, the whole country seemed quite ripe for an universal revolt.'

The idea of driving out the English from Bengal was taken up by other leaders of consequence of those days like the Maratha general Sheo Bhatt, and maharaja Nandakumar who was 'carrying on a treachreous correspondence with the Burdwan raja and orher rebellious zamindars." (quoted from Civil Disturbances during the British rule in India, p. 2).

এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মোগল সম্রাটদের পক্ষে পকাশ্যে ও প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধে যোগ দেওয়া সম্ভব না হলেও তাঁদের সৈন্যরা যদি ব্যবসায়ী বুর্জোয়াদের নেতৃত্বে যুদ্ধে যোগদান করে থাকে তা খুবই স্বাভাবিক ঘটনা। এই সন্ন্যাসী ও ফকির ব্যবসায়ী বুর্জোয়ারা ঐক্যবদ্ধভাবে অস্ত্র তুলে ধরেছেন স্বদেশের শত্রু ইংরেজদের বিরুদ্ধে। সংগঠিত করেছেন কৃষক, কারিগর ও জমিদার শ্রেণীকে, দেশীয় সৈন্যবাহিনীকে সেই ইংরেজের বিরুদ্ধে। অনুরূপভাবে তাঁরা ঐক্যবদ্ধভাবে বসবাস করেছেন। ব্যবসা বাণিজ্য করেছেন, তীর্থ ভ্রমণ করেছেন, ধর্ম পালন করেছেন। "These Sannysis and Fakirs moved about throughout the country and beyond for the pious duty of pilgrimage. They moved 'from the confines of Russia to Cape Comorin and from the borders of China to Malabar Hills in the island of Bombay' and from one place of pilgrimage to another. Their Calender of fairs and festivals were comprehensive and accurate." (Sannassi Rebellion, p-24.) দেখা যায় উভয়েই একই ব্যক্তির অনুগামী। বলা হয়েছে ঃ "Hindus and Muhammadans alike resort to the place (the tosub of Shah Madan

—writer) the former regarding him as an incarnation of Lakhan." (p 26, S & F. R in B.)

"Hindus and Mussalmans equally hastening to the religious festivity." (fair of Pir Shah Madan in Makhanpur) (ibld) এই উৎসব মেলাগুলিকেও তাঁরা যুদ্ধের কাজে ব্যবহার করতেন। সন্ন্যাসী ও ফকিররা যে একই মতাদর্শের মানুষ তা এই ঘটনাগুলি থেকেও বোঝা যায়।

এই ফকির এবং সন্ন্যাসী ব্যবসায়ী বুর্জোয়ারাই ঐক্যবদ্ধভাবে ইংরাজদের বিরুদ্ধে জাতীয় যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন। এই যুদ্ধ ছিল বড়রকমের যুদ্ধ। তাঁরা শুধু যুদ্ধই ঘোষণা করেন নি, বিকল্প সরকারও গড়ে তুলে ছিলেন এবং এই সরকারের দপ্তর ছিল নেপাল সীমান্তে নেপাল সীমানার মধ্যে। নেপালের স্বাধীনতাপ্রিয় রাজা ছিলেন এই বিকল্প স্বাধীন ভারতীয় সরকারের সমর্থক। এই যুদ্ধে নেতৃবৃন্দ ছিলেন তৎকালীন আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সম্মানিত ব্যক্তি। তাঁদের প্রতি ছিল নেপাল সরকারের গভীর শ্রদ্ধা। শুধু মাত্র নীচের চিঠিখানি থেকে তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

ইংরাজরা বিদ্রোহীদের গ্রেপ্তার করার কাজে এবং নেপাল সীমানা থেকে তাদের বিতাড়িত করার জন্য নেপাল রাজার প্রতি চাপ সৃষ্টি করলে এই খবর বিদ্রোহী নেতাদের গোপনে নেপাল সরকার কর্তৃক জ্ঞাত করা হয়। সেই প্রসঙ্গে নীচের চিঠিখানি লেখা হয়েছিল যুদ্ধের অন্যতম নেতাকে।

বলা হয়েছে ঃ In October, (1795—writer) Mr. Burges, Collector of Purnea, came in possession of some intercepted correspondence from Deo Singh Upadhaya (The Vakil or representative of the Subah of Morung at the Collector's court at Purnea) to Karim Shah, Sobhan Ali Shah and the Subah. The correspondence shows how the Fakirs were kept informed of the operations against them.

The letter to Subhan Ali Shah ran as follows : 'To the noble friend Sri Soobhanee Sajee, Deo Singh oppadeh writes with Salam Health that you may enjoy content. The gentlemen (British officers) here treat me with great severity by saying all the fakeers live in your country and plunder our disirict, therefore, seize those fakeers and deliver them up. I answer that the fakirs do live in my country but they subsist on charity what character shall I gain by seizing them. The gentlemen replied I am sending troops to seize them whereever they are found and to bring them here. If you all feel a

desire to fight advance and engage with all your strength, if not, and you prefer the care of your bellies you would do well to nourish them in some other country. Otherwiee the ryots of the Maharaja will experience much distress the gentleman will certainly proceed." He wrote to Karim Shah : 'To the noble friend . ..." (p-126, Ibid)

এই যুদ্ধে যদি স্বাধীনতাকামি দেশপ্রেমিক মোগল সৈন্যদের একটি অংশ বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগদান করে থাকে তবে তাতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই। তাছাড়া তার সমর্থনে যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। স্মরণ করা যেতে পারে যে ১৮৫৭ সালের প্রথম জাতীয় স্বাধীনতা যুদ্ধের অন্যতম মূল বাহিনী ছিল দেশীয় সৈন্যরা। এই সৈন্যরা ছিলেন দেশের জনগণেরই একটি অংশ। দেখা যায় মীরকাশিম ইংরাজদের ও কতিপয় দেশদ্রোহীর সহায়তাই সিংহাসনে বসলে স্বাধীনতাকামি প্রভাবশালী জমিদাররা গোপন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন যে তাঁরা মোগল সম্রাটের সঙ্গে মিলিতভাবে ইংরাজদের দেশ থেকে উচ্ছেদ করার জন্য সরকারকে আক্রমণ করবেন। কিন্তু যে কোন প্রকারেই হোক এই ষড়যন্ত্রের কথা ফাঁস হয়ে যায়। ফলে সেই ষড়যন্ত্রমূলক পরিকল্পনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। আগেই বলা হয়েছে জমিদাররাও এই যুদ্ধে যোগদান করেছিলেন। ইংরাজদের সঙ্গে ভারতীয় জনগণের এই যুদ্ধ চলেছিল প্রায় চল্লিশ বছর। মূল যুদ্ধের অবসান ঘটলেও এই যুদ্ধ নানা নামে নানাভাবে দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। যতদূর সম্ভব যুদ্ধের নেতৃবৃন্দ একবারে বসে পড়েন নি। তাঁরা অনেকেই আত্মগোপন করেছিলেন এবং সেই অবস্থায় বিভিন্ন স্থানে ইংরাজ বিরোধী সংগ্রাম গড়ে তুলেছিলেন অথবা এইরকম যুদ্ধকে সাহায্য করেছিলেন। ওয়াহাবী যুদ্ধের মধ্যে আমরা এই ফকির বিদ্রোহীদের দেখতে পাই। দেখতে পাই বীরভূমে সীমান্ত পাহাড় অঞ্চলে ভূমিহীন চাষীদের সংগঠিত করতে এবং সশস্ত্র যুদ্ধের প্রস্তুতি গড়ে তুলতে ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দেও।

ইংরাজ বেতনভুক কর্মচারী বঙ্কিমচন্দ্র এই যুদ্ধকেই তাঁর 'আনন্দমঠ' ও 'দেবীচৌধুরাণী' উপন্যাসের বিষয়বস্তু করে তোলেন। কিন্তু তিনি প্রকৃত ঘটনার বিকৃতিসাধন করে পরিবেশন করলেন। বিকৃত করলেন শুধু ঘটনাকেই নয়, ঘটনার উদ্দেশ্যকে, পক্ষ —প্রতিপক্ষকে এবং ঘটনার চরিত্রগুলিকেও। প্রথম মুক্তি যুদ্ধ গড়ে উঠেছিল ইংরাজদের বিরুদ্ধে ইংরাজ শাসন উচ্ছেদ করার জন্য। এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং নেতৃত্ব দিয়েছিলেন দেশের ব্যবসায়ী বুর্জোয়া শ্রেণীসহ অন্যান্য সমস্তশ্রেণী। এই যুদ্ধ শুধু রংপুরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। রংপুরের যুদ্ধ সমগ্র যুদ্ধের একটি অংশ মাত্র। দেবীচৌধুরাণী, ভবানীপাঠক, মজনুশাহ্, শোভানশাহ্ প্রমুখ এঁরা ছিলেন সর্বোচ্চ নেতৃত্বে। কিন্তু বঙ্কিম ইতিহাসকে চাপা রেখে ইংরাজদের সপক্ষে প্রচার করলেন:

এই সংগ্রাম ছিল মুসলমান শাসনের বিরুদ্ধে হিন্দু সম্প্রদায়ের। মুসলমানদের অত্যাচার থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য হিন্দুদের এই সংগ্রাম। এই সংগ্রাম ইংরাজদের বিরুদ্ধে নয় বরং তাদের শাসন কায়েম করার জন্য। হিন্দুরা এখন দুর্বল তাদের পক্ষে স্বাধীনতা অর্জন করা সম্ভব নয়। একমাত্র ইংরাজরাই পারবে হিন্দুধর্ম রক্ষা করতে। ইংরাজ ছাড়া সনাতন ধর্ম রক্ষা করা যাবে না। ইংরাজদেরই রাজা করতে হবে—আর সেজন্য ঈশ্বরের আশীর্বাদে সন্তান বিদ্রোহ ঘটেছে। ইংরাজদের সঙ্গে সহযোগীতা করে মুসলমান নিধন করাই এখন হিন্দুদের কাজ। ইংরাজরা যে হিন্দুদের রক্ষাকরার জন্য উপস্থিত হয়েছে সন্তানরা তা প্রথমে বুঝতে পারেনি। দেশ তাতে পরাধীন হবে হোক এই পরাধীনতাই হিন্দুদের পক্ষে মঙ্গলজনক। অতএব হে হিন্দুসমাজ ইংরাজ তোমাদের শত্রু নয়, মিত্র, তাদের সপক্ষে দাঁড়াও, মুসলমান তোমাদের শত্রু, তাদের বিনষ্ট কর ইংরাজদের সহায়তা করে। যদি তুমি হিন্দু হয়ে তা না কর তবে তা হবে দেশদ্রোহীতা, ভারতে ইংরাজকে রাজা করাই হ'ল ভারতমাতাকে বন্দনা করা, তবে বল—বন্দেমাতরম।

শ্রদ্ধেয় রমেশচন্দ্র দত্তের একটি উক্তি এখানে স্মরণ যোগ্য। তাঁর এই উক্তিটি প্রকাশিত হয়েছে 'এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকা'য় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় শীর্ষক প্রবন্ধে (১১শ সংস্করণ-ষষ্ঠ খন্ড, পৃষ্ঠা ৯-১০)ঃ

"Of all his works, however by far the most important from its astonishing political consequences was the Ananda Math which was published in 1882, about the time of the agitation arising out of the Ilbert Bill. The story deals with the Sannyasi (i. e, fakir or hermit) rebellion of 1772 near Purnea, Tirhut and Dinapur, and its culminating episode is a crushing victory won by the rebels over the united British and Mussalman forces, a success which was not, however, followed up, owing to the advice of a mysterious 'physician' who, speaking as a divinely-inspired prophet, advises Satyananda, 'the leader of the Children of the Mother,' to abandon further resistance, since a temporary submission to British rule is a necessity ; for Hinduism has become too speculative and unpractical, and the mission of the English in India is to teach Hindus how to reconcile theory and speculation with the facts of science. The general moral of the Ananda Math, then, is that British rule and British education are to be accepted as the only alternative to Mussalman oppression,

a moral which Bankim Chandra developed also in his Dharmatattwa, an elaborate religious treatise in which he explained his views as to the changes necessary in the moral and religious condition of his fellew countrymen before they could hope to compete on equal terms with the British and Mohammadans. But though the Ananda Math is in form an apology for the loyal acceptance of British rule, it is none the less inspired by the ideal of the restoration, sooner or later, of a Hindu Kingdom in India. This is especially evident in the occasional verses in the book, of which the Bande Mataram is the most famous."

এ থেকে এখন স্পষ্ট যে রামমোহন যে-রাজনীতির জন্ম দিয়েছিলেন তাকে রূপায়িত করা হয়েছে বঙ্কিম সাহিত্যে। এর মূলে ইংরাজদের চক্রান্ত না থাকলে এই ধারাবাহিকতা রক্ষা করা সম্ভব হ'ত না। এইভাবে রামমোহনের রাজনীতিকে বহন করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

রামমোহন ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ওয়াহাবী যুদ্ধ

ইংরাজ অনুগ্রহপুষ্ট দেশীয় জমিদার শ্রেণী এবং ব্যবসায়ী বুর্জোয়ারা রামমোহনের নেতৃত্বে বৃটিশ উপনিবেশিক শাসন সুদৃঢ় করে তোলার কাজে আত্মনিয়োগ করলেও দেশের জনগণ তাঁদের সেই প্রতিক্রিয়াশীল পথ ঘৃণার সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে বর্জন করে অনুপ্রাণিত হয়ে উঠেছিলেন নতুন আদর্শে। সে-আদর্শ দেশপ্রেমের আদর্শ—সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ শক্তিকে ভারতবর্ষের বুক থেকে উচ্ছেদ করে তার পূর্ণ স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করার আদর্শ। তাই দেশের জনগণ প্রথম মুক্তি-যুদ্ধের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে পুনরায় যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন বৃটিশ শক্তির বিরুদ্ধে। শুধু বৃটেনের বিরুদ্ধেই নয়, দেশী-বিদেশী জমিদার ও ব্যবসায়ী বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধেও। কেননা তারাই ছিল ইংরাজ শাসনের প্রধান অবলম্বন। তাই দেখা গেল, রামমোহন যে-বছর নভেম্বর মাসের উনিশ তারিখে বিলেত যাত্রা করলেন, তার আগেই কোলকাতা থেকে মাত্র মাইল ত্রিশেক দূরে বারাসাত অঞ্চলে ভয়ংকর বিদ্রোহ ফেটে পড়লো মির নিসার আলির নেতৃত্বে ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে, ৬ই নভেম্বর। এই বিদ্রোহকেই বলা হয় 'ওয়াহাবী বিদ্রোহ'। বিদ্রোহীরা বাঙলাদেশে সর্বপ্রথম আক্রমণ করেন পুঁড়াগ্রামের জমিদার কৃষ্ণদেব

রায়কে। এই বিদ্রোহ সমগ্র ভারতে পরিব্যাপ্ত ওয়াহাবী বিদ্রোহেরই এক বিশিষ্ট অংশ। ওয়াহাবী বিদ্রোহের প্রস্তুতি চলছিল বহুপূর্ব থেকে। এ-হচ্ছে ইংরাজ শাসনের বিরুদ্ধে ভারতীয় জনগণের দীর্ঘস্থায়ী সশস্ত্র-যুদ্ধ। এই বিদ্রোহের পুরোভাগে ছিলেন উত্তর প্রদেশের রায়বেরিলির সৈয়দ আহম্মদ। তিনি ১৮২১ খৃষ্টাব্দে কোলকাতা এলে হাজার হাজার মানুষ বিভিন্ন জেলা থেকে এসে তাঁর বক্তব্য শোনেন এবং তাঁদের নতুন আদর্শে দীক্ষিত হন। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে সারা ভারতবর্ষ জুড়ে ওয়াহাবীদের নেতৃত্বে বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়। পাঞ্জাব, বিহার, বাঙলা, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, এমনকি পেশোয়ারেও। প্রথমদিকে ওয়াহাবী দলের প্রধান কেন্দ্রীয় দপ্তর স্থাপিত হয় বিহার প্রদেশের পাটনা শহরে। পরে ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের সিতানা অঞ্চলে। এখানেই একটি দুর্গও নির্মাণ করা হয় এবং সেখান থেকে সারা ভারতবর্ষে যুদ্ধ পরিচালনা করা হয়। এই অঞ্চলটি ছিল কর্মীদের অস্ত্র-শিক্ষা দেবার, সৈন্যবাহিনীকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করে তোলার, প্রচারকার্য ও যুদ্ধ পরিচালনা করার দিক থেকে উপযুক্ত স্থান। বাইরে থেকে অস্ত্রশস্ত্র, যুদ্ধ সংক্রান্ত নানা প্রয়োজনীয় জিনিষ আনাবার দিক থেকে বিবেচনা করেই এই স্থানটি নির্বাচন করা হয় বলে মনে হয়। বাঙলার নেতৃত্বে ছিলেন সর্বজনশ্রদ্ধেয় মির নিসার আলি ও মোহম্মদ মহসীন। বিহারে এনায়েত্ আলি ও উলায়েত্ আলি। প্রথম যুদ্ধটির মত (১৭৬৩—১৮০০ খৃঃ) এই যুদ্ধটিও ছিল দীর্ঘস্থায়ী। যুদ্ধ চলে ১৮৩০ খৃঃ থেকে ১৮৭০ খৃঃ অবধি। অবশ্যই তৎকালীন অবস্থায় ইংরাজদের বিরুদ্ধে এই যুদ্ধকে 'ধর্মযুদ্ধ' বলে ঘোষণা করা হয়। জনগণের কাছে ইংরাজদের 'শয়তান' বলে চিহ্নিত করা হয়। শয়তানের রাজত্বকে চিহ্নিত করা হয়েছিল শত্রুর রাজত্ব বলে। শয়তানের প্রভুত্বের কাছে মাথা নিচু করে তার বশ্যতা স্বীকার, তার কাছে আত্মসমর্পণ, আত্মমর্যাদাকে বিসর্জন দেওয়াকেই বলা হ'ল 'ধর্ম'কে অমান্য করা অর্থাৎ 'অধর্ম'। এই 'অধর্মে'র বিনাশ করে 'ধর্মের রাজত্ব' কে, 'ধর্ম'কে প্রতিষ্ঠা করার সংকল্প গ্রহণ করতে বলা হলো দেশবাসীকে। 'ধর্মের রাজত্ব' মানে 'ন্যায়ের রাজত্ব', 'শান্তির রাজত্ব'। সেই ধর্মের মূল মন্ত্র হলো 'দেশপ্রেম'—দেশের স্বাধীনতার জন্য আত্মদান করেই দেশপ্রেমের পরিচয় দিতে হবে। এই ধর্ম এক নতুন বিপ্লবী 'ধর্ম'। তৎকালের 'বিপ্লবী মতাদর্শ'। এই 'ধর্মযুদ্ধ' কোন প্রচলিত ধর্মকে রক্ষা করার 'মামুলি' ধর্মযুদ্ধ নয়। তৎকালীন অবস্থায় ধর্মীয় মুখোস পরার প্রয়োজন ছিলো বিপ্লবী ওয়াহাবীদের। ওয়াহাবীদের সংগ্রামে ধর্মীয় বাক্ধারা ব্যবহার করা হলেও মূল বিষয়টির কোন হেরফের ঘটেনি বা বদলে যায়নি। বরাবরই মূল উদ্দেশ্য ছিল অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক। তার মূলে ছিল ধর্মীয় আবরণে বিভিন্ন শ্রেণীর বৈষয়িক স্বার্থের দাবী—যা পরিণত হয়েছে দেশের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার দাবীতে। এসব কথা ওয়াহাবী যুদ্ধ সম্পর্কে ভুলে গেলে চলবে না।

আমরা সকলেই জানি ধর্মীয় সম্প্রদায়ের পুরোহিত শ্রেণীই ছিলো ধর্মীয় নামের আড়ালে সামন্ত শোষকবর্গের রাজনৈতিক বাহিনীমাত্র। তাই পুরোহিত তন্ত্রই ছিলো সামন্ততন্ত্রের প্রধান আশ্রয়।

পুরোহিত শ্রেণীই ধর্মকে করে তোলে জীবিকা উপার্জনের শ্রেষ্ঠ উপায়। তারা দাবী করে থাকে তারা ধর্ম বিশেষজ্ঞ, একমাত্র তারাই জানে ধর্মের মর্মকথা; তাদের সাহায্য গ্রহণ করা ছাড়া প্রকৃত ধর্মকে, বহু দূরের নিরাকার ঈশ্বরকে জানা যাবে না। তাই তারা ধর্মশাস্ত্র সম্পর্কে অজ্ঞ মেহনতী জনসাধারণের কাছে দাবী করতো—ঈশ্বর প্রেরিত দূতদের অবর্তমানে তাদেরকে "ধর্ম গুরুর" সম্মান দিতে হবে। এই পুরোহিত শ্রেণী এতই শক্তিশালী যে প্রাক-বৃটিশ ভারতের বহু সম্রাটকে বিপথগামী করার চেষ্টা করে কোনো কোনো ক্ষেত্রে সাফল্য লাভও করেছে। নিজেদের স্বার্থেই এই পুরোহিত শ্রেণীর অনুশাসন অমান্য করা কোনো কোনো সম্রাটেরও পক্ষে সম্ভব হয়নি। এদের অগ্রাহ্য করে চলেছিলেন একমাত্র সম্রাট আলাউদ্দিন খিলজী।

অত্যাচারী শাসক ও শোষক শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষা করাই এদের কাজ। অত্যাচারী শাসকের পৃষ্ঠপোষকতায় জনসাধারণের কাছ থেকে তারা আদায় করতো এমন সম্মান যা তাদের আদৌ প্রাপ্য ছিল না। তাদের প্রাধান্য স্বীকার করা ছাড়া উপায় নাই সাধারণ মানুষের। শাসক শ্রেণীর সহায়তায় তারাই হয়ে উঠ্‌তো সামন্ত-প্রভুর পাশাপাশি "ধর্ম-প্রভু"। স্বাভাবিক ভাবেই অজ্ঞ জনসাধারণের কাছে এই ধূর্ত পুরোহিত শ্রেণীর বাণীই হয়ে উঠ্‌তো ঈশ্বরের বাণী। আজও জমিদার শ্রেণীর 'সৌভাগ্য'কে' ঈশ্বরের 'আশীর্ব্বাদ' আর দুঃস্থ মেহনতী জনগণের 'দুঃখ-দুর্দশা'কে ঈশ্বরপ্রদত্ত 'অভিশাপ' বলে বিশ্বাস করতে বলে। তা যাচাই করে দেখবার সাহস ও আত্মবিশ্বাস সকলের না থাকার জন্য তারা উদ্ধত ব্যবহার করতেও কুণ্ঠিত হতো না। তাদের মতে সমস্ত মানুষ হলো ঈশ্বরের ক্রীতদাস। আর সব কিছুই ঘটছে ঈশ্বরে ইচ্ছায়। সুতরাং তাই, প্রচলিত সামাজিক ব্যবস্থারও বিরুদ্ধাচরণ করা ঈশ্বরেরই বিরুদ্ধাচরণ করা। এমনি করে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা তারা গ্রহণ করেছিল সমাজে যাতে জমিদার শ্রেণীর প্রতি সাধারণ মানুষের আনুগত্য প্রতিষ্ঠা করা যায়। সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাই প্রাধান্য ছিল এই পুরোহিত শ্রেণীর। আইন কানুন, সাহিত্য শিল্প, সংস্কৃতি, বিচারালয়, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান—সব কিছুই তাদের দখলে। ফলে শোষণ লুন্ঠন উৎপীড়নের বিরুদ্ধে কোনো প্রকার ক্ষীণ প্রতিবাদ ছিল ঈশ্বরকে অমান্য করার সামিল। বিনিময়ে তারা পেতো জমিদার শ্রেণীর কাছ থেকে সম্মান, অর্থ, নানা উপঢৌকন, সুযোগ সুবিধা যার ফলে তারা হয়ে উঠেছিল বিরাট ধনসম্পত্তির মালিক। ধর্মের নামে এ সবই তারা ভোগ করতো। দেশের "ছোট লোকদের"—যারা ছিল দেশের মেহনতী জনগণ—তাদের দাবিয়ে রাখার কাজে জমিদার শ্রেণীর উৎকৃষ্ট হাতিয়ার ছিল এই-কুখ্যাত ধর্মজীবিদের প্রভাব।

আর এই জমিদার শ্রেণীই হলো শুধু কৃষকদেরই শত্রু নয়—উপনিবেশিক শাসনেরও শক্তিশালী স্তম্ভ। ইংরাজ শাসনকে যদি উচ্ছেদ করতে হয়—এই স্তম্ভকে চূর্ণ করাই হলো অপরিহার্য।

স্বাভাবিক ভাবেই বিপ্লবের শত্রু হয়ে উঠলো পুরোহিত শ্রেণী ও জমিদার শ্রেণীর যারা রাজনৈতিক বাহিনী। তাই ওয়াহাবী বিদ্রোহের আক্রমণের লক্ষ্যমুখ হয়ে উঠলো সামন্ত-শোষক বর্গের প্রধান আশ্রয় পুরোহিত তন্ত্র, ফলে বিদ্রোহীদের নতুন মতাদর্শের বজ্র ধর্মীয় দুর্গকে আঘাত হানলেও সঠিক স্থানেই করলো আক্রমণ। ওয়াহাবী মতাদর্শ সেদিন সমস্ত উৎপাদক শ্রেণীর ধর্মানুভূতিতেই শুধু ঘা দেয়নি; ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী বুর্জোয়া শ্রেণী, অশিক্ষিত অর্ধশিক্ষিত কৃষক সহ সমস্ত মেহনতী জনগণ যাতে চলে যায় প্রচলিত ধর্মের বিপরীতে, যাতে বৈষয়িক স্বার্থ সম্পর্কে হয়ে ওঠে সচেতন, তাই ওয়াহাবী মতবাদীরা ঘোষণা করলেন এমন ধর্ম যা হয়ে উঠ্‌লো সকলের গ্রহণ যোগ্য। ওয়াহাবী মতাদর্শে ঘোষিত হয়েছিলো ধর্মীয় বাণীর আবরণে মধ্যযুগীয় ভাববাদী সমতা যা বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত হতে চায়। সর্বত্র প্রচারিত হয়েছিলো সেই সাম্যবাদের বাণী ঃ ঈশ্বরের কাছে সকল মানুষই সমান। তাঁরই সৃষ্টি এই পৃথিবী। তার সব কিছু ভোগ করবার অধিকার আছে সমস্ত মানুষের।

ঈশ্বর ছাড়া প্রভুত্বের দাবী কেউ করতে পারে না। ভূমিরাজস্ব বা কোন প্রকার কর ধার্য করার অধিকার কারুর নাই। ওয়াহাবীদের মতাদর্শ সম্পর্কে শ্রদ্ধেয় সুরজিত দাশগুপ্ত মহাশয় লিখছেন ঃ ভারতের ওয়াহাবী আন্দোলনের গুরু ওয়ালিউল্লাহ আসলে ছিলেন মানুষের মধ্যে আদি সাম্যের প্রচারক এবং তাঁর মতামতের ও চিন্তাধারার সঙ্গে পাশ্চাত্যের ভাববাদী সাম্যতন্ত্রের বহু বিস্ময়কর সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়; অর্থনৈতিক বৈষম্যের সমাজে অর্থাৎ যে সমাজ-ব্যবস্থায় জনসাধরণকে এক্‌টুকরো রুটির জন্যে গাধা ও বলদের মতো মেহনত করতে হয় অথচ কিছু লোক না খেটেই সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করে তা উচ্ছেদ করার জন্যে ১৭৩১ খৃষ্টাব্দ নাগাদ একটি গোষ্ঠী সৃষ্টি করেছিলেন তিনি। এ-হেন ব্যক্তির উত্তরসুরী রূপে সৈয়দ আহম্মদ শাহ যখন নিজস্ব বাহিনী গড়ে তোলেন তখন মুখ্যত নির্ভর করলেন বছর চল্লিশেক আগে ওয়ারেন হেস্টিংস কর্তৃক শোচনীয়ভাবে নির্যাতীত রোহিলাদের উপরে,...... অত্যন্ত অল্পকালের মধ্যেই রোহিলাখণ্ড থেকে পাটনা পর্যন্ত সৈয়দ আহমদের অসামান্য জনপ্রিয়তা ও প্রভাব বিস্তৃত হয় এবং তারই ভিত্তিতে তিনি প্রায় একই সঙ্গে একদিকে শিখদের বিরুদ্ধে ও অন্যদিকে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু করেন।” (ভারতবর্ষ ও ইসলাম ১৪৭-১৪৮ পৃঃ) “একটি পর্যায়ে পাটনার ওয়াহাবী সংগঠন সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছিল কোলকাতার বৃটিশ কর্তৃত্বকে।”(পৃঃ১৪৯) এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে উপরের বিবরণে উল্লিখিত ‘শিখদের বিরুদ্ধে’ কথাটা বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে পারে। বস্তুতঃ জমিদার শ্রেণীর বিরুদ্ধে। দৈবাৎ এই জমিদার শ্রেণী শিখ ধর্মাবলম্বী।

কথাটা শিখ সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে বোঝায় না। আমরা দেখি পেশোয়ারে অত্যাচারী মুসলমান শাসন কর্তার বিরুদ্ধেও স্থানীয় মুসলমান চাষীরা বিদ্রোহ করে। শ্রদ্ধেয় সুপ্রকাশ রায় উল্লেখ করেছেন যে সিতানা দুর্গ থেকে জাতিধর্ম নির্বিশেষে ভারতের সকল শোষিত উৎপীড়িত জনসাধারণকে ইংরেজ আর তাদের পদলেহী জমিদার, জায়গীরদার, মহাজনদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে যোগদান করতে আহ্বান করা হয়। (ভাঃ কৃঃ বিঃ ও গনঃ সংগ্রাম— ২৬৬ পৃঃ)। কিন্তু অত্যন্ত লজ্জার কথা—ভারতবর্ষে এই সর্বপ্রথম জমিদার শ্রেণী ইংরাজ শাসন বিরোধী জনগনের আন্দোলনকে ধ্বংস করার জন্য অত্যন্ত ঘৃণ্য পন্থা গ্রহণ করে। তারা একে সাম্প্রদায়িক রূপ দেবার অপচেষ্টা করতে ত্রুটি করে নি। প্রথমদিকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা বাধাবার সর্বতোভাবে চেষ্টা করে থাকে। কৃষ্ণদেব রায় প্রথমদিকে ওয়াহাবী দলের অনুগামী কৃষকদের বিরুদ্ধে এমন একটি শাস্তির ব্যবস্থা করেন যা শুধু অপমানজনকই নয় একটি ধর্মের উপরও হস্তক্ষেপ। অনায়াসে তাতে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ, দাঙ্গাহাঙ্গামা বাধানো যায় এবং এটাই ছিল তাদের আসল উদ্দেশ্য। তিনি হুকুম দিলেন "তাঁহার জমিদারীর মধ্যে যাহারা ওয়াহাবী মতাবলম্বী তাহাদের প্রত্যেকের দাড়ির উপর আড়াই টাকা করিয়া খাজনা দিতে হইবে।" (তিতুমীর গ্রন্থ)। শুধু কৃষ্ণদেব রায় নন স্থানীয় বহু জমিদার সমবেত ভাবে দাড়ি প্রতি আড়াই টাকা খাজনা ধার্য করেন। শ্রদ্ধেয় সুপ্রকাশ রায় উল্লেখ করেছেনঃ "অন্যান্য জমিদারগণও সমান উৎসাহে নিরীহ মুসলমান প্রজাগণের নিকট হইতে দাড়ির খাজনা আদায় করিয়াছিলেন।" ঐতিহাসিক থর্নটনের মতেঃ "জমিদারগণ যে জরিমানা ধার্য করিয়াছিলেন তাহাকে সাধারণভাবে বলা হইত 'দাড়ির খাজনা'। (ঐ গ্রন্থ থেকে —২৭১ পৃঃ) ।

এ হচ্ছে সবচেয়ে অপমানজনক সাম্প্রদায়িক আচরণ। স্বাভাবিক ভাবে দাড়ির উপর ধার্য জরিমানায় ধর্মভিরু সাধারণ মানুষের ক্রোধ বহুগুণ বৃদ্ধি পাওয়ারই কথা। কিন্তু জমিদার শ্রেণীর আসল মতলবটা বুঝতে রাজনীতি-সচেতন ওয়াহাবী নেতৃত্বের বিলম্ব হয়নি। এর ফলে সাধারণ মানুষ যাতে উত্তেজিত হয়ে দাঙ্গা হাঙ্গামা না বাধায় সেজন্যে ধীর স্থির মস্তিষ্কের মানুষ শ্রদ্ধেয় মির নিসার আলি জনসাধারনের উদ্দেশ্যে বলেছিলেনঃ "কৃষ্ণদেব শয়তানি করিতেছেন। তোমরা জরিমানা দিও না। জমিদার ডাকিলেও তাঁহার কাছারিতে যাইবে না।" (তিতুমীর—বিহারী লাল সরকার, ৩৩-৩৪ পৃঃ)।

তিনি ওয়াহাবী মতাবলম্বী প্রজাদের কাছারিতে এসে জরিমানা আদায় দিতে হুকুম দিলেন। প্রজারা দশদিনের সময় নিলেন। দেখা গেলো দশদিন পরেও কেউ জরিমানা দিতে এলো না। তখন প্রজাদের ধরে আনবার জন্যে বরকন্দাজ পাঠানো হলো। এবার প্রজারা রুখে দাঁড়ালো, ফলে বরকন্দাজরা মার খেয়ে কোন মতে পালিয়ে রক্ষা পেলো কিন্তু তাদের একজন বিদ্রোহীদের

হাতে বন্দী হলো। (ভারতের কৃষক বিদ্রোহ, ২৭১ পৃঃ)। এই সংবাদ পেয়ে জমিদার কৃষ্ণদেব বিদ্রোহী প্রজাদের দমন করার জন্য দাঙ্গা হাঙ্গামা বাধাবার আয়োজন করতে লাগলেন। বোধ হয় এই সর্ব প্রথম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামা বাধানো হলো জমিদার শ্রেণীর পক্ষ থেকে। "একদিন কৃষ্ণদেব রায় স্বয়ং তিন চারি শত লাঠিয়াল ও বরকন্দাজসহ সর্পরাজপুর গ্রামে প্রবেশ করেন। একটা ভীষণ দাঙ্গা বাধিয়া গেল। জমিদারের লোক দ্বারা অনেকগুলি বাড়ী লুন্ঠিত হইল। মুসলমানদের নামাজ-গৃহ ভস্মীভূত করা হইল।" (৩৪)

ওদিকে "বঙ্গদেশের ছোটলাট সাহেবের নির্দ্দেশে কলিকাতা হইতে একটি প্রকান্ড সিপাহিদল আসিয়া যশোহর জেলার বাগান্ডির 'নিমক-পোক্তানে' কেন্দ্র স্থাপন করে। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট আলেকজান্দারের উপর হুকুম হইল, তিনি যেন বাগান্ডিতে গিয়া এই সিপাহীদের সহিত যোগদান করেন।" (সুপ্রকাশ রায়, ভাঃ কৃঃ ও গঃ সং, ২৭৬ পৃঃ)। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে ১৫ই নভেম্বর অর্থাৎ কৃষ্ণদেব রায়-কে আক্রমণের কয়েকদিন পরেই সরকারী সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে বিদ্রোহীদের বিরাট যুদ্ধ হয় নারকেলবেড়িয়া গ্রামে। এই যুদ্ধে সরকার পক্ষের "একজন জমিদার, দশজন সিপাহী ও তিনজন বরকন্দাজ নিহত এবং বহু সিপাহি আহত হইল। ম্যাজিষ্ট্রেট আলেকজান্দার সাহেব প্রাণ বাঁচাইবার জন্য দ্রুত অশ্বারোহনে পলায়ন করেন।" (সুঃ রাঃ, ২৭৬ পৃঃ) "সাহেব এখন দিগিবদিক জ্ঞানশূন্য, কোনদিকে কোন্ পথে ঘোড়া ছুটিতেছে তাহার ঠিক নাই। ঘোড়া যথেচ্ছ দৌড়িতে দৌড়িতে ভড়ভড়িয়ার খালে পড়িয়া কর্দমে প্রোথিত হইল। সাহেব কর্দমাক্ত কলেবরে ভীত চিত্তে মুমূর্ষু প্রায় হইলেন। কলিঙ্গা গ্রামের কয়েকজন ব্রাহ্মণ তাঁহার আদৃশী শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া তাঁহাকে কর্দম হইতে উদ্ধার করেন এবং ধীরে ধীরে তাঁহাকে আপনাদের গ্রামে লইয়া যান। পরে যথোচিত শুশ্রূষাদির পর গ্রামের ভদ্রলোকেরা (ধনী অভিজাতরা নিঃসন্দেহে—লেখক) তাঁহাকে বাগান্ডির সিপাহী কেন্দ্রে প্রেরণ করেন।" (ঐ গ্রন্থ)। এই ব্রাহ্মণ ধনিকরা যে ইংরাজদের অনুরক্ত ব্যক্তি এবং রামমোহন রায়ের আদর্শের অনুগামী —তা এই ঘটনা থেকেই বোঝা যায়। তা না হলে যখন জাতীয় শত্রু ইংরাজদের বিরুদ্ধে জনগণের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ চলছে—সেই মুহূর্তে জাতীয় শত্রুদের পক্ষ গ্রহণ করা সম্ভব ছিলনা দেশপ্রেমিক জনগণের পক্ষে। "এই যুদ্ধে বসিরহাটের কুখ্যাত দারোগা রামরাম চক্রবর্ত্তী বিদ্রোহীদের হস্তে বন্দী হন। .... এই দারোগাকে হত্যা করিয়া বিদ্রোহীরা প্রতিশোধ গ্রহণ করে।" (ঐ)। এই বিবরণ থেকেও স্পষ্ট যে জমিদার শ্রেণীর সাহায্যে বিদেশী শাসকবর্গ আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলো ওয়াহাবী অভ্যুত্থানের মত দেশজোড়া একটি রাজনৈতিক সশস্ত্র সংগ্রামকে দাঙ্গা হাঙ্গামার দিকে ঠেলে দিয়ে সমূলে ধ্বংস করতে। কিন্তু সেদিন উপনিবেশিক শাসন বিরোধী ওয়াহাবী সংগ্রামের গতিবেগ রোধ করা সম্ভব হয়নি। তার বিপ্লবী চরিত্র এবং গণতান্ত্রিক আবেদন উপনিবেশিক শাসন

বিরোধী শক্তিগুলিকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করেছিল। ব্যবসায়ী বুর্জোয়াশ্রেণী সহ সমস্ত সম্প্রদায়ের মেহনতী জনগণ এসে সামিল হলো বৃটিশ শাসন বিরোধী শিবিরে। এমনকি প্রথম বৃটিশ বিরোধী যুদ্ধে নতুন মানবতাবাদী মতাদর্শের যে সব ফকির-ব্যবসায়ীকুল এবং তাঁদের অনুগামীরা পরাজিত হন তাঁরাও এসে যোগদান করেন এই যুদ্ধে। শ্রদ্ধেয় সুপ্রকাশ রায় উল্লেখ করেছেন: এই সময় মিস্কিন শাহ নামক জনৈক ফকির তিতুর সহায় হন। ফকিরের শিষ্যগণও তিতুমীরের সহিত যোগদান করে। ইহার ফলে তিতুমীরের লোকবল যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়।"(২৭৩ পৃঃ)। হিন্দু ও মুসলমান জমিদারশ্রেণী একযোগে সচেষ্ট হয়ে উঠ্‌লো ওয়াহাবী বিদ্রোহীদের ধ্বংস সাধনে। উভয় সম্প্রদায়ের পুরোহিত শ্রেণীরও নিদ্রা ছুটে গেলো। প্রত্যেকেই হাড়ে হাড়ে টের পেতে সুরু করলো যে তাদের প্রত্যেকের অস্তিত্ব বিপন্ন। তাই দেখি ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে শুধু খাসপুর গ্রামেই নয়, রামচন্দ্র পুর, হুগলী ইত্যাদি বহু গ্রামের ধনী অভিজাত মুসলমান পরিবারবর্গের গৃহও লুণ্ঠিত হচ্ছে। "ইহাদের নিকটও তিনি (মীর নিসার আলি—লেখক) রাজস্ব দাবী করেন এবং রাজস্ব না দিলে কঠোর শাস্তি দেওয়া হইবে বলিয়া ঘোষণা করেন। এই ঘোষণা শুনিবামাত্র নদীয়া জেলা, চব্বিশ পরগণা জেলার বারাসত অঞ্চলের বহু গ্রামের তালুকদার, মহাজন ও ধনী মুসলমানগণ ইতস্তত পলায়ন করিতে থাকে। তিতু এই সকল অঞ্চলের বিভিন্ন জমিদারীর অধীনস্থ হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের প্রজাগণকে জমিদারের খাজনা বন্ধ করিবার নির্দ্দেশ দেন। এই নির্দেশ পাইয়া অধিকাংশ প্রজা খাজনা বন্ধ করিয়া দেয়।" (সুঃ রাঃ, ২৭৫ পৃঃ)। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে খাসপুরের "ধনী মুসলমানটি তিতুমীরের বিরুদ্ধে অভিযান চালাইতে জমিদার দেবনাথ রায়কে প্ররোচিত করিয়াছিলেন" (নদীয়া কাহিনী—পৃঃ ৭৬)। লক্ষ্যণীয় যে শ্রেণী স্বার্থই হল একটি শ্রেণীর চালিকা শক্তি—তাই দেবনাথ রায়ই হলো ধনী মুসলমানের নিকটতম ব্যক্তি, মির নিসার আলি অপেক্ষা। ওয়াহাবীদের সঙ্গে এক যুদ্ধে জমিদার দেবনাথ রায়কে প্রাণ হারাতে হয়।

শ্রদ্ধেয় যোগেশচন্দ্র বাগল লিখেছেন: "বাংলা বিহারের সম্ভ্রান্ত বংশের লোকেরা কিন্তু কখনও ওয়াহাবীদের সমর্থন করেন নি। তাঁরা বহু পূর্বেই কোলকাতায় ন্যাশনাল মোহামেডান এসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠা করে নিয়মতন্ত্রানুগ রাজনৈতিক আন্দোলন চালাতে আরম্ভ করেন।" (মুক্তির সন্ধানে ভারত)। অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে এই সংগঠনটিও গড়ে ওঠে ইংরেজদের অনুগ্রহপ্রার্থী ধনী অভিজাত মুসলমান পরিবারবর্গের উদ্যোগে। এখানে আরো কয়েকটি বিবরণ উল্লেখ করা যেতে পারে তাতে এটা স্পষ্ট হয়ে উঠবে যে এই যুদ্ধের বিপ্লবী চরিত্রকে আড়াল করার চেষ্টা করা সত্বেও যথার্থ সত্যকে একেবারে উড়িয়ে দেওয়া সম্ভব হয়নি।

এই যুদ্ধে উভয় সম্প্রদায়ের স্বাধীনতাকামী ব্যবসায়ীরা স্বাভাবিক কারণেই

যোগদান করে। বৃটিশ সরকারের ইতিহাস লেখক উইলিয়ম হান্টার কিছুটা সত্য স্বীকার করে বলেছেন ঃ বঙ্গদেশে একটি সমগ্র ব্যবসায়ী সম্প্রদায় (তাহারা বেশ অবস্থাপন্ন ও শক্তিশালী) ক্রমশ তাহাদের (ওয়াহবী বিদ্রোহীদের—সঃ, রা) পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিল।" (ভাঃ কৃঃ বিঃ ও গঃ সং—পৃঃ ২৫৮ থেকে উদ্ধৃত)।

তিনি আরো লিখেছেন ঃ "১৮৩১ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার পাশ্ববর্ত্তী অঞ্চলে ব্যাপক কৃষক অভ্যুত্থানে তাহারা (কৃষকগণ) সম্পূর্ণ নিরপেক্ষতার সহিত হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে সকল জমিদারের গৃহ লুণ্ঠন করিয়াছিল। প্রকৃতপক্ষে মুসলমান ধনীদের অবস্থা হইয়াছিল অপেক্ষাকৃত অধিক শোচনীয়।" (ঐ) "ধর্মীয় আন্দোলন সত্বেও উচ্চশ্রেণীর (অর্থাৎ ধনী) মুসলমান বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিল।" (ঐ পৃঃ ২৬৭)। এই আন্দোলন যে উভয় সম্প্রদায়ের পুরোহিত শ্রেণীকে আঘাত করেছিল; বিপন্ন করে তুলেছিলো তাদের স্বার্থকে তারো প্রমাণ পাওয়া যায়। হান্টার লিখেছেন ঃ "হিন্দু হউক, আর মুসলমানই হউক,—যে-কোন স্থানে যে-কোন বিত্তশালী বা কায়েমী স্বার্থসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষেই ওয়াহাবীদের উপস্থিতি একটা স্থায়ী ভীতির কারণ।.... যে-সকল মসজিদের বা পথিপার্শ্বস্থ মন্দিরের কয়েক বিঘা করিয়া ভূসম্পত্তি আছে, তাহাদের প্রত্যেকটি মসজিদ বা মন্দিরে মোল্লা বা পুরোহিতই গত অর্ধশতাব্দীকাল ওয়াহাবীদের বিরুদ্ধে তারস্বরে চিৎকার করিয়াছে।... অন্যান্য স্থানের মত ভারতবর্ষেও ভূস্বামী ও মোল্লা পুরোহিত গোষ্ঠী যে-কোন পরিবর্ত্তনকে ভয় করে।....রাজনৈতিক হউক, বা ধর্মীয় হউক, যে-কোন প্রকার বিরোধীতাই কায়েমী স্বার্থের পক্ষে মারাত্মক! আর উভয় বিষয়েই ওয়াহাবীরা ছিল প্রচলিত ব্যবস্থার ঘোরতর বিরোধী।

—ওয়াহাবীরা ছিল ধর্মীয় বিষয়ে ফরাসী বিপ্লবের 'অ্যানাবাপটিস্ট' এবং রাজনৈতিক বিষয়ে 'কমিউনিস্ট' ও বিপ্লবী সাধারণতন্ত্রীদেরই অনুরূপ।" (ঐ গ্রন্থ থেকে)। শ্রদ্ধেয় সুপ্রকাশ রায় উল্লেখ করেছেন যে সমসাময়িককালের সরকারী বিবরণে ওয়াহাবীদের সম্বন্ধে বলা হয়েছে ঃ "....ইহাদের মধ্যে কোন ভেদাভেদ নাই, সকলেই নিম্ন শ্রেণীর মানুষ।" "ইহাদের ভয়ে কোনো দেশের ভূস্বামী গোষ্ঠীই শঙ্কিত না হইয়া পারেনা।" (ঐ থেকে)

মিঃ ক্যান্টওয়েল স্মিথের মতে ঃ "এইদিক হইতে (অর্থনৈতিক দিক হইতে) ওয়াহাবী বিদ্রোহ ছিল পূর্ণ মাত্রায় শ্রেণী সংগ্রাম।....শিল্প বিকাশের পূর্বযুগে শ্রেণী সংগ্রাম যে ভাবে প্রায় সকল ক্ষেত্রে ধর্মীয় ধ্বনি গ্রহণ করিয়াছিল, সেই ভাবেই এই শ্রেণী-সংগ্রামেও ধর্মীয় ধ্বনী ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু সেই ধ্বনি ধর্মীয় হইলেও সাম্প্রদায়িক ছিল না।

"সুতরাং ওয়াহাবী বিদ্রোহ নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুদের বিরুদ্ধে নিম্ন শ্রেণীর মুসলমান দিগকে ক্ষিপ্ত করিয়া প্রকাশ্য যুদ্ধে টানিয়া আনে নাই, কিংবা (মুসলমান) শ্রেণী-শত্রুদিগকেও সাম্প্রদায়িক 'বন্ধু'রূপে গণ্য করিয়া তাহাদের সহিত ঐক্য প্রতিষ্ঠার নামে নিম্নশ্রেণীর মুসলমানদিগকে অর্থনৈতিক সংগ্রাম হইতে ভিন্ন পথে

পরিচালিত করে নাই।" (ঐ থেকে)। মিঃ স্মিথ আরো উল্লেখ করেছেন: "এই সকল রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের কোনটাই হিন্দু বিরোধী ছিল না।"

"কৃষক সভার ইতিহাস" গ্রন্থে বলা হয়েছে: দুই পক্ষ যখন এই শ্রেণী সংঘর্ষ চালাতে থাকে তখন হিন্দু মুসলমান সকল কৃষকই জমায়েত হয় একদিকে, অন্যদিকে মিলিত হয় হিন্দু ও মুসলমান জমিদার মহাজনরা।" (পৃঃ ২০, আবদুল্লাহ্ রসুল)। মির নিসার আলির জীবনী লেখক শ্রদ্ধেয় বিহারী লাল সরকার মহাশয় নিসার আলি সাহেবের বিরুদ্ধে লিখলেও তাঁর "ভর্ৎসনার" মধ্যেই যুদ্ধের বৃটিশ শাসন বিরোধী চরিত্রটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে দেখা যায়। তিনি শহীদ নিসার আলি সাহেবের প্রতি ক্ষুব্ধ হয়ে লিখেছেন: তিতুর বড়ই দুর্বুদ্ধি। তাই তিতু বুঝিল না, ইংরাজ কত ক্ষমাশীল, কত করুণাময়। দুর্বুদ্ধি তিতু ইংরেজের সে করুণা, সে মমতা বুঝিল না।....

"এ-ভারতের ইংরেজের রাজত্বে ইংরেজের করুণার মর্ম, ইংরেজের বাৎসল্যের ভাব, কে না বুঝে। ইংরেজের রাজত্বে সুখামৃতের নিত্যসুখাস্বাদ কে না করে।" (ঐ গ্রন্থ থেকে)

শ্রদ্ধেয় সরকার মহাশয় যদি ওই ধরণের ভর্ৎসনা না করতেন তা হলে তাঁর গ্রন্থ থেকে বিদ্রোহের মূল চরিত্রটি ঠিক বোঝা যেতো না। "ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস" গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে: "সমগ্র উত্তর ভারতের ওয়াহাবী বিদ্রোহের আঘাতের ফলে ভারতে বৃটিশ শাসন এক মহাসংকটের মুখে আসিয়া পড়ে।" (৪৮ পৃঃ)। ঐ গ্রন্থেই উল্লেখ করা হয়েছে যে " পশ্চিমবঙ্গেও ২৪ পরগনা, নদীয়া, যশোহর এই তিনটি জেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়িয়া ওয়াহাবীদের স্বাধীন সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়।" (৪৮ পৃঃ)। শ্রদ্ধেয় সুরজিত দাশগুপ্ত মহাশয়ও বলেছেন: একটি পর্যায়ে পাটনার ওয়াহাবী সংগঠন সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছিল কোলকাতার বৃটিশ কর্তৃত্বকে।" (ভারত ও ইসলাম ১৮৩০ খৃষ্টাব্দেই ওয়াহাবী বিদ্রোহীরা পেশোয়ার দখল করেন।

১৮৩০ খৃষ্টাব্দেই বাঙলার বিপ্লবীরা ঘোষণা করেছিলেন: " কোম্পানীর লীলা সাঙ্গ হইয়াছে।" (তিতুমীর গ্রন্থ-৪৮)। বাঙলায় যে-তিনটি জেলা থেকে ইংরাজ ও তাদের অনুগ্রহ প্রার্থী জমিদার ও ব্যবসায়ী বুর্জোয়াদের উচ্ছেদ করে স্বাধীন রাজ্য গঠন করা হলো– ওই স্বাধীন রাজ্যে প্রথম একটি স্বাধীন সরকার গঠিত হলো এবং ঐ সরকারের প্রধান শাসন কর্তা বলে ঘোষণা করা হলো মীর নিসার আলিকে। লক্ষ্য করার বিষয় যে তৎকালীন অবস্থায় বৃটিশ শাসকরা শুধুমাত্র সামরিকবাহিনীর উপর নির্ভর করে এদেশ শাসন করতো না, তাদের প্রধান অবলম্বন ছিল তাদের অনুগত জমিদার ও ব্যবসায়ী শ্রেণী। তাই জমিদারদের শাসন উচ্ছেদের সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজদের শাসনেরও অবসান ঘটে। অন্যান্য কয়েকটি প্রদেশেও ইংরাজ শাসনের অবসান ও ভারতের স্বাধীনতা ঘোষণা করা হয়। উভয় সম্প্রদায়ের অসংখ্য ধনী পরিবার বাংলার স্বাধীন রাজের বশ্যতা

স্বীকার করেন এবং স্বাধীন সরকারের আইন কানুন মেনে চলতে সম্মত হন। তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ঃ স্বাধীনতাকামী জমিদার মনোহর রায় বিদ্রোহীদের নানাভাবে সাহায্য করেছিলেন। কিন্তু এই স্বাধীন সরকারকে উচ্ছেদ করার জন্য "দেশের জমিদার ও ইংরেজ সরকার ওয়াহাবীদের বিরুদ্ধে মিলিত অভিযানের পরিকল্পনা করিলেন। জমিদারগনই ছিলেন এই পরিকল্পনার উদ্ভাবক। প্রথমে সাতক্ষীরা, গোবরডাঙ্গা, নদীয়া প্রভৃতিস্থানের বৃহৎ জমিদারগণ সমবেত ভাবে নদীয়ার কলেক্টরের নিকট যৌথ আক্রমণের প্রস্তাব উপস্থিত করেন। ইতিপূর্বে ওয়াহাবী আন্দোলন, তীতুমীরের ঘোষণা ও আলেকজান্দার সাহেবের পরাজয়ের সংবাদ কলিকাতায় তৎকালীন গভর্নর জেনারেল লর্ড বেন্টিঙ্ক সাহেবের কর্ণগোচর হইয়াছিল। তাঁহার আদেশে নদীয়ার কালেক্টর ও জজসাহেব কয়েকটি হস্তী ও বহু সৈন্য লইয়া স্থলপথে ও জলপথে নারিকেলবেড়িয়া যাত্রা করেন। নদীয়া ও গোবরডাঙ্গার জমিদারগণও তাঁহাদের পাইক বরকন্দাজ-দের একত্র করিয়া ইংরেজ বাহিনীর সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। এবার এই মিলিত বাহিনী ওয়াহাবী শক্তিকে চূর্ণ করিতে অগ্রসর হয়।" (ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম, ১ম খন্ড, পৃঃ ২৭৮)। বিদ্রোহীদলের সেনাপতিও "তাঁহার সৈন্যবাহিনী লইয়া বাঘারিয়া নামক স্থানে উপস্থিত হন এবং সেখানকার পরিত্যক্ত নীলকুঠি অধিকার করিয়া অবস্থান করিতে থাকেন।" এইবার যুদ্ধে বিপ্লবীদের কাছে শত্রুপক্ষের মিলিত বাহিনীরও পরাজয় ঘটে। কিন্তু বৃটিশ শাসকবর্গ বার বার পরাজয় বরণ করা সত্ত্বেও জমিদার ও মহাজন শ্রেণীর সহায়তায় বিপ্লবী সরকারকে উচ্ছেদ করতে সমর্থ হয়। ১৮৩১ সালে নভেম্বর মাসে ইংরাজরা বিজয় লাভ করে। সর্বশেষ যুদ্ধে স্বাধীন সরকারের প্রধান শাসনকর্তা মীর নিসার আলি নিহত হন। বিপ্লবী দলের প্রধান সেনাপতির মোহম্মদ গোলাম মাসুমকে অন্যায়ভাবে ফাঁসি দেওয়া হয়, অসংখ্য বিপ্লবীর দ্বীপান্তর দন্ড এবং কারা দন্ড দেওয়া হয়। কারাগারেও তাদের প্রতি অমানুষিক অত্যাচার করা হয়। এখানে লক্ষ্য করার বিষয় যে ইংরাজরা দেশের মূল শত্রু হিসাবে চিহ্নিত হলেও দেশের দালাল জমিদার ও ব্যবসায়ী বুর্জোয়া শ্রেণীও ইংরাজদের মতই স্বাধীনতার প্রধান শত্রু হয়ে উঠেছিলো।

এই শ্রেণীগুলির সহায়তা না পেলে নিঃসন্দেহে ক্ষুদ্র বৃটেনের পক্ষে ভারতবর্ষে এসে তাঁদের শাসন ও শোষণ কায়েম রাখা সম্ভব হতো না। শ্রদ্ধেয় রামকৃষ্ণ মুখার্জি তাই সঠিক ভাবেই উল্লেখ করেছেন ঃ

"All these revolts were ruthlessly suppressed by the Company with inhuman terror and oppression .. . And the Company could so smash the people's opposition to its rule of pillage and destruction because of possessing superior arms and because of the active help it received from its faithful allies—the 'Native Rulers', and the landlords created

by it, especially in Bengal, Bihar and Orissa by the Permanent Land Settlement of 1793.

In almost all the uprisings in the nineteenth century, these creatures actively participated in hunting down the patriots, sometimes before they were so ordered by the Company." (Rise & Fall of E. I. Company, by R. K. M. p-168).

এখানে উল্লেখ্য যে সেদিন জনগণের পরাজয়ের মূল কারণ ছিল—তাঁরা বিপ্লবী তত্ত্ব ও রণকৌশল সেদিন আয়ত্ব করতে পারেন নি। যদি পারতেন তাহলে কেউই তাঁদের স্তব্ধ করতে পারতো না। তাঁদের জয় ছিল অবশ্যম্ভাবী। এই স্বাধীনতা সংগ্রামকে হিন্দু জমিদার শ্রেণী কর্তৃক সাম্প্রদায়িক রূপ দেবার অপচেষ্টা তারই বিষময় ফল।

আমরা দেখি রামমোহনের সময় থেকে দুটি পরস্পর বিরোধী ধারা—দুটি বিবদমান ধারা চলে আসছে ভারতের জন সমাজে। একটি ধারা বিদেশী সাম্রাজ্যবাদকে রক্ষা করে এসেছে জনগণের আক্রমণ থেকে, আর জনগণের উপর চালিয়ে দিয়েছে উপনিবেশিক শাসন, শোষণ, লুন্ঠন, উৎপীড়ন, তার শিক্ষা সংস্কৃতি ও সভ্যতা; আর অন্য ধারাটি সেই বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে চালিয়ে এসেছে সশস্ত্র সংগ্রাম, সশস্ত্র শ্রেণী সংগ্রাম। প্রথম ধারাটি আজো আঁকড়ে ধরে আছে এদেশের দালাল জমিদার, বুর্জোয়া শ্রেণী আর তাদের বুদ্ধিজীবি সম্প্রদায়—যারা সমস্ত শক্তি দিয়ে বিদেশী উপনিবেশিক শক্তিগুলিকে ভারতের মাটিতে জিইয়ে রেখে তাদের শক্তিতে শক্তিমান হয়ে রয়েছে আর মেহনতী জনগণকে শোষণ, লুন্ঠণ ও উৎপীড়ণ করে চলেছে। মেহনতী জনগণ অপ্রতিহত গতিতে এগিয়ে চলেছে তার বিপরীত পক্ষে। তবে তার গতিবেগ রুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে শান দেওয়া হচ্ছে বিভিন্ন ধরণের অস্ত্র—কিন্তু সব চেয়ে শক্তিশালী অস্ত্র এবং বোধ হয় শেষ অস্ত্র "মার্কসবাদের" মুখোশ পরে মার্কসবাদের বিরুদ্ধাচরণ—মার্কসবাদ প্রয়োগের নামে। মেহনতী জনগণ যদি সচেতন না হন তাহলে তা হবে তাঁদের পক্ষে বিপদজনক। মনে রাখতে হবে দালাল বুর্জোয়া শ্রেণী তাদের কৌশল পাল্টেছে। এখানে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার দরকার যে বিংশ শতাব্দীর বিপ্লবী স্বাধীনতা সংগ্রামীরা কিন্তু রামমোহনের আদর্শ গ্রহণ করেন নি। তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল বিপ্লবী ওয়াহাবী দলের সশস্ত্র সংগ্রাম। ওয়াহাবী বিদ্রোহের আদর্শ পুস্তিকাকারে তারা প্রচার করেছিলেন। "....ওয়াহবী বিদ্রোহের যে-সকল রাজনৈতিক তথ্য প্রকাশিত হয়, সেই সকল তথ্য ভারতের প্রথম স্বদেশী যুগের শত শত কর্মীকে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল। বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় তাহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন"। (মুক্তি সন্ধানে ভারত, ভাঃ কৃঃ বিঃ ও গঃ সং হতে উদ্ধৃত, ২৬৫ পৃঃ) । তৎকালীন বাঙলার রাজনৈতিক পরিস্থিতি থেকে আমাদের শিক্ষা গ্রহণ করার যথেষ্ট উপাদান রয়েছে। রামমোহনের রাজনৈতিক আদর্শ হলো উপনিবেশিক শাসনকে

সুদৃঢ় করে তোলা, উপনিবেশিক শক্তির একটি অচ্ছেদ্য অংশ রূপে উপনিবেশিক শোষণ, লুণ্ঠন, উৎপীড়নকে কায়েম রাখা। অপরপক্ষে স্বাধীনতাকামী ব্যবসায়ী বুর্জোয়া সহ কৃষক কারিগর শ্রেণীর জনগণের আদর্শ হলো উপনিবেশিক ও সামন্ততান্ত্রিক শাসন ও শোষণকে উচ্ছেদ করে দেশের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করা। হাজার হাজার বছর ধরে যে দুটি পরস্পর বিরোধী আদর্শ অনুসরণ করে এসেছে দুটি বিবদমান শিবির—রামমোহনের সময় থেকেও তার অবসান ঘটেনি। একদিকে দাঁড়িয়েছে বৃটিশ শাসকবর্গ আর তাদের দালাল জমিদার ও বুর্জোয়া-শ্রেণী অন্যদিকে স্বাধীনতাকামী ব্যবসায়ী বুর্জোয়া শ্রেণীর নেতৃত্বে জনগণ কৃষক ও কারিগর শ্রেণী। বৃটিশ উপনিবেশিক শক্তির গর্ভে জন্ম নিয়েছিল তার দাসত্ব করার জন্য যে দালাল ব্যবসায়ী বুর্জোয়া শ্রেণী তাদেরই মুখপাত্র ছিলেন রামমোহন অন্যদিকে সেই উপনিবেশিক শক্তির বিরোধীতা করার জন্য অস্ত্র তুলে ধরেছিলেন যে বিপ্লবী বীর জনগণ তাদেরই মুখপাত্র ছিলেন মির নিসার আলি।

আজও পরস্পর বিরোধী দুটি শিবির—একদিকে রামমোহনের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলেছে সেই দালাল বুর্জোয়া, জমিদার শ্রেণী আর বুদ্ধিজীবিরা—অন্যদিকে বিপ্লবী জনগণের পুরোভাগে দাঁড়িয়ে আছেন মীর নিসার আলি। তাই এদেশে এই দুই নেতার জন্মদিন কখনও একই-সঙ্গে পালিত হতে পারে না। যতদিন জনগণ বিপ্লবীপথে অগ্রসর হয়ে দালাল বুর্জোয়া ও জমিদার শ্রেণীকে উৎখাত করতে না পারবে ততদিন বিদেশী উপনিবেশিক শক্তির পতন ঘটতে পারে না। আরো উদ্বেগের কারণ—রামমোহনের অনুগামীরাই নানাভাবে নানা কৌশলে নানা পোষাকে মেহনতী জনগণের শিবিরগুলির অধিকাংশ দখল করে আছে। এদের উৎখাত ক'রতে না পারলে মেহনতী জনগণ কখনই বিপ্লবের পথে অগ্রসর হতে পারবে না। এবং ভারতের মাটি থেকে সাম্প্রদায়িক রাজনীতিরও ধ্বংস সাধন করা যাবে না।

সবচেয়ে লক্ষণীয়—রামমোহনের সাম্প্রদায়িক রাজনীতির বিরাট পরাজয় ঘটেছিল ওয়াহাবী আন্দোলনের আঘাতে। তাই উভয় সম্প্রদায়ের জনগণ যখন একত্রে উপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরে বিপ্লবের পথে এগিয়েছে তখন মুসলমান ও হিন্দু জমিদার এক হয়ে জনগণের বিরুদ্ধাচরণ করেছে। ব'ললে ভুল হবে না যে এখানেই ওয়াহাবী নেতৃত্বের বিরাট জয়। এখানেই ঘটেছে রামমোহনের পরাজয়।

উপসংহারে বলা যেতে পারে উনবিংশ শতকের প্রথম ভাগে উপনিবেশিক শক্তির গর্ভে যে ব্যবসায়ী বুর্জোয়া শ্রেণীর জন্ম রামমোহন তাঁদেরই মুখপাত্র;—জনগণের সঙ্গে তাঁর কোন প্রকার সম্পর্ক ছিল না শত্রুতার সম্পর্ক ছাড়া।

□

গ্রন্থ নির্দেশিকা

১। I. T. T, p-44.
২। Ibid, p-42.
৩। Ibid.
৪। 'Rammohun Roy' by Iqbal Singh, p-156.
৫। স্বাঃ সংগ্রামে বাঙলা, p-31-32.
৬। I. T. T, p-47-48.
৭। Ibid, p-48.
৮। Ibid, p-49-50.
৯। "রামমোহন রায়" শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, p-32.
১০। ২০ নং গে স্ট্রীট, কলি-৫ থেকে প্রকাশিত "প্রবন্ধ পত্রিকা" হতে উদ্ধৃত— গনোপনিষদের ভূমিকা।
১১। Ibid, ঈশোপনিষদের ভূমিকা।
১২। Ibid, কঠোপনিষদের ভূমিকা।
১৩। Reforms of Regulation in Bengal—by Amitava Mukherjee.
১৪। 'Rammohun Roy' by Iqbal Singh, p—122.
১৫। Ibid, p—164.
১৬। Ibid, p—165.
১৭। Ibid, p—121.
১৮। Ibid, p—104.
১৯। Ibid, p—103.
২০। Ibid, p—103.
২১। Ibid, p—163.
২১ (ক)। "স্বাঃ সং বাঃ" শ্রীনরহরি কবিরাজ, p—153.

২২। "R. Roy" by Iqbal Singh.
২৩। "R & F of E. I. Co." by R. K. M. p—X.
২৪। রামমোহন রচনাবলী—হরফ প্রকাশনী, পৃঃ ৫৪৯।
২৫। "History of Political Thought" by B. B. Majumdar, p—65, 61.
২৬। "ভাঃ কৃঃ বিঃ ও গঃ সং" পৃঃ—নয়।
২৭। "Social Distribution of Landed Property in Pre-British India" Enquiry,
২৮। Ibid.
২৯। R & F of E. I. Comp, p—100.
৩০। Ibid, p—100.
৩১। Ibid, p—106.
৩২। Mughal Govt. Adm. by Sri Ram Sharma.
৩৩। "R. Roy" by Iqbal Singh p—88, p—47.
৩৪। তিতুমীর—পৃঃ ৩৬-৩৭, 'ভাঃ কৃঃ ও গঃ সংঃ হ'তে উদ্ধৃত। পৃঃ—২৭১।

পৃঃ—উদ্ধৃতি	সূত্র
১৭—Ward..	p-101, Vol. III.
৪০—Every Conquest..	p-XIX, C. D. during the British Rule in India.
৪৪—There is hardly	p-XI, R & F of E. I. Co.
৪৮—Mr. Elphinstone..	p-63, H. P. T. by B. B. Mazumdar
৬৫—Misguided....	p-45, 'যুগন্ধর মধুসূদন'।
১১৮—They....held..................	p-403, Adv. History of India by R. C. Mazumder.

শুদ্ধি পত্র

পৃষ্ঠা নং	ইন	আছে	পড়তে হবে
17	1	construction	concentration
	3	also asceticism	also of asceticism
23	19	which	whom
26	31	arogance	arrogance
	33	ascedancy	ascendancy
	34	growth	group
27	1	trade	trading
	6	much	worth
28	29	create to	(omit 'create to')
29	6	congegrated	congregated
30	1	should	would
	1	of wider	of a wider
	3	and	or
	13	apprieciable	appreciative
	16	British	British,
40	27	of foriegn	of a foreign
	28	it stain	it a stain
	31	element	element,
44	24	Right	Reign
	31	not 'not only	'not only
	33	is truer	is still truer
60	23	যুক্তি সম্পর্কে	যুক্তি নিজের ভাষায়
	27	remained	remain
	31	for good	for securing good
61	2	methods	modes
	11	later	latter
65	18	আর দিকে দিকে	আর দিকে
	19	রাজদ্রোহিতা	রাজবিদ্রোহিতা
	21	করিলেন	করিতে লাগিলেন
	26	দক্ষিণারঞ্জন	দক্ষিণামোহন
79	5	people	pupils
	28	was difficult	was therefore difficult

পৃষ্ঠা নং	লাইন	আছে	পড়তে হবে
	30	English Sannyassis	English, Sannyasis
	34	member	numbers
86	2	fall	fell
	7	India young	India. Young
	7	there of	there
	10	Indian	India
87	16	society	system
	17	in land	of land
	18	were	was
91	29	in the peasa-ntry	of the peasa-ntry
96	20 & 21	away from	away both from
97	16	member	number
98	3	some times	sometime
	8	an $2\frac{1}{2}$	at $2\frac{1}{2}$
99	10	It's	its
101	7	Sannyasis looted	Sannyasis is said to have looted
	9	33p	36p
106	31	Bairagis	to all Bairagis
	,,	such castes	such of the caste
110	12	reign'	(omit inverted comma)
111	30	quoted from	quoted in
112	35	,,	,,
113	3	320	3,200
114	4	quoted from	quoted in
116	20	বলেছেন	উল্লেখ করেছেন
118	24	উল্লেখ করেছেন	বলেছেন
119	22	quoted from	quoted in
125	18	quoted from	quoted in
141	18 & 19	entertained his high	entertained high
	19	his ambition	his life's ambition